বংশ-পরিচয়

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত

বৈশাখ, ১৩২৮।

রাজসংস্করণ] [মূল্য ৫০৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশক

প্রজাপতি-সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার

২০৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভূমিকা।

বাঙ্গালায় এখন যে সকল বড় বড় ঘর আছে, তাঁহাদের ইতিহাস অনেকেই জানিতে চায়। কিন্তু বাঙ্গালায় এ সম্বন্ধে কোন বই নাই। লোকনাথ ঘোষ মহাশয় এ বিষয় একখানি বই বহুকাল পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, কিন্তু সে ইংরাজীতে। সুতরাং এই "বংশ-পরিচয়" বইখানি যে অনেকের আদরের জিনিস হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি ত আগাগোড়া বইখানি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি এবং পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

অনেকের সংস্কার, কথাটাও অনেকটা সত্য বটে, যে এখনকার যত বড় বড় ঘর, সবই ইংরাজ আমলের। ইংরাজের প্রথম আমলে ইংরাজের কাছে চাকরী করিয়া, ইংরাজের ঠিকা লইয়া, ইংরাজের বেনিয়ানি করিয়া, অথবা নানা উপায়ে ইংরাজের কাজ করিয়া ইঁহারা সব বড় লোক হইয়াছেন। নবাবী আমলের, মোগল আমলের, পাঠান আমলের বড় বড় ঘর আর বড় দেখা যায় না। কিন্তু "বংশ-পরিচয়ে" দেখি ঐ সব আমলের বড় বড় ঘর এখনও বর্ত্তমান আছে! নবাবী আমলের নাটোর আছেন, আচার্য্যচৌধুরীরা আছেন; মোগল আমলের বর্দ্ধমান আছেন, দিনাজপুর আছেন; পাঠান আমলের নলডাঙ্গা আছেন, তাহিরপুর আছেন—ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দু আমলের কেহ এখন আছেন কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল। কেহ কেহ বলেন—ময়ূরভঞ্জের তাঁবেদার পাললহড়ার রাজারা পালবংশের শেষ। মেদিনীপুরের দক্ষিণে অনেকগুলি সদ্গোপ প্রাচীন রাজা ছিলেন—কর্ণগড়, নারায়ণগড় প্রভৃতি তাঁহাদেরই

রাজত্ব ছিল। তাঁহারা উড়িষ্যার সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধে অনেক সময়েই উড়িষ্যারই সহায়তা করিতেন। তাঁহাদের বংশ প্রায়ই শেষ হইয়াছে—আছেন কেবল নাড়াজোল। ত্রিপুরার রাজবংশও খুব প্রাচীন, পাঠানদের সময়ে তাঁহারা বাঙ্গালা ও বর্ম্মার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থকার যদি এইরূপে বাঙ্গালার সব ঘরের ইতিহাস প্রকাশ করিতে পারেন, বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্ধকার অনেকটা ঘুচিবে। তিনি সংবাদ-সংগ্রহের যে উপায়টি করিয়াছেন, সেটি বেশ—তিনি ঐ সকল ঘরের লোক দিয়াই তাঁহাদের নিজের নিজের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করাইয়াছেন ও সেই সকল উপকরণ হইতে তিনি ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। তবে এডিট্ করার ভার তাঁহার। সে বিষয়ে তাঁহাকে খুব সাবধান হইতে হইবে, বাঙ্গালার আসল ইতিহাসের সঙ্গে বেশ মিলাইয়া মিলাইয়া এডিট করিতে হইবে। নহিলে অনেক সময় ইতিহাস আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।

আর এক কথা, তিনি শুধু হিন্দুদের ঘরের কথাই বলিতেছেন। মুসলমানদের মধ্যেও অনেক অনেক বড় বড় ঘর আছেন। সে সব ঘরের ইতিহাসও চাইত। তাঁহাদের মধ্যেও ত তিন আমলেরই লোক আছেন। তাঁহাদের বাদ দিলে অঙ্গহানি হইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অবতরণিকা।

জাতির ইতিহাস সাধারণতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে, শিলালিপিতে ও তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপিসমূহে পাওয়া যায়; কিন্তু উহার অংশ-বিশেষ পাওয়া যায় পারিবারিক ইতিবৃত্তেও।

ব্যষ্টি লইয়া যেমন সমষ্টি; তেমনই ব্যক্তি-সংঙ্ঘ লইয়া পরিবার; পরিবার-সঙ্ঘ লইয়া সমাজ; সমাজ-সঙ্ঘ লইয়া জাতি। তাই পারিবারিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া জাতির ইতিহাস রচনার যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এ শুভকর্ম্মে যাঁহারা আমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এদেশে হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য জাতিভুক্ত বহু পরিবার বাস করিয়া থাকেন। সেই সকল পরিবারের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলিও প্রকাশিত হইবে

প্রথম উদ্যম। ভ্রম-প্রমাদ ঘটিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ছাপার ভুলও আছে। আশা করি, পাঠকবর্গ সকল দোষ-ত্রুটি আমাকে দেখাইয়া দিয়া অনুগৃহীত করিবেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করিব। বাঙ্গালার লোকপ্রিয় গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে এই পুস্তকের এই খণ্ড তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া এই কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন এবং আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার।

সূচীপত্র।

বাঙ্গালার গভর্ণর

বিদ্যোৎসাহী

লর্ড রোণাল্ডসের

করকমলে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল

বংশ-পরিচয়

ত্রিপুরা-রাজবংশ।

ত্রিপুরা রাজ্য অতীব সুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য-সমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম। ত্রিপুরা রাজ্য এক্ষণে স্বাধীন ত্রিপুরা বা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা নামে অভিহিত। বর্ত্তমান সময়ের ভারতের মানচিত্র খুলিলে বঙ্গদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে যে পীতবর্ণ চিহ্নিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলা, পূর্ব্বে লুসাই পাহাড়, দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা জেলা অবস্থিত।

ভৌগোলিক অবস্থান।

এককালে এই রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসাম প্রদেশের প্রায় অর্দ্ধাংশ এবং বঙ্গদেশেরও প্রায় অধিকাংশ স্থান এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বড় বেশী দিনের কথা নয়, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দেও স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের পরিমাণ ফল ৬৩৮৬ বর্গ মাইল ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান পরিমাণ ফল ৪,০৮৬ বর্গ মাইল এবং লোক-সংখ্যা ২, ২৯,৬১৩ (১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারী অনুসারে)। রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ১২ লক্ষ টাকার উপর। ইহা ব্যতীত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অধীশ্বরের সুবিস্তীর্ণ জমিদারী

পরিমাণ ফল ও লোকসংখ্যা।

রাজ্যের আয়।

আছে; সেগুলি ব্রিটিশ এলেকা-ভুক্ত শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় অবস্থিত। এই জমিদারীর পরিমাণ ফল ৬০০ বর্গ মাইল এবং ইহার বার্ষিক আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

ত্রিপুরা রাজ্যের অতীত ইতিহাসের পরিস্থচনা মহাভারতীয় যুগে। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতিগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। ইহারা পুরাণোক্ত নরপতি যযাতির অন্যতম পুত্র দ্রুহ্যের বংশধর। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিবৃত্ত—রাজমালায় উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপতি প্রাচীন কিরাত-রাজ্যে বা বর্ত্তমান আসাম প্রদেশে আগমন করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। এক সময়ে এই রাজ্য পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত, দক্ষিণে আরাকান রাজ্য পর্য্যন্ত, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ ও দক্ষিণে গঙ্গা নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু এই সময়কার কোনও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে রাজমালায় ঐতিহাসিক উপকরণ আছে, সেগুলির মূল্য ইতিবৃত্ত-কারের নিকট যথেষ্ট হইতে পারে। উনকোটি ও দেবতামুরা শৈলমালায় প্রাপ্ত প্রস্তর-খোদিত দেবমূর্ত্তিসমূহ প্রাচীন হিন্দুযুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন এবং এইগুলি যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী,—এ কথা বহু বিশেষজ্ঞই স্বীকার করিয়াছেন।

রাজবংশের ইতিবৃত্ত।

ত্রিপুরা রাজ্যের অধীশ্বর রত্নদেব বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা তুগরল খাঁকে একটী বহুমূল্য রত্ন উপহার দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই রত্ন একটী ভেকের গাত্র হইতে পাওয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে প্রবাদ, ভেকের গাত্রে স্বাতীনক্ষত্রের জল পড়িলে এই রত্ন জন্মে; ইহা দুর্ল্লভ সামগ্রী এবং কুবেরেরও লোভের বস্তু। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ত্রিপুরাধিপতি রত্নদেবের নিকট হইতে এই অপূর্ব্ব মণি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে "মাণিক্য" উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি

ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতিগণ তাঁহাদের নামের সহিত এই উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের বংশগত "দেববর্ম্মণ" উপাধি ক্ষত্রিয়-জাতির উপাধি।

প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন; খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্যের ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুরার অধিপতিগণের সহিত সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার মুসলমান রাজশক্তির সংঘর্ষ হয়। কিন্তু প্রথম যুদ্ধেই মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিলেন।

রাজা প্রথম বিজয় মাণিক্য খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন; এমন কি মোগল বাদসাহগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রবল শক্তি-সম্পন্ন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 'আইন-ই-আকবরী' নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এই :—

"ভাটির প্রান্তদেশে এক সুবিস্তৃত প্রদেশ আছে উহা ত্রিপুরারাজের অধীন। সেই নরপতির নাম জয়মাণিক। যিনি ত্রিপুরার রাজা হন তিনিই মাণিক উপাধি তাঁহার নামের শেষে সংযুক্ত করিয়া থাকেন। এই রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ 'নারায়ণ' নামে অভিহিত হন। ত্রিপুরা-রাজের যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত এক সহস্র হস্তী এবং দুই লক্ষ পদাতিক আছে, কিন্তু অশ্বারোহী সেনা নাই বলিলেই হয়।"

ত্রিপুরার অধীশ্বর ধন্য মাণিক্যের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান-গণের সহিত নিয়মিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন চাই চাং; ইনি দুইবার গৌড়াধিপতি হুসেন সাহের সেনাদলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা-রাজ্যের অধীন হয় এবং বহুকাল ইহা তাঁহাদের অধীন থাকে; অবশেষে আরাকানের মগ রাজারা চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা অমর মাণিক্যের রাজত্ব-কালেও ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা উন্নত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তাঁহার পৌত্র যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে মোগল-সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের সেনাপতি নুরুল্লা খাঁ ত্রিপুরারাজ্য আক্রমণ করেন এবং রাজা যশোধর মাণিক্যকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। দিল্লীতে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করা হয়; কিন্তু তিনি আর স্বদেশে ফিরিয়া না আসিয়া কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিতে বাসনা করেন। ৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা কল্যাণ মাণিক্য সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। তিনি পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি মোগলদিগকে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুরা রাজ-পরিবারে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সেই সুযোগে বাঙ্গালার নবাবগণ ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁহাদের প্রাধান্য বিস্তার করেন। কিছু দিন ধরিয়া তাঁহারা ত্রিপুরায় এইরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন এবং তাঁহারা যাঁহাকে মনোনীত করিতেন তিনি ত্রিপুরার রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতেন। এই শোচনীয় অবস্থার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। রাজা দ্বিতীয় ধর্ম্ম মাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরারাজ্যের সমতল অংশটুকু ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের হস্তগত হয়। এই সমতল অংশ এক্ষণে ব্রিটিশ এলেকায় অবস্থিত এবং ত্রিপুরা-রাজের জমিদারী-ভুক্ত। রাজা দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নবাবদিগের এই প্রাধান্য ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যমান ছিল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করেন।

ইহার ফলে ত্রিপুরা-রাজ্যের জমিদারী-অংশের স্বত্ব ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য ত্রিপুরার অধীশ্বর ছিলেন। ইনি (১৭৬০-৮৩) খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং ত্রিপুরা-রাজ্যের সহিত ইংরেজদিগের প্রথম সম্বন্ধ রাজা কৃষ্ণ মাণিক্যের আমলেই স্থাপিত হয়। এই সময়ে মিঃ র‍্যাল্‌ফ লীক ত্রিপুরার প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন; লীক সাহেবের সদর হয় কুমিল্লা সহরে। ইনি ত্রিপুরা-রাজ-সরকারের কর্ম্মচারীদের সাহায্যে জমিদারীর শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন; ত্রিপুরা-রাজ্যের শাসন-ব্যাপারে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না; রাজারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ত্রিপুরা-রাজের কোনও প্রকার সন্ধি-সর্ত্ত নাই। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে রাজ্যের সীমা লইয়া গোলোযোগ উপস্থিত হয়; এই সময়ে লুসাই জাতি ব্রিটিশ সীমান্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। ইহার ফলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় অবস্থান করিবার জন্য আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়; পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পদ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিপুরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ই ত্রিপুরা-রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেণ্ট।

ত্রিপুরা-রাজ্যের অধীশ্বরগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কর প্রদান করেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কোনও প্রকার সন্ধি না থাকাতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরা-রাজ্যকে সামন্তরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

ইংরেজী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে স্বর্গীয়া মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার অনুজ্ঞা অনুসারে ত্রিপুরার মহারাজের সম্মানার্থ ১৩ বার তোপধ্বনির ব্যবস্থা হয়। তদবধি এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের আইন-কানুন ত্রিপুরার অধিবাসিগণের বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী রচিত হইয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজের প্রাণদণ্ড-প্রদানের ক্ষমতা আছে। ত্রিপুরা রাজ্য হইতে কোনও আসামী ব্রিটিশ রাজ্যে পলাইয়া আসিলে তাঁহাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার ত্রিপুরাধিপতির আছে। ত্রিপুরা-রাজ সরকারের নিজস্ব ২৫০ জন সৈনিক এবং ৩৪১ জন পুলিশ কর্ম্মচারী আছে। ত্রিপুরা-রাজসরকারের নিজস্ব আদালত-সমূহে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফগণ বিচারকার্য্য করিয়া থাকেন। এই সকল আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হইলে সেই নিষ্পত্তি যদি মামলাকারী কোনও পক্ষের কোনও প্রকারে আপত্তিজনক হয় তাহা হইলে সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মহারাজের নিকটে আপীল করিবার ব্যবস্থা আছে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলার আপীলই মহারাজার নিকটে করা যায়। ইহাই ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রিভি কাউন্সিল। এই কাউন্সিল আপীল বিচারের সময় মহারাজকে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

শাসন ও বিচারপদ্ধতি।

বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর স্বাধীন ত্রিপুরা-রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর। পর্য্যায়হিসাবে বর্ত্তমান মহারাজা এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার অধস্তন ১৭৫তম পুরুষ। ইনি স্বর্গগত মহারাজা রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইংরেজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর

ত্রিপুরার বর্ত্তমান অধীশ্বর।

তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে ত্রিপুরারাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই বৎসর ২৫শে নবেম্বর তারিখে ইঁহার সিংহাসন-অধিরোহণ-উৎসব মহা-সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হয়। এই উৎসবক্ষেত্রে মহামান্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা স্যর ল্যান্সেলট হেয়ার কে-সি-এস্-আই, সি-আই-ই মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের শিক্ষা কোনও স্কুল-কলেজে হয় নাই। * প্রসিদ্ধ শিক্ষক অক্সফোর্ডের এম্-এ উপাধিধারী মিঃ টি, আর, উইলিয়াম্‌স এবং অন্যান্য প্রবীণ শিক্ষকগণের নিকট মহারাজা বাহাদুর সুশিক্ষা লাভ করেন। মহারাজা বাহাদুর উদার ও দয়ার্দ্র-হৃদয় এবং তাঁহাকে দেখিলেই তিনি যে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পুরুষ ইহা সহজেই অনুমিত হয়। তিনি উচ্চদরের চিত্রকর এবং গীতবাদ্যকলায় সুপণ্ডিত এবং উৎকৃষ্ট মৃগয়াকারী।

মহারাজা বাহাদুর পরম বিদ্যোৎসাহী। প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা তাঁহার রাজ্যে অবৈতনিক বলিলেই হয়। কেবল তিনটী উচ্চ-ইংরেজী স্কুলে ছাত্রদের নিকট সামান্য কিছু বেতন লওয়া হয়, তাহাও কেবল স্কুলের কল্যাণের জন্য। স্বরাজ্যে বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহদানের ও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি ছাত্রদিগকে মুক্তহস্তে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মহারাজা বাহাদুর ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সভা সমিতির পৃষ্ঠপোষক।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে মহারাজা-বাহাদুর বিবিধপ্রকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি স্বীয় রাজ্যের সমরোপকরণ-সমূহ ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ করেন।

যুদ্ধ-ব্যাপারে সাহায্য।

যুদ্ধ-ব্যাপারে তিনি যে সাহায্য করেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

(১) যুদ্ধের সাধারণ ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দান ১ লক্ষ টাকা

(২) ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান রিলিফ ফণ্ডে দান :—

প্রথম দফা—	১২,০০০৲
দ্বিতীয় দফা—	৩,৭৫০৲
তৃতীয় দফা—	১৫,০০০৲
চতুর্থ দফা—	১,০০,০০০৲

(৩) বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন পেট্রিয়টিক ফণ্ড—৫,৩৮০৲

(৪) লেডী কারমাইকেল উইমেন্‌স ওয়ার ফণ্ডে মহারাণী মহোদয়ার দান———৫,৭০০৲

(৫) ওয়াই এম সি এ ফণ্ডে————১০০৲

(৬) সেণ্ট ডানষ্টান ডে ফণ্ড————১৫০৲

(৭) এক বৎসরের জন্য ফ্রান্সে আম্বুলান্স কোর রাখিবার খরচ————৩,৬০০৲

(৮) আওয়ার ডে ফণ্ড————১,০০০৲

(৯) রঙ্গরুটদিগকে এককালীন দান———১,০২৫৲

(১০) রঙ্গরুটদিগের জন্য পোষাক————৩৩৬৲

(১১) রঙ্গরুটদিগের যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ—৩৮০৲

(১২) মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে নিযুক্ত ১১-সংখ্যক রাজপুত সৈন্যদলের জন্য ৮০০ খাকী সার্ট—১,৮১২৲

(১৩) মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহারের জন্য একটি মোটর নৌকা দান———————২৫,০০০৲

কাশী-রাজবংশ।

বারাণসী বা কাশী-রাজবংশ মধুবনীর মিশ্র ব্রাহ্মণ-বংশের সর্ব্বরীয় (সরযূপারী) শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা ত্রিকর্ম্ম ব্রাহ্মণ; কিন্তু পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী নহেন। এই বংশের প্রথম খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম বাবু মনোরঞ্জন সিং। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তেতারিয়া গ্রামে সামান্য কিছু জমিদারীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তেতারিয়া গ্রামের বর্ত্তমান নাম গঙ্গাপুর। ইঁহার পুত্র মনসারাম এই জমিদারীর পরিসর আরও বর্দ্ধিত করেন এবং সম্রাট্ ফেরকসিয়ারের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সম্রাট্ ফেরকসিয়ারই তাঁহাকে গঙ্গাপুরের জমিদারী প্রদান করেন।

ইতিবৃত্ত।

সম্রাট্ ঔরংজেবের মৃত্যুর পর রাজ্য মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটে। সেই সময়ে বেনারস অযোধ্যার নবাব-ওয়াজির সাদাৎ আলির স্বত্বাধিকারভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। সাদাৎ আলি দিল্লীর বাদশাহ-গণকে সৈনিকাদি দিয়া যুদ্ধের সময়ে সাহায্য করিতেন। এই কারণে

বেনারস তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। সাদাৎ আলি বেনারস ও উহার সংলগ্ন তুইটী সরকার সামান্য খাজনায় তাঁহার অন্যতম বন্ধু মির রস্তম আলিকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি জমিদারী-শাসনকার্য্যে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার সে ক্ষমতাও ছিল না; এইজন্য ইনি বেনারস প্রদেশের শাসনভার রাজা মনসারামের হস্তে প্রদান করেন। রাজা মনসারাম মুখে অযোধ্যার নবাব-ওয়াজিরের বশ্যতা স্বীকার করিলেও স্বাধীন হইবার পথ তৈয়ারী করিতেছিলেন। রস্তম আলি নবাব ওয়াজিরের বিরাগভাজন হইলে রাজা মনসারামই তদানীন্তন বেনারস প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন।

রাজা মনসারামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলবন্ত সিং উত্তরাধিকার-সূত্রে বেনারস প্রদেশের শাসনাধিকার লাভ করেন। ইনি অসাধারণ রাজনীতিক কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী ছিলেন। তখন দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর নামমাত্র সম্রাট্ হইলেও তাঁহার প্রদত্ত সম্মানের মূল্য যথেষ্ট ছিল। বলবন্ত সিং পদমর্য্যাদায় সাদাৎ আলির অব্যবহিত নিম্নে ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর বেনারস ও তুইটী সরকারের পত্তনি বন্দোবস্ত যাহা সাদাৎ আলির নিকট হইতে রাজা মনসারাম লেখাপড়া করিয়া লইয়াছিলেন, সেই বন্দোবস্ত এবং 'রাজা' উপাধি তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর দ্বারা অনুমোদিত করিয়াই লন।

রাজা বলবন্ত সিং ক্রমে ক্রমে তাঁহার রাজ্য সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। গঙ্গাপুর, রামনগর, পাতিহাটা, বিজয়গড় ও অন্যান্য স্থানে তিনি তুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর ইনি অযোধ্যার নবাব-ওয়াজিরের নামমাত্র অধীনতা পাশ ছিন্ন করেন এবং নিকটবর্ত্তী সর্দ্দারদিগকে যুদ্ধে পরাজিত

স্বাধীনতা ঘোষণা।

করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। অযোধ্যার নবাব-ওয়াজির তাঁহার বিরুদ্ধে বহুবার সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলই হইল না। ইংরেজদিগের সহিত সাহাআলম, সুজা উদ্দৌলা ও মীরকাশিমের যে যুদ্ধ হয় এবং যাহার ফলে ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশে স্থায়ী প্রভুত্ব লাভ করেন, সেই যুদ্ধে রাজা বলবন্ত সিং ইংরেজদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের সন্ধি-অনুসারে যদিও বেনারস অযোধ্যার নবাব-নাজিরকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধি-সর্তে স্পষ্ট লিখিত ছিল যে, বেনারসের শাসনকার্য্যে রাজা বলবন্ত সিংহের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে এবং অযোধ্যার নবাব-নাজির উহাতে একেবারেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। রাজা বলবন্ত সিং গঙ্গাপুর হইতে তাঁহার রাজধানী রামনগরে স্থানান্তরিত করিয়া সেইখানে একটী দুর্গ ও ক্ষুদ্র নগর নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরে অযোধ্যার নবাবেরা অনেকবার বলবন্ত সিংকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি তাঁহার সহায় ছিল বলিয়া নবাবগণের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বেনারসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইংরেজদের সহায়তা।

বলবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ বাধিল। চৈৎ সিং বলবন্ত সিংহের পুত্র বলিয়া সিংহাসনের দাবী করিল; অপর দিকে বলবন্ত সিংহের দৌহিত্র মহীপনারায়ণ বলিল,—"বলবন্ত সিংহের পুত্র ছিল না, তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ছিল; সেই কন্যার সহিত ত্রিহুতের অন্তঃপাতী নারহান গ্রামের দিগ্বিজয় সিংহের বিবাহ হইয়াছিল। আমি সেই দৃগ্বিজয় সিংহের পুত্র; এই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।" কিন্তু তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল

ওয়ারেন হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের দাবীরই সমর্থন করেন ; সুতরাং চৈৎ সিং বেনারসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এগার বৎসর পরে চৈৎ সিং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরাগ-ভাজন হন এবং ফলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হয়। অতঃপর মহীপনারায়ণকে ডাকাইয়া আনাইয়া বেনারসের সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া হয়। রাজ্যশাসনের শক্তি মহীপ-নারায়ণের একেবারেই ছিল না। তাঁহার রাজ্যে বিস্তর দুষ্টলোক বাস করিত ; তাহাদিগকে তিনি শাসন করিতে পারিতেন না। দেশের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং প্রজারা সকলে পলাইতে আরম্ভ করিল। কাজেই খাজনার পরিমাণ কমিয়া গেল এবং রাজা গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কর দিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন. অতঃপর মহীপ নারায়ণ বেনারসের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট মিঃ ডানক্যানের পরামর্শক্রমে ভাদোহী, গঙ্গাপুর এবং কেরামনংরাউর (চাকিয়া) পরগণা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পরগণা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিলেন ; স্থির হইল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই এই সকলের শাসন-ব্যবস্থা করিবেন ; বেনারসের মহারাজা উহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ভাদোহী, গঙ্গাপুর, এবং কেরামনংরাউর—এই তিন পরগণা রাজা নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিলেন এবং কর্ণদণ্ডী তালুকের উপর কতকগুলি বিশেষ অধিকার রাখিবার দাবী করিলেন ; কিন্তু বেনারসের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাজার সে দাবী পূরণ করিতে সম্মত হইলেন না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে জমিদারী অর্পণ।

ভাদোহী, গঙ্গাপুর ও কেরামনংরাউর—এই তিন পরগণা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বেনারসের রাজাদিগের খাস পারিবারিক সম্পত্তি ছিল। বেনারসের রাজারা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের

৭ আইন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৪ আইন অনুসারে ঐগুলির শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বেনারস প্রদেশ যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করা হয়, তখন স্থির হয়, (১) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বেনারস প্রদেশের শাসনাদি-সংক্রান্ত ব্যয় বাদ দিয়া যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা রাজাকে প্রদান করিবেন এবং (২) বেনারস প্রদেশের রাজস্ব-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিবার এবং দাখিলা ও ফারিগখাতিসে স্বাক্ষর করিবার অধিকার রাজার থাকিবে। প্রথম সর্ত্ত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করেন যে, সমস্ত প্রদেশে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইবে এবং খরচের পরিমাণও নির্দ্ধারিত করা হইবে। এই সংকল্প অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজাকে উদ্বৃত্ত রাজস্বের হিসাবে বৎসরে এক লক্ষ টাকা দিবেন, ইহা স্থির হইল। (২) দ্বিতীয় সর্ত্ত সম্বন্ধে প্রথমে স্থির হইল যে, রাজার তরফ হইতে চারিজন দেওয়ান-নিজামৎ নিযুক্ত হইবেন; ইঁহারা বেনারস প্রদেশের চারিটী জেলার চারিটী সদরে অর্থাৎ বেনারস, মির্জ্জাপুর, গাজিপুর ও জৌনপুরে থাকিবেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব আদায় করিবেন তাহার হিসাব পরিদর্শন করিবেন। এই চারিজন দেওয়ান-নিজামতের বেতন ও দপ্তরখানার খরচ রাজস্ব হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন। নিজামৎগণ স্বাক্ষরের জন্য দাখিলা ও ফারাগখাতিস রাজার নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা-অনুসারে কার্য্য করিতে বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে স্থির হইল যে, রাজস্বের হিসাবপত্র দেখিবার ও দাখিলা প্রভৃতিতে স্বাক্ষর করিবার অধিকার রাজা ত্যাগ করিবেন এবং তিনি দেওয়ান-নিজামৎ রাখিবার জন্য বার্ষিক যে ১৪, ৮৫৬৲ টাকা খরচ হইত, সেই টাকা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বেনারস-রাজকে (তিনি দেওয়ান

নিজামৎ রাখুন বা না রাখুন) প্রদান করিবেন। বেনারস সহর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিবার সময়ে আবগারীর আয় হইতে বেনারস-রাজ বঞ্চিত হইলেন; তাহারই ক্ষতিপূরণস্বরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বেনারসের রাজাকে বার্ষিক ৪৫৬২৲ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক আয়।

সুতরাং বেনারস-রাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উক্ত সর্ত্ত অনুসারে নিম্নহিসাবে বৎসরে ১,১৯,৪১৮৲ টাকা পাইয়া থাকেন—(ক) প্রদত্ত পরগণা-সমূহের উদ্বৃত্ত রাজস্ব বাবদে ১ লক্ষ টাকা; (খ) দেওয়ান-নিজামৎ ও উঁহাদের দপ্তরখানার খরচ বাবদে—১৪,৮৫৬ টাকা এবং (গ) আবগারীর আয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য ৪৬৫২৲ টাকা। ইহা ব্যতীত কর্ণদত্তী তালুকের আদায়ী রাজস্বের শতকরা দশভাগ অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১০০০৲ টাকা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বেনারস-রাজ প্রাপ্ত হন।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বেনারস প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। প্রত্যর্পণের সর্ত্ত রাজা মহীপনারায়ণ সিংহের সহিতই হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা উদিৎ নারায়ণ সিং ও রাজা ঈশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহের সহিতও পূর্ব্ব সর্ত্তে আবদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে বেনারস প্রদেশের প্রকৃত অধিকারী এবং বেনারসের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং বারাণসী সহর বা বেনারস জেলার সহিত প্রকৃত পক্ষে কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও অদ্যাবধি তাঁহারা বেনারস-রাজ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মহীপনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র উদিৎনারায়ণ সিং রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। রাজা উদিৎ-নারায়ণের পুত্রসন্তানাদি ছিল না; এইজন্য তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র

কাশীর যুবরাজ—কুমার আদিত্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রাজা উদিৎ নারায়ণের পর রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেনারসের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় ও পোষ্যপুত্র মহারাজা স্তর প্রভুনারায়ণ সিং বেনারসের রাজপদ লাভ করেন। ইনি এক্ষণে বেনারসের বর্ত্তমান অধীশ্বর।

রাজা উদিৎনারায়ণ সিং সুতীক্ষ্ণবিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বেনারস প্রদেশে এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাহাবাদ ও সাহাবাদ জেলায় বিস্তর জমিদারী ক্রয় করিয়া যান; অতঃপর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ জমিদারীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেন। বর্ত্তমান মহারাজের জমিদারীতে (গঙ্গাপুর পরগণা ধরিয়া) ১১৭২ গ্রাম ও ৩৩৩টী পট্টি আছে। ইহার বার্ষিক আয় ৯,০২, ২২৪৲ টাকা; গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া ৩,৪০,৫৪০৲ টাকা থাকে।

রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিং সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এইজন্য ইঁহার ও ইঁহার বংশধরগণের সম্মানের জন্য ১৩ বার তোপধ্বনি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনি মহারাজা উপাধি লাভ করেন; পরে ইঁহাকে জি সি এস আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর মহারাজা উপাধি ইঁহার বংশধর কাশীর বর্ত্তমান অধীশ্বরকে দেওয়া হয়।

সিপাহী বিদ্রোহে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে কাশীর বর্ত্তমান অধীশ্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি কে সি আই ই এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জি সি আই ই উপাধি লাভ করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট

ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাশীর বর্ত্তমান মহারাজকে স্বাধীন শাসনাধিকার প্রদান করিতে এবং ভাদোহী চাকিয়া রামনগর দুর্গ এবং ইহার নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম লইয়া বেনারস-রাজ্য নামক সামন্তরাজ্য গঠিত করিতে সংকল্প করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল তারিখে এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয়।

স্বতন্ত্র সামন্ত রাজ্য।

১৯১৪-১৯ খৃষ্টাব্দ-ব্যাপী ইউরোপীয় মহাসমরের সময়ে বেনারস-রাজ্য ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে যে সাহায্য প্রদান করেন তাহার ফলে বেনারসের মহারাজার সম্মানসূচক তোপধ্বনির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩ হইতে ১৫ হয়। এতদ্ব্যতীত ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনারারী লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল করেন এবং 'মহারাজা'-উপাধি বংশানুক্রমিক করিয়া দেন।

বৰ্দ্ধমান-রাজবংশ।

বর্দ্ধমান রাজবংশ অতীব প্রাচীন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম আবু রায়, ইনি জাতিতে কপূর ক্ষত্রিয়। আবু রায় পঞ্জাব হইতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া বর্দ্ধমানে বসবাস স্থাপন করেন। অতঃপর ইনি ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পরগণার ফৌজদারের অধীনে চৌধুরী ও কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত হন। আবু রায় বহু অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর ইহার পুত্র বাবু রায় ইহার বিস্তৃত ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হন। ইনিই

প্রতিষ্ঠাতা।

বৰ্দ্ধমানের জমিদারী ক্রয় করিয়া প্রকৃতপক্ষে বংশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রতিপত্তির বীজ বপন করেন।

ইঁহার পর ঘনশ্যাম রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায় আরও কতকগুলি জমিদারী অর্জ্জন করেন। দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর কৃষ্ণরাম রায়কে একটী ফরমান দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে চেতুয়া ও বরদার তালুকদার শোভা সিংহ আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁর সাহায্যে কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং তাঁহার জমিদারী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিহত ও তাঁহার পরিবারবর্গকে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণ-রামের পুত্র জগৎরাম পলায়ন করিয়া ঢাকায় উপস্থিত হন। তিনি ঢাকার শাসনকর্ত্তার নিকট বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য সৈনিক-সাহায্য প্রার্থনা করেন। শোভাসিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের এক সুন্দরী কন্যার ধর্ম্মনাশের উপক্রম করিলে, সেই সাহসিকা কন্যা বস্ত্রমধ্যে লুকায়িত ছুরিকা দ্বারা শোভাসিংহকে নিহত করেন। অতঃপর শোভাসিংহের সৈন্যগণ বৰ্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া হুগলি আক্রমণ ও অবরোধ করেন; এখান হইতে পরে তাহারা বিতাড়িত হয়। এই সৈন্যদলের অনেকেই হতাহত হইয়াছিল। সুতানুটীতে ইংরাজেরা, চন্দন নগরে ফরাসীরা এবং চুঁচুড়ায় ওলন্দাজেরা বিদ্রোহীদিগের প্রভাব দেখিয়া নবাব-নাজিমের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে, তাঁহাদের কুঠীগুলিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ ও ক্ষমতা দেওয়া হউক। নবাব তাঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং নবাবের আদেশ অনুসারে তাঁহারা তাঁহাদের কুঠীসকল সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। শোভা-সিংহের মৃত্যু ও তাঁহার সৈন্যগণের ছত্রভঙ্গ হইবার সংবাদ পাইয়া

শোভাসিংহের সহিত যুদ্ধ।

শোভাসিংহের মৃত্যু।

জগৎরাম রায় ঢাকা হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসেন এবং অল্পায়াসেই পিতৃসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। সম্রাট্ আলমগীর তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে জগৎরাম রায়ের মৃত্যু হয়।

জগৎরাম রায়।

তিনি দুই পুত্র রাখিয়া যান; একজনের নাম কীর্ত্তিচাঁদ রায় ও অপরের নাম মিত্ররাম রায়। বংশের নিয়ম-অনুসারে জ্যেষ্ঠ কীর্ত্তিচাঁদ বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি বাদশাহ আলমগীরের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়াছিলেন। তিনি ছাতুয়ান, ভুরস্থট, বরদা, মনোহরসাহী পরগণাগুলি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ঘাটালের নিকটে চন্দ্রকোণা ও বরদার রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কীর্ত্তিচাঁদ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের জমিদারী কাড়িয়া লন। হুগলি জিলার অন্তর্গত তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বলাগড়ের রাজার কয়েকটী জমিদারী তিনি অধিকার করিয়া লন। জমিদারী-লাভের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু বর্গীদিগের আক্রমণ সম্মিলিত-ভাবে রোধ করিবার জন্য তিনি বিষ্ণুপুর-রাজের সহিত সন্ধি করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিচাঁদের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র চিত্রসেন রায় পিতৃ-স্থলাভিষিক্ত হন। ইনি আরও কতকগুলি জমিদারী হস্তগত করেন। সম্রাট্ সাহ আলম ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা চিত্রসেনের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ওরফে তিলকচাঁদ রায়কে প্রদান করিয়া যান।

কীর্ত্তিচাঁদ রায়।

সম্রাট সাহ আলম এই তিলকচাঁদকে "মহা-রাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে "পঞ্চহাজারী জাট্" ৫০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের

তিলকচাঁদ।

নেতা করিয়া দেন। তিলকচাঁদের জীবিতকালে বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা প্রবল হইয়া উঠে এবং বর্গীরা বিস্তর ধন-সম্পত্তি বাঙ্গালা দেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার পুত্র তেজচন্দ্র রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দিল্লীর সম্রাট সাহ্ আলম পিতৃ-উপাধি পুত্রকেও প্রদান করিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জমিদারীর পরিচালন-ভার মহারাজা তেজচন্দ্রের হস্ত হইতে তাঁহার মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সম্পত্তির পরিচালনভার পুনরায় মহারাজা তেজচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে মহারাজা তেজচন্দ্র ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত এই সর্ত্ত করেন যে, তিনি নিয়মিত ভাবে প্রতি বর্ষে ৪০,১৫,১০৯৲ টাকা কর প্রদান করিবেন এবং বাঁধ রক্ষা ও সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তে বার্ষিক ১,৩৯,৭২১৲ টাকা দিবেন। কিন্তু জমিদারীর কার্য্য নিতান্ত অসাবধানভাবে পরিচালিত হওয়ায় মহারাজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্টের খাজনা বাকী পড়িতে লাগিল; এমন কি রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর যিনি জমিদারীর ক্রোক-সুজাওয়াল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী হইলেও ইহার কিছুই করিতে পারিলেন না। গভর্ণমেণ্ট মহারাজা তেজচন্দ্রকে তাঁহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিবার ভয় দেখাইলেও বিশেষ কোন ফল হইল না। কাজেই ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ বোর্ড মহারাজা তেজচন্দ্রের বিপুল জমিদারী আংশিক ভাবে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। কয়েকখানি গ্রাম লইয়া এক একটি লাট হয় এবং সেই সকল লাট নিলামে উঠে। এই সময়ে এইসকল লাটের কতকগুলি সিঙ্গুরের

মহারাজা তেজচন্দ্র
১৭৭১—১৮৩২

দ্বারকানাথ সিংহ, ভাস্তাড়ার ছকু সিংহ, জনাইয়ের মুখোপাধ্যায়-বংশ তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ ক্রয় করেন। মহারাজা তেজচন্দ্র বেনামী করিয়া এই সকল লাটের অধিকাংশই ক্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই চেষ্টা সফল হইলে তিনি প্রায় সমস্ত জমিদারীই রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু হইল এবং এইজন্য তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহারাজা জমিদারীগুলি স্থায়ী পত্তনি দিয়া এই ক্ষতিপূরণ করিয়া লইলেন। জমির কদর ও মূল্য বাড়াইবার জন্য তিনি বৰ্দ্ধমান হইতে কালনা পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়া দেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে মগরায় একটি সেতু নির্ম্মাণ করেন এবং বৰ্দ্ধমান সহর ও সহরের উপকণ্ঠসমূহের সংস্কার ও উন্নতি-সাধন করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই সময়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সূত্র লইয়া গোল বাধে। মহারাজা তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদের পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি এক ব্যক্তি জাল প্রতাপ-চাঁদ সাজিয়া বৰ্দ্ধমান রাজ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করে। তাহার দাবী অগ্রাহ্য হয় এবং সম্পত্তি মহারাজা তেজচন্দ্রের পোষ্যপুত্র মাহতবচাঁদ রায়ের হস্তে অর্পিত হয়।

মহারাজা মাহতবচাঁদ রায়
১৮৩২—৭৯

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে মাহতবচাঁদ রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে তিনি বৰ্দ্ধমানের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তদানীন্তন গভর্ণর-জেনেরাল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে তাঁহাকে "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে

পরলোকগতা ভারতসম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহারাজা মাহতবচাঁদ ও তাঁহার বংশধরগণকে অস্ত্র ও সিপাহী রাখিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী সহরে যে বিরাট দরবার হয় সেই দরবারে মহারাজাধিরাজ মাহতবচাঁদ ব্যক্তিগত সম্মানের হিসাবে ১৩টি তোপ পাইয়াছিলেন। কি স্বদেশ-হিতৈষীরূপে, কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজভক্ত প্রজা হিসাবে তাঁহার মত জমিদার বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না। তিনি তাঁহার বিশাল জমিদারী এরূপ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করিতেন যে, তাঁহার সময়ে বৰ্দ্ধমান-রাজের জমিদারীসমূহ সবিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজা হস্তী ও গো-শকট দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুবৃহৎ জমিদারীর পথঘাট গভর্ণমেণ্টের লোকলস্কর,সৈন্য ও রসদ যাইবার জন্য খোলা ও পরিষ্কার রাখিয়াছিলেন। কলিকাতার যাদুঘরে মহারাজা মাহতবচাঁদ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি মৰ্ম্মর-মূৰ্ত্তি প্রদান করেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন মহা-সমারোহে সেই প্রতিমূৰ্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। মহারাজা মাহতবচাঁদ বাঙ্গালার জমিদারগণের অগ্রণী ছিলেন। তিনি বিশেষ ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিতেন। তিনি কালনা ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার পূৰ্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান ও দেবালয়সমূহ বজায় রাখিয়া-ছিলেন। তিনি বৰ্দ্ধমানে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর বালকেরা পড়িতে পাইত। এই স্কুলটি এক্ষণে কলেজে পরিণত হইয়াছে। তিনি দরিদ্র রোগীদিগের জন্য বৰ্দ্ধমান ও কালনায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। প্রজা এবং

অর্থীদিগকে দান করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। ইহা ব্যতীত দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। বর্দ্ধমানের ভীষণ সংক্রামক জ্বরের সময় এবং উড়িষ্যা ও বিহারের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রভূত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ-নিবারক ফণ্ডে দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে তাঁহার একটি নিজস্ব পশুশালা ছিল। আলিপুরের সরকারী পশুশালার তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহারাজা মাহতবচাঁদ স্বয়ং সুশিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় উৎসাহ-দানের জন্য বহু অর্থ দান করিয়া ছিলেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসরের উপরকাল কয়েক জন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া ছিলেন। দেশ-হিতকর কার্য্যের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করেন। সে সময়ে দেশীয়ের পক্ষে এরূপ সম্মানলাভ বড়ই বিরল ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত।

তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী—অধিকতর উৎকৃষ্টভাবে পরিচালিত করিবার জন্য কয়েকজন দায়িত্বপূর্ণ পরামর্শদাতাকে লইয়া একটি মন্ত্রণা-পরিষৎ গঠন করেন। এক এক পরামর্শদাতা এক এক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কতকটা গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের অনুকরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রণা-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট বা অধিনায়ক ছিলেন। সেই সময়ে বাঙ্গালার কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার অনেক কাজ করিয়াছিলেন।

বৰ্দ্ধমান রাজধানী বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকার উপর রাজস্ব প্রদান করেন। মহারাজা মাহতবচাঁদ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর ভাগলপুর সহরে লোকান্তরিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। জনপ্রিয় হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার একেবারেই ছিল না---এইজন্য নীরবে তিনি দেশের ও দশের সেবা করিয়া যাইতেন। যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁহাদের সহিত তিনি বেশ খোলাখুলিভাবে মিশিতেন; পদমর্য্যাদা বা অর্থের মাৎসর্য্য সে মেলামেশার পথে বিন্দুমাত্র বাধা দিত না, ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তিনি বহুকাল ধরিয়া ইউরোপীয় ও দেশীয়গণের সম্মানের পাত্র ছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায়েই বড় বড় ব্যাপারে তাঁহাকে অগ্রণী করিবার জন্য উৎসুক হইতেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মাহতবচাঁদের পোষ্যপুত্র আপতাপ চাঁদ মাহতপ বর্দ্ধমানের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু

মহারাজ আপতাপ চাঁদ
১৮৭৯—৮৫।

দুঃখের বিষয়, ইনি ইঁহার পিতা ও পিতামহের ন্যায় দীর্ঘজীবী হন নাই; তবে ইনি অল্প-কালের মধ্যেই অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের পাবলিক লাইব্রেরী, রাজকলেজ, জলের কল, আপতাব ক্লাব প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানগুলি তাঁহারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার অল্পবয়স্কা বিধবা পত্নী, তাঁহার পালয়িত্রী রাজমাতা মহারাণী ও তাঁহার পালক পিতার বিধবা কন্যাকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। মহারাজা আপতাপচাঁদ তাঁহার উইলে তাঁহার বিধবা পত্নীকে এই মর্ম্মে আদেশ করিয়া যান যে, তাঁহার মৃত্যুর পর যত শীঘ্র সম্ভব যেন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়;

কিন্তু তাঁহার পত্নী অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন বলিয়া কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ জমিদারী পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং মৃত মহারাজার উইলের সর্ত্ত অনুসারে তাঁহার বিধবা পত্নীকে তাঁহাদের রক্ষণাধীন করিলেন। এই সময় নানারূপ গোলযোগের সূত্রপাত হইল, রাজ-পরিবারের মহিলাবর্গ পরস্পর মামলায় প্রবৃত্ত হইলেন; মিঃ ডি বার্গ-গিলার রাজষ্টেটের অন্যতম জয়েণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। তিনি ১৮৮৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অবশেষে আপতাপচাঁদের বিধবা পত্নী মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মাহতব বাহাদুরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্ট এই পোষ্য-পুত্র-গ্রহণ-ব্যাপার অনুমোদন করেন।

বিজয়চাঁদ মাহতব ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রাজা বনবিহারী কপূর সি, এস্, আই পরলোকগত মহারাজা মহাতব চাঁদের আমল হইতে অর্থাৎ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বৰ্দ্ধমান রাজষ্টেটের জয়েণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। ইনি যে কেবল অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সহিত জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিতে ব্যাপৃত ছিলেন তাহা নহে; নিজ পুত্রকে সুশিক্ষিত ও রাজপদের উপযুক্ত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করিতেন। তিনি তাঁহার এই কর্ত্তব্য এইরূপ যথেষ্টভাবে পালন করিয়াছিলেন, এবং মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদকে সুশিক্ষা দিবার জন্য এরূপ সুনির্ব্বাচিত শিক্ষক ও সহচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বঙ্গদেশের একজন স্বনামধন্য পুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি চরিত্রবলে বলীয়ান, অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিবৃত্তিশালী এবং নিজ উচ্চ পদের দায়িত্ব তিনি পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

বিজয়চাঁদ মাহতব।

বর্দ্ধমান-রাজের জমিদারী ১৯টি বিভিন্ন জেলায় আছে; সমস্ত জমিদারীর পরিমাণ ৪,২০০ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষের উপর। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ষ্টেটের ভার গ্রহণ করেন, তখন খাজনা ও সেসের পরিমাণ ৪৪,৭৩,৭৭৮৲ টাকা হইয়াছিল। পরে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ যখন এই ভার ছাড়িয়া দেন, তখন উক্ত টাকার পরিমাণ ৪৭,৩৯,২১০৲ টাকায় উঠিয়াছিল। এই সময়ে বর্দ্ধমান-রাজকে ৩৫,৫৭,৫৪৪৲ টাকা রাজস্ব দিতে হইত; সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের ইহাতে বার লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পরিদর্শনকালে এই টাকা হইতে সাধারণের স্থায়ী হিতকর অনেক কার্য্য করা হইত। জমিদারীর আগাগোড়া জরীপ হইয়াছিল। এই সময়ে ষ্টেটের সর্ব্বত্র যে সকল ইজারত ছিল সেগুলি সংস্কৃত করা হইয়াছিল; কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে কয়েকখানি নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল; স্কুল এবং হাঁসপাতাল-সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল ও তাহাদের পরিচালনার জন্য ষ্টেট হইতে টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল; রায়তদিগের উপকারের জন্য একটি আদর্শ কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় সতের বৎসরের অধিক কাল ষ্টেটের কার্য্য পরিচালনা করিয়া কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে ষ্টেটের পরিচালনভার ত্যাগ করেন। এই সময়ে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উঠেন। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ইঁহার হস্তে ষ্টেট ন্যস্ত করিবার সময় নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি অর্পণ করেন :—

১। বার্ষিক ৪৭৷৷০ লক্ষ টাকা খাজনার জমিদারী।

২। ১৪ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ।

৩। নগদ ১১৷৷৹ লক্ষ টাকা।

৪। রাজপরিবারের সুসংস্কৃত ও পুনঃনির্ম্মিত অলঙ্কারসমূহ।

৫। সুবৃহৎ জমিদারী যাহার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নিষ্পন্ন হইতেছিল।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাসমারোহে ও উৎসব সহকারে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বাঙ্গালার তদানীন্তন অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা স্যার জেমস বোর্ডিলন কে সি এস্ আই অভিষেকসভায় উপস্থিত থাকিয়া মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদকে অভিনন্দিত করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী সহরে যে অভিষেক-দরবার হয় তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান-রাজের "মহারাজাধিরাজ" উপাধি বংশানুগত করিয়া দেন। ইহার একমাস পরে তিনি অতিরিক্ত "বাহাদুর"-উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে তিনি কে সি আই ই উপাধি লাভ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লী সহরে ভারত সম্রাটের অভিষেক-উপলক্ষে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ কে সি আই ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতার ওভারটুন হলে এক সভা হয়, সেই সভায় বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট সার এনড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে জনৈক আততায়ী রিভলভার উত্তোলন করিলে, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মাহতব বাহাদুর সার এনড্রু ফ্রেজারের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং আততায়ী ও ছোটলাট বাহাদুরের মধ্যে দণ্ডায়মান হন; তিনি নিজ শরীর দিয়া ছোটলাট বাহাদুরকে একরূপ আবৃত করিয়াই রাখিয়াছিলেন। এই বিশিষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'ইণ্ডিয়ান অর্ডার অফ মেরিটে'র 'সিভিল ডিভিসনে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্মানিত করা হয়।

মহারাজাধিরাজ শ্যার বিজয়চাঁদ মাহতব বাহাদুর দানে মুক্তহস্ত বলিয়া জনসাধারণে প্রসিদ্ধ। কয়েকটি প্রধান প্রধান দানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বর্দ্ধমানের ফ্রেজার হাঁসপাতাল-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা।

২। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যুবরাজের অভ্যর্থনা-সমিতির অর্থ-ভাণ্ডারে ৫,০০০৲ টাকা।

৩। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট-দম্পতীর অভ্যর্থনা ভাণ্ডারে ১০,০০০৲ টাকা।

৪। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে দামোদরের বন্যা-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য ১২,৫০০৲ টাকা।

৫। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত প্রবাসী ভারত-সন্তানগণের সাহায্য-ভাণ্ডারে ৩,০০০৲ টাকা।

৬। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান রিলিফ ফণ্ডে ১৫,০০০৲ টাকা।

৭। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ভারতীয় সৈনিকগণের সেবা-শুশ্রূষা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য (যত দিন যুদ্ধ চলিবে তত দিন) মাসিক ১,০০০৲ টাকা।

৮। যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে নিহত ভারতীয় সৈনিক-বর্গের বিধবা পত্নী ও আত্মীয়গণের সাহায্যার্থ মহারাণী অধিরাণী মাসিক ৩০০৲ টাকা করিয়া দান করেন।

৯। মহারাজাধিরাজ-কুমার উদয়চাঁদ মাহতব ও তাঁহার ভগিনীগণ যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নিহত ভারতীয় সৈনিকগণের অনাথসন্তান সন্ততি-গণকে সাহায্য করিবার জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা প্রদান করেন।

১০। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানে সের আফগান, নবাব কুতুবুদ্দিন এবং ফকির বাহরাম সাক্কার সমাধিস্তম্ভ-সংস্কারের জন্য ১,০৮০৲ টাকা দান করেন।

১১। বর্দ্ধমান ফ্রেজার হাঁসপাতালে স্ত্রী-রোগীদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাটী-নির্ম্মাণার্থ ১০,০০০৲ টাকা দান করেন।

১২। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ভলানটিয়ার অ্যাম্বুলেন্স কোরের প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে ২০,০০০৲ টাকা প্রদান করেন।

১৩। কলিকাতার মহাকালী পাঠশালায় ৩,০০০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি করেন।

১৪। বেলগেছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের জন্য তিনি ১০,০০০৲ টাকা দান করেন।

১৫। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লেডি হার্ডিঞ্জ স্মৃতিভাণ্ডারে ১,৫০০৲ টাকা প্রদান করেন।

দেশ-সেবায় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সর্ব্বদাই অগ্রণী। দেশের কার্য্যে তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ যথেষ্টই আছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ আইন প্রবর্ত্তিত হইলে বর্দ্ধমান বিভাগের ভূস্বামিগণ তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারিবর্গের প্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার নির্ব্বাচনের সময়ও তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের জমিদারগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসণের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারত-সন্তানগণের প্রতি ট্রান্সভালের গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ-

কল্পে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সেই সভায় নেতৃত্ব করিয়া ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "ইণ্ডিয়ান ওয়ার রিলিফ ফণ্ডের" বঙ্গীয়-শাখার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নিয়োজিত করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে "ওমাগাটামারু" নামক জাহাজে ব্রিটিশ কলম্বিয়া হইতে এক দল শিখ যাত্রী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বজবজ নামক স্থানে অবতরণ করে। এই ব্যাপারের সংস্রবে বজবজ গ্রামে যে শোচনীয় দাঙ্গা ঘটিয়াছিল এবং যাহাতে এক পক্ষে কয়েক জন রাজপুরুষ ও অপর পক্ষে কয়েক জন শিখ যাত্রী হতাহত হইয়াছিল, সেই দাঙ্গার সম্পর্কে ভারত-গভর্ণমেণ্ট এক তদন্ত কমিটী নিয়োগ করিয়া ছিলেন; গভর্ণমেণ্ট মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার টাউন হলে য়ুরোপীয় মহাসমরের সময়ে সম্রাটের প্রতি অকপট রাজভক্তি ও আনুগত্য প্রকাশ এবং যুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায়-জ্ঞাপনের জন্য যে বিরাট সভা হইয়াছিল, মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মাহতব বাহাদুর উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সম্পর্কে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে কলিকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের "ভাসমান হাঁসপাতাল" অর্থাৎ হাঁসপাতাল-জাহাজের নাম-করণ উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ ও উৎসব হয়। এতদুপলক্ষে মহারাজাধি-রাজ বাহাদুর বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে হাঁসপাতাল-জাহাজের নামকরণের অনুরোধ করিবার প্রসঙ্গে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ছিলেন তাহা অতীব সময়োচিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার অধিবাসিগণ টাউন-হলে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত গঠনপদ্ধতির আলোচনার

জন্য এক বিরাট সভার আহ্বান করেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সভায় অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনি জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ কলিকাতা সহরে যাহাতে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তাহার সময় আসিয়াছে। আমরা প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসনই চাই, ভুয়া স্বায়ত্ত শাসন চাহি না।

বঙ্গ-সাহিত্যে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অসীম অনুরাগ। তিনি কেবল সাহিত্যের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক নহেন, স্বয়ং একজন সুলেখক।

ইনি বাঙ্গালা মাসিকপত্রেও লিখিয়া থাকেন। 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রে তদ্‌রচিত "য়ুরোপ ভ্রমণ" ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বর্দ্ধমান সহরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আহ্বানে "অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনে"র অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দেড় হাজার প্রতিনিধির সমাবেশ হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্বয়ং "অভ্যর্থনা-সমিতির" সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি সম্মিলনের প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গে যে ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অকপট দেশপ্রীতি, বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অসামান্য অনুরাগ, বাঙ্গালার সমাজ, বাঙ্গালার ধর্ম্ম, বাঙ্গালার অতীত গৌরব প্রভৃতির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ফুটীয়া উঠিয়াছিল।

শান্তি-সংসদের কার্য্যে বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের তদানীন্তন অমাত্য স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (এক্ষণে লর্ড সিংহ) বিলাত গমন করিলে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে তাঁহার স্থলে বাঙ্গালা শাসন পরিষদের অন্যতম অমাত্য-পদে বৃত করেন। তদবধি তিনি শাসন-পরিষদের অমাত্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশশাসন-কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতেছেন।

তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন:—(১) The Impressions; (২) Studies (৩) Meditations; (৪) বিজয়-গীতিকা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ; (৫) গায়ত্রী; (৬) কতিপয় পত্র; (৭) একাদশী; (৮) ত্রয়োদশী; (৯) পঞ্চদশী; (১০) আবেগ; (১১) বিজন-বিজলী; (১২) রসপঞ্চ; (১৩) ত্রিচিত্র; (১৪) শিবশক্তি; (১৫) কমলাকান্ত; (১৬) মানস-লীলা (১৭) চন্দ্রজিৎ।

মুক্তাগাছার আচার্য্য-বংশ।

প্রশস্তি।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আদি পুরুষ।

(১০৮৮-১২৫২ খৃঃ)

স্বনামপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মহানুভব উদয়নাচার্য্য এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'ন্যায়'-দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম অমূল্য রত্ন "কুসুমাঞ্জলি" উদয়নাচার্য্য-প্রণীত। ইহাতে নিরতিশয় কৃতিত্বের সহিত বেদান্ত, সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনের মত এবং বৌদ্ধমত খণ্ডন পূর্ব্বক ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইনি কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের টীকা 'কিরণাবলী' 'আত্মতত্ত্ববিবেক' এবং বাচস্পতি মিশ্র-কৃত ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যের 'তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি' নামে এক টীকা করিয়া গিয়াছেন। ইনি একাধারে দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। যতকাল পৃথিবীতে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ অমর হইয়া থাকিবেন।

বঙ্গজননীর এই কৃতী সন্তান কেবল জ্ঞানানুশীলনেই যে সম-

সাময়িক মনীষিগণের অগ্রণী ছিলেন এমন নহে, কর্ম্মভূমিতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের ধর্ম্মনীতির অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থের মতানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছিল, এবং "ভদন্ত"গণ আর্য্য ঋষিদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় কদাচিৎ প্রতিভাত হইতেছিল। সেই দুর্দ্দিনে, সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের সেই গ্লানির দিনে, কর্ম্মবীর ভগবান্ উদয়নাচার্য্য প্রাণপণ যত্নে আর্য্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং বহু প্রকাশ্য সভায় বৌদ্ধদার্শনিক পণ্ডিতগণের সহিত তর্ক করিয়া তাহাদিগের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ইহার ফলেই জনসাধারণের হৃদয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মে। পরবর্ত্তী কর্ম্মিগণের মস্তকে বিজয়মাল্য অর্পিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে তিনিই হৃদয়-শোণিত প্রদান করিয়া কর্ম্মপথ প্রশস্ত করিয়া যান। এই মহানুভবকে লক্ষ্য করিয়া ভাদুড়ী-দিগের "বংশাবলী" নামক কুলগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে :—

> "বৃহস্পতি-সুতঃ শ্রীমান্ ভুবি বিখ্যাতমঙ্গলঃ,
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধ বিধ্বংস হেতবে ;
> খ্যাত উদয়নাচার্য্যো বভূব শঙ্করো যথা।
> ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিম্।
> স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধ বিধ্বংস কৌতুকী,
> কুল্লুকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং সমুরস্তথা।" ইত্যাদি।

ইহার মর্ম্মানুবাদ এই যে, বিশ্ববিখ্যাত-কীর্ত্তি উদয়নাচার্য্য বৃহস্পতি আচার্য্যের পুত্র। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাকরণ ও সনাতন আর্য্য-

ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই উদয়নাচার্য্যই বৌদ্ধমতের অসারতা প্রতিপাদনার্থ এবং ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত 'কুসুমাঞ্জলি' নামক সুললিত গ্রন্থ রচনা করেন। 'মনু-সংহিতা' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রখ্যাত টীকাকার কুল্লুক ভট্ট ও ময়ুর ভট্ট ইঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত ছিলেন। 'সম্বন্ধ নির্ণয়' নামক গ্রন্থের মতে বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নিসিন্দা গ্রামে উদয়নাচার্য্যের নিবাস * ছিল এবং ইনি বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

উল্লিখিত উদয়নাচার্য্যের দুই পত্নী। তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর ছয় পুত্র যথা :—(১) ভূপতি (২) ভবানীপতি (৩) চণ্ডীপতি (৪) গৌরীপতি (৫) রুদ্রাণীপতি এবং (৬) শচীপতি। উদয়নাচার্য্যের প্রথমা পত্নীর দ্বিতীয় পুত্র ভবানীপতি হইতে মুক্তাগাছার রাজবংশ এবং দ্বিতীয়া পত্নীর একমাত্র পুত্র পশুপতি (কুলীন) হইতে তাহেরপুরের রাজবংশ এবং চৌগাঁয়ের রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ভবানীপতির পুত্র গজপতি, গজপতির পুত্র অম্বুপতি। অম্বুপতির দুই পুত্র মহীপতি ও পাণ্ডব ভট্ট। উক্ত পাণ্ডব ভট্টের (১) জলধর আচার্য্য (২) চূড়ামণি আচার্য্য ও (৩) হরিহর আচার্য্য নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র চূড়ামণি আচার্য্যের একমাত্র পুত্র কামদেব আচার্য্য। তাঁহার দুই পুত্র গোপাল আচার্য্য ও নারায়ণ আচার্য্য। এই দ্বিতীয় পুত্র নারায়ণ আচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ আচার্য্য। উল্লিখিত রঘুনাথ আচার্য্যের (১) প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য (২) শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য (৩) হরেকৃষ্ণ আচার্য্য এবং (৪) রামকৃষ্ণ এই চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যই

* বর্ত্তমান মালদহের অন্তর্গত পলশা গ্রামের "ভট্টাচার্য্যবংশ" অদ্যাপি মুক্তাগাছার আচার্য্যবংশের কুলগুরু।

"আলাপ সিংহ" বা পুরাতন আলেপ সাহি * পরগণার জমিদার-স্বরূপ পুরাতন বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় কৃতিত্বে অর্জ্জিত সুবিস্তীর্ণ "আলাপ সিংহ" পরগণার অন্তর্গত মুক্তাগাছা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বর্ণনীয় মুক্তাগাছার আচার্য্য-বংশ এই কৃতী পুরুষের বংশধর এবং উত্তরাধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য ও তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির বিবরণ।

বিহঙ্গপতি যেমন সতৃষ্ণনয়নে স্বীয় কুলায় হইতে সুদূরবর্ত্তী আমিষ-খণ্ড লক্ষ্য করে, উন্নমনশীল কৃতবিদ্য যুবক শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যও তেমনি বিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে উন্নতির কেন্দ্রসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি প্রতিভা-নয়নে প্রত্যক্ষ করিলেন,—প্রবল পরাক্রমশালী নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগ্রহে বহু মুসলমান কমলার কৃপাপাত্র হইতেছেন। তাঁহার দরবারে গুণবান্ হিন্দুদিগেরও যথেষ্ট আদর আছে। স্বনামধন্য ভূপতি রায়, কিশোর রায় এবং পুঠিয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন রায় প্রভৃতি হিন্দুগণ মুর্শিদকুলি খাঁর সকল বিষয়ে হিতকারী ও পরামর্শদাতা। সুতরাং বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য সেই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী † নামক এক প্রতিভাবান্ যুবক স্বীয় সৌভাগ্য-অন্বেষণে বহির্গত হইয়া বন্ধু ও সহচরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের সহিত ১৭০৪ খৃঃ অব্দে একযোগে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমন করেন।

---

* আইন-ই-আকবরীতে "আলেপসাহী" "মমিনসাহী" নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

† এই স্বনামধন্য শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীই গোলকপুর, গৌরীপুর প্রভৃতি জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

সুশিক্ষিত প্রতিভাবান্ সুশ্রী যুবক শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য * মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে গমন করিয়া অসীম প্রজ্ঞাবলে সযত্নে আদৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও প্রখর ধীশক্তি গুণগ্রাহী নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সন্তোষবিধানে সমর্থ হইয়াছিল।

"স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ ?"

মানবের ভাগ্য, কোন সময়ে কোন সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া তাহাকে ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বা পথের ভিখারী করে, তাহা সম্পূর্ণরূপে মানবজ্ঞানের বহির্ভূত। এই ভাগ্যচক্রের বিচিত্র আবর্ত্তনে দুই পুরাতন জমিদার-বংশ নিঃস্ব এবং অপর আর একটী পরিবার উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিল।

* এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য সাতিশয় প্রিয়দর্শন ছিলেন এবং সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষার গুণে সমসাময়িক জনসমাজে সবিশেষ আদৃত হইয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত "ঢাকোগুা" গ্রাম-নিবাসী নিয়োগীবংশসম্ভূত জনৈক জমিদারের শুভদৃষ্টিতে পতিত হইয়া উক্ত গ্রামে কিঞ্চিৎ ভূমি ব্রহ্মত্রাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সপরিবারে গমন করিয়া ঢাকোগুাতে বাস করিতে থাকেন। উক্ত ঢাকোগুা গ্রাম বর্ত্তমান বগুড়া নগরের ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের মুর্শিদাবাদ যাত্রার কারণ সম্বন্ধে আর একপ্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তৎকালে 'শেলবর্ষ' পরগণা বগুড়া জেলার অন্তর্গত জনৈক মুসলমান ভূম্যধিকারীর শাসনাধীন ছিল। এক বিধবা রমণী ঐ পরগণার অন্যতর অংশভাগিনী ছিলেন। উক্ত বিধবা রমণী সরিকের অপব্যবহারে অনন্যোপায়া হইয়া স্বীয় অংশ তরফ ঝাকর ঝাকর-নিবাসী কুমারসিংহ নামক এক ব্যক্তির নিকটে কিছুদিনের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মহালটী কুমারসিংহের ন্যায় প্রবল ব্যক্তির হস্তগত হইল দেখিয়া মুসলমান ভূম্যধিকারী নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রবল অন্তরায় জ্ঞানে

বর্ত্তমান 'আলাপসিংহ' পরগণা সুবিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী'তে আলেপসাহি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পরগণা সুবিস্তৃত। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের জরিপ নক্সায় ৩,২৬,৫৫৬ একর, ২ রোড, ১১ পোল জমি, ৬০১ খানি গ্রাম এবং পরিমাণফল ৫১,০২৪ বর্গমাইল লিখিত হইয়াছে।

মোগলকুলতিলক আকবর সাহের রাজত্বকালে, মোগলমারীর

দন্ত দ্বারা অধরোষ্ঠ দংশন করিয়াই নিরস্ত হইলেন; কিন্তু কুমারসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিঃসহায়া বিধবার সম্পত্তিটুকু আত্মসাৎ করিতে লজ্জা বোধ করিলেন না।

মুসলমান্ বিধবা রমণী কুমারসিংহের অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একান্ত বিপন্না হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যকে সদাশয় ও ধার্ম্মিক জানিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যও বিধবার সাহচর্য্যের নিমিত্ত বিশ্বাসঘাতক কুমারসিংহকে সমুচিত দণ্ডদানের অভিপ্রায়ে ১৭০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ রাজ-দরবারে যাত্রা করিলেন। সৌভাগ্যের বরপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের নবাব দরবারে প্রতিপত্তি-লাভে বিলম্ব হইল না। তিনি অল্পকাল মধ্যেই মুসলমান বিধবার কার্য্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। দরবার হইতে কুমারসিংহের বিরুদ্ধে ফৌজ-প্রেরণের আদেশ বাহির করিলেন। ভাগ্য কাহারও বশবর্ত্তী নহে। পরোপকারী শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য ফৌজ লইয়া স্বয়ং ঝাকরে প্রত্যাগমন করিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বিধবার মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সুতরাং চতুর শ্রীকৃষ্ণ সেই সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া মহাত্মা রায় রঘুনন্দনের সাহচর্য্যে উত্তরাধিকারী-বিহীন তরফ ঝাকরের সম্পত্তি নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া নবাবী ফৌজসহ কুমারসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

এদিকে কুমারসিংহ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের নবাবী ফৌজসহ আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই অবিলম্বে স্বীয় আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন সুতরাং ভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইল না; তিনি সদলবলে কুমারসিংহের বাটী অধিকার করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, ঐ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

যুদ্ধের পর বাঙ্গালায় দ্বাদশ ভৌমিক কিছুদিনের জন্য স্বস্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বর্ত্তমান জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান-বংশের আদিপুরুষ ঈশা খাঁ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। এই স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ, "মসনদ আলী" উপাধি গ্রহণ করিয়া আলেপসাহি, মমিনসাহি, হুসেন-সাহি প্রভৃতি দ্বাবিংশতি পরগণায় স্বীয় অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যশালী ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় সুবিস্তীর্ণ রাজ্য বিভিন্ন জমিদারের অধীন হয়; কিন্তু 'আলেপসাহি' ও 'মমিনসাহি' এই দুইটী সুবিস্তীর্ণ পরগণা 'টিকরা' গ্রাম-নিবাসী মহম্মদ মেন্দি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর কমলার চঞ্চলতা-প্রভাবে ১৭২১ খৃঃ অব্দে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর বন্দোবস্ত-সময়ে 'আলেপসাহি' পরগণা ঘোড়াঘাট চাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে এই পরগণার ছয় আনা অংশের মালিক, পুষ্টিদালা-নিবাসী রামচন্দ্র রায় ও ভবানী দেব রায় এবং দশ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী লোরিয়াগ্রাম-নিবাসী বিনোদরাম চন্দ ছিলেন।

১৭২৫ খৃঃ অব্দে আলেপসাহি পরগণার উল্লিখিত স্বত্বাধিকারিগণ যখন রাজস্ব প্রেরণ করিতেছিলেন, তখন দস্যুগণ পথে তাহা অপহরণ করিয়া লয় এবং তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া অমানুষিক উৎপীড়নভয়ে যুগপৎ 'আলেপসাহি' পরগণার স্বত্বত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। *

ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন, দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল; সুতরাং তিনি এই সুযোগ উপেক্ষা

* জমিদারগণের উৎপীড়ন সম্বন্ধে Mr. Marsman লিখিয়াছেন,—One Nazir Ahamed is said to have subjected the Zaminders to every kind of torture when their rent fell into arrears.

করিলেন না; আলেপসাহি পরগণা-লাভে সবিশেষ যত্নবান হইলেন। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে নবাবের আদেশক্রমে তদানীন্তন কাননগো গঙ্গারাম রায়, তদন্তের নিমিত্ত আলেপসাহিতে আগমন করেন। সুচতুর শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য তাঁহার বাঞ্ছিত কয়েকটী মহলের (গ্রাম) স্বত্বপ্রদান-প্রতিশ্রুতিতে রায় মহাশয়কে আবদ্ধ করিয়া তদন্তের রিপোর্ট তাঁহার অনুকূল করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে রায় মহাশয়ও 'পরগণে আলেপসাহি' অরণ্যসঙ্কুল, অনুর্ব্বর, বিরলবাস, প্রজা দরিদ্র, খাজনার সংস্থান হয় না, ইত্যাদি রিপোর্ট প্রদান করেন।

এই সময়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং সুজা-উদ্দিন ও মির্জ্জা মহম্মদ আলির মধ্যে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ সুজাউদ্দিন নানাপ্রকার চেষ্টায় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু পরিশেষে কূটবুদ্ধি মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের মন্ত্রণা-প্রভাবে মির্জ্জা মহম্মদ আলিই জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি "আলিবর্দ্দি খাঁ" নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সুজাউদ্দিন নামমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের কৃতোপকার বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার প্রার্থনানুসারে 'আলেপসাহি' পরগণার জমিদারী তাঁহার নিজ-নামে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কৃতবিদ্য শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য ১৭২৭ খৃঃ অব্দে সুবিস্তীর্ণ আলেপসাহি পরগণার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সত্যবাদী শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতিস্মরণে কাননগো গঙ্গারাম রায়ের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে বৈলর লক্ষ্মীপুর কাজিসিমলা ও কালীবাজাই—এই চারিটি মহাল 'তালুক'স্বরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তদবধি আলেপ-

সাহির এই চারিটি মহাল তাড়াশের জমিদারদিগের অধীন রহিয়াছে। উত্তরকালে এই সকল তালুক খারিজ করিয়া কালেক্টরীর অধীন করা হয়।

স্বকৃতিবলে দুইটি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া জমিদার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য কিছুকাল শান্তিসুখসম্ভোগমানসে মুর্শিদাবাদ দরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'ঝাকরে'র বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পরে তিনি রামরাম, হরিরাম, বিষ্ণুরাম ও শিবরাম এই চারিপুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এই সংসারে স্বার্থ—কি বিষম মোহ! এই মোহে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, স্বদেশবাসী, স্বজন এমন কি সহোদরদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত অনৈক্য ও কলহ উপস্থিত হয়। জগতে অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই মহামোহের মত্ততার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। পিতৃবিয়োগের পরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ৺রামরাম আচার্য্য স্বার্থ-মোহে মত্ত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় পৃথক হইলেন এবং কিয়ৎকাল মধ্যে স্বীয় চারি আনা অংশও পৃথক করিয়া লইয়া 'আলেপসাহি' পরগণার অধীন 'বাহাদুরপুর' গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। *

বর্ত্তমান সময়ে আলেপসাহি বা আলাপসিং পরগণার যেরূপ অবস্থা দেখা যায়, আমাদের বর্ণিত সময়ে সেরূপ ছিল না। তখন মানবের বসতি অতি বিরল ছিল। যাহা ছিল, তাহাও নিতান্ত অসভ্য জাতির। অধিকাংশ স্থলই অরণ্যপরিপূর্ণ ও ভীষণশ্বাপদ-

* "ময়মনসিংহের বিবরণ" পুস্তকে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে ১১৩২—৩৩ বঙ্গাব্দে মুক্তাগাছার বর্ত্তমান জমিদার-বংশের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য পুঁটিজানার রামচন্দ্র ও ভবানী দেব রায় ।৶০ এবং লোকিয়া গ্রাম-নিবাসী বিনোদরাম চন্দ্র হইতে ॥৶০ জায়দারী দুই খণ্ড কওলা সম্পাদনে ক্রয় করেন, এইরূপ লিখিত আছে।

সঙ্কুল। ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি বন্য পশু অদ্যাপি অন্য প্রদেশ অপেক্ষা এই প্রদেশে সমধিক দৃষ্ট হয়।

৺রামরাম আচার্য্যের বাহাদুরপুরে অবস্থানকালে অপর তিন ভ্রাতাও পৈতৃক আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহাদুরপুরেই অগ্রজের সহিত বাস করিতে থাকেন এবং কিয়ৎকাল বাসের পরে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছসলিল আয়মান নদীর তীরস্থ বর্ত্তমান মুক্তাগাছা গ্রামে * সকলের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

অতঃপর তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুরাম পৃথক হইয়া বাগান বাড়ীতে স্বীয় আবাসবাটী নির্ম্মাণ করান। তিনি পৃথক হইবার পূর্ব্বে বার আনী তরফ হইতে যে দীর্ঘিকা খনন করান, তাহা অদ্যাপি 'বিষ্ণুসাগর' নামে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

দ্বিতীয় ভ্রাতা হরিরাম ও চতুর্থ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবরাম খানাবাড়ীতে একত্র বাস করিতে থাকেন। উভয় ভ্রাতা একত্র থাকিবার কালে এই বাড়ীর নাম "আট আনী" বাড়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করে।

৺শিবরাম আচার্য্যের মৃত্যুর পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র রঘুনন্দন আচার্য্য সমগ্র সম্পত্তির চারি আনা অংশের স্বত্বাধিকারী হন। ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ১১৭৬ সনে বঙ্গে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে ইতিহাসে

---

* ১৮৫০ সালের সার্ভে নকসায় এই পরগণায় ৬০১ খানি গ্রাম, ৩,২৬,৫৫৬ একর ২ রোড ১১ পোল জমি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব ৬৫,৩৯৩৲ ধার্য্য হইয়াছে। ১০২৪ বর্গ মাইল পরিমাণফল।

দরিদ্র মুক্তারাম কর্ম্মকার পিত্তলনির্ম্মিত গাছা (দীপাধার) নজর প্রদান করিয়া স্বীয় ভূস্বামীদিগকে অভিনন্দন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত রাজভক্ত প্রজা মুক্তারামের স্মৃতিরক্ষার্থ গ্রামের নাম মুক্তাগাছা করা হইয়াছিল—এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় রঘুনন্দন আচার্য্য এই সময়ে মুক্তহস্তে অন্নদান করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ উদারহৃদয় হইলেও তিনি জ্ঞাতিবিরোধে একান্ত নিপীড়িত হইয়া ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে রাজকীয় বিচারালয়ের সাহায্যে স্বীয় সম্পত্তি চারি আনী বাটোওয়ারা করিলেন এবং নূতন আবাসবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত তাঁহার অংশ 'দরি চারি আনী' এবং হরিরাম আচার্য্যের অংশ 'সাবেক চারি আনী' নামে পরিচিত হয়।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য 'ময়মনসিংহ' জিলা স্থাপন করা হয়। বেলুহার কালেক্টর মিঃ বটন এই জেলার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। তখন কালেক্টরের আফিসাদির কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। অধিকাংশ সময়েই বর্ত্তমান বেগুনবাড়ী গ্রামে কোম্পানীর কুঠীতে আফিস বসিত। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে পুণ্যাত্মা ভাগ্যবান্ রঘুনন্দনের জমিদারীর মধ্যে 'নছিরবাদ' নগর স্থাপিত হয়। তদবধি তাঁহার বংশধরেরাই এই নগরের একেশ্বর উত্তরাধিকারী আছেন।

ধার্ম্মিকপ্রবর রঘুনন্দন চরম বয়সে সকল প্রকার সুখ-শান্তির অধিকারী হইলেও অনপত্যতা নিবন্ধন অশান্তি বোধ করিতেন; এই নিমিত্ত গৌরীকান্তকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে ৺রঘুনন্দন আচার্য্য পরলোকে গমন করিলে গৌরীকান্ত রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এ সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, নিয়তির তীব্র শাসনে অকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহার বিধবা পত্নী বিমলা দেব্যা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দয়া-ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমলা দেব্যার সুশাসনগুণে প্রজারা সুখশান্তিতে বাস করিতেছিল। তিনি ৺কাশীধামে নিজ পতির নামে গৌরীকান্তেশ্বর শিব স্থাপন পূর্ব্বক বিরাট্ অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা

করেন। তাঁহার অপর্য্যাপ্ত অন্নদান-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কাশীবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্বরে তাঁহাকে রাণী বিমলা দেব্যা অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিত। অদ্যাপি ৺কাশীধামে তাঁহার বাড়ী সর্ব্বজনপরিচিত। কিছু-দিন রাজ্যশাসনাদি বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া রাণী বিমলা দেব্যা কাশীকান্ত আচার্য্যকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তিনি প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলে তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তীর্থ-পর্য্যটনে মনো-নিবেশ করেন। ৺কাশীধামে অবস্থানকালে ভরতপুরের মহারাণী তাঁহার প্রীতিস্নিগ্ধ সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "সই" সম্বোধনে সম্মানিত করেন এবং স্বীয় স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একখানি বহুমূল্য পাথর উপহার দেন। উক্ত পাথর সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজবাটীতে সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। সম্ভবতঃ বিগত ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের বিশ্ববিধ্বংসী ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ নগরস্থ সুরম্য প্রাসাদের সহিত উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাণী বিমলা দেব্যা ৺কালীঘাটের কালীমূর্ত্তির গলদেশে স্বর্ণ নির্ম্মিত মুণ্ডমালা প্রদান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি স্বীয় জমিদারীর অন্তর্গত বালিপাড়া অঞ্চলের প্রজামণ্ডলীর জলকষ্ট দূরীকরণার্থ নিজ ব্যয়ে একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়াছিলেন এবং নিজ শ্বশুরের নামে ৺রঘুনন্দনেশ্বর শিব স্থাপন করিয়া দৈনিক ভোগের ব্যবস্থা করিয়া যান। অদ্যাপি রীতিমতভাবে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া আসিতেছে। ১৮২০ খৃঃ অব্দে তিনি মুক্তাগাছায় নিজ নামে ৺বিমলেশ্বর শিব স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বর্ণকুম্ভশোভিত চিত্তবিনোদন সুদৃঢ় মঠ তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। *

---

* বিমলেশ্বর শিবমন্দিরে একখণ্ড প্রস্তরফলকে লেখা আছে ;

দ্বিধা মিত্র মা শোকে স্থাপিতো বিমলেশ্বরঃ।
নির্ম্মায় বিমলাদেব্যা বিমলেশ্বরমন্দিরম্ ॥ শকাব্দা ১৭৪২।

৺বিমলা দেব্যার স্বর্গলাভের পরে কাশীকান্ত আচার্য্য সম্পূর্ণরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ও ভোগী লোক ছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে তিনি অর্থব্যয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার জীবনের একটী মাত্র ঘটনা তাঁহার চরিত্র-জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তাহা এই :—

স্বর্গীয় কাশীকান্ত আচার্য্যের একটী প্রিয়দর্শন মাতঙ্গ ছিল। উহার সুবৃহৎ দন্ত দুইটি এমন সুন্দর যে উহা দর্শকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত। তিনি উক্ত হস্তীটীকে যতদূর সম্ভব ভালবাসিতেন। একদা মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব লোকপরম্পরায় উল্লিখিত হস্তীর সৌন্দর্য্য-খ্যাতি শ্রবণ করিয়া উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি স্বর্গীয় কাশীকান্ত আচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন যে, ঐ হস্তীটি নজর-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তিনি জমিদার কাশীকান্তকে "রাজা উপাধি" প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা জমিদার কাশীকান্ত রাজা উপাধি অপেক্ষা হস্তীটীকে প্রিয়তর মনে করিয়া উক্ত প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

৺কাশীকান্ত আচার্য্য মহাশয় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অজীর্ণরোগে দারুণ কষ্টভোগ করিতেছিলেন। বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও শেষ-জীবন রোগযন্ত্রণায় কিঞ্চিন্মাত্রও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ৺কাশীবাস মানস করিয়া নৌকাপথে ৺কাশী-যাত্রা করেন। বিধির বিধান অখণ্ডনীয়। এই যাত্রাই তাঁহার মহাযাত্রায় পরিণত হইল! ৺কাশীধামে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়াছিল।

স্বর্গীয় কাশীকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের অনপত্য অবস্থায় পরলোক-

গমনের পরে তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীস্বরূপা লক্ষ্মী দেব্যা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনিও তাঁহার স্বর্গীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পবিত্র আদর্শের অনুসরণ করিলেন। প্রজাগণ তাঁহার সদয় শাসনগুণে নিরতিশয় প্রীত হইয়া সুখ ও শান্তিভোগ করিতে লাগিল।

রাজশাসনকার্য্যে প্রাচীন দেওয়ান রুদ্রনাথ বাগচী মহাশয়ই তাঁহার সহায় ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় কর্ত্তার সময় হইতেই অতি বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় ৺লক্ষ্মী দেব্যার সকল কার্য্যেই সফলতা লাভ হইতে লাগিল। তিনি ১৮৫১ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই প্রথম দত্তকের নাম ছিল চন্দ্রকান্ত। তিনি দেখিতে অতি সুশ্রী ছিলেন।

দত্তক পুত্রগ্রহণের পরে প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষ্মী দেব্যা ভবিষ্যদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়া পারলৌকিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে আদ্যন্ত মহাভারত পাঠ শ্রবণ করেন এবং উক্ত পাঠ-সমাপ্তি দিনে সুবিখ্যাত 'দানসাগর' করিয়াছিলেন। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে অসংখ্য পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া মুক্তাগাছাতে আগমন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মহাভারত পাঠ শ্রবণ নিমিত্ত নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিভিন্ন-জাতীয় বহু হিন্দুসন্তান মুক্তগাছাতে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাণী লক্ষ্মী দেব্যার আদেশক্রমে দেওয়ান রুদ্রনাথ ঐ সকল সমাগত অভ্যাগতের বাসের নিমিত্ত "ঢুলুয়া" বিলের উপকূলে সারি সারি গৃহ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন এবং মুক্তাগাছায় প্রবেশের প্রতি প্রকাশ্য রাস্তার মুখে ভাণ্ডার-গৃহ স্থাপন করিয়া আহার্য্য-বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতব দ্রব্য এবং বহু টাকা মূল্যের বস্ত্র বিতরিত হইয়াছিল।

দানগ্রহীতারা পূর্ব্ববঙ্গে আর কখনও এরূপ দান গ্রহণ করেন নাই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। অদ্যাপি মুক্তাগাছার চতুষ্পার্শ্বস্থিত প্রাচীন লোকদের মুখে স্বর্গীয়া লক্ষ্মী দেব্যার সেই অনন্যসাধারণ "দান-সাগরে"র কীর্ত্তি-গাথা আখ্যায়িকার ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে দারুণ সিপাহী-বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিদ্রোহ এক স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বঙ্গের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। ময়মন-সিংহের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ এ ডি এইচ্ স্কেল সাহেব স্বজাতীয় স্ত্রীপুরুষের রক্ষার নিমিত্ত নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন; কোথাও উপযুক্ত আশ্রয় পাইতেছিলেন না। এই সময়ে দয়াবতী লক্ষ্মী দেব্যা নির্ভীকচিত্তে সন্ত্রস্তা ইংরেজ মহিলাদিগকে অন্তঃপুরে এবং পুরুষদিগকে বৈঠকখানায় বাস করিতে দিয়া তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষার উপায় করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণা মহীয়সী মহিলার করুণালাভে সামান্য কীট-পতঙ্গ হইতে রাজপুরুষ পর্য্যন্ত কেহই বঞ্চিত হইতেন না। তাঁহার উদার চরিত্রের প্রভাবে আত্মীয়-স্বগণ সকলেই যখন শান্তি-সুখ অনুভব করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিজের অশান্তি উপস্থিত হইল: ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার দত্তক পুত্র চন্দ্রকান্তের অকাল মৃত্যু ঘটিল!

স্নেহময়ী লক্ষ্মী দেব্যা বৃদ্ধ বয়সে যে আশাসূত্র অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন, নিয়তির আকস্মিক চক্রঘূর্ণনে সহসা তাঁহার সেই সূক্ষ্ম সূত্রগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল! তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুনরায় ভবিষ্য চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে দেওয়ান রুদ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টায় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রাম-নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র

মজুমদার মহাশয় তাঁহার পুত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে একটীকে দত্তক পুত্ররূপে প্রদান করিবেন স্থির করিয়া, বাজিতপুর হইতে সপরিবারে মুক্তাগাছায় আগমন করেন। মজুমদার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৺ ত্রিপুরাসুন্দরী স্নেহবশতঃ সর্ব্বকনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে * দত্তকরূপে প্রদান করিতে অসম্মতা হইলেন। তৃতীয় পুত্র দত্তকগ্রহণের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তকগ্রহণ আর্য্যশাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ। সুতরাং মজুমদার মহাশয় দ্বিতীয় পুত্র রাজকুমারকেই দত্তক প্রদান করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু উক্ত বালকের বয়ঃক্রম তখন কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল এই নিমিত্ত তাহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা ৺ লক্ষ্মী দেব্যার অভিপ্রেত ছিল না। তীক্ষ্নবুদ্ধি লক্ষ্মী দেব্যা আন্তরিক অনিচ্ছা গোপন করিয়া বলিলেন,—"উভয়ের মধ্যে যে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক অগ্রে আমার কোলে আসিয়া উপবেশন করিবে তাহাকেই আমি দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিব।" সরলপ্রাণা স্বর্গীয়া ত্রিপুরাসুন্দরীও এই দৈব মীমাংসায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া ৺লক্ষ্মী দেব্যার বাক্যে সম্মতা হইলেন। তদনুসারে দিন নির্দ্ধারিত হইল।

বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যই নিয়তির অধীন। আজি যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের সমুন্নত চূড়ায় অবস্থিত, কাল হয়তো সে নিয়তির তীব্র পরিহাসে পথের ভিখারী, পক্ষান্তরে আজ যে দীন পর্ণকুটীরবাসী, নিয়তির অনুগ্রহে কাল হয়তো সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে। এ ক্ষেত্রেও প্রকৃতির এই বিচিত্র নীতিই প্রকাশ পাইল। নির্দ্ধারিত দিনে, যথাসময়ে দেওয়ান রুদ্রনাথ দেবমন্দিরের

---

* ১২৫৭ সালের ২৩শে মাঘ, মাঘী পূর্ণিমার দিনে (১৮৫১ খৃঃ অব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি) প্রত্যূষে জন্ম হয় বলিয়া পূর্ণচন্দ্র নাম রাখা হইয়াছিল।

প্রাঙ্গণে গুরুপুরোহিতের সমক্ষে মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পুত্রদ্বয়ের সহিত উপস্থিত করিয়াছিলেন। এদিকে লক্ষ্মী দেব্যাও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বালক রাজকুমার দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের অট্টালিকার শোভা-দর্শনে ব্যাপৃত রহিয়াছে, ইত্যবসরে সৌভাগ্যের বরপুত্র পূর্ণচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে 'মা মা' বলিয়া হাসিতে হাসিতে যাইয়া লক্ষ্মী দেব্যার ক্রোড়ে উপবেশন করিল। তিনিও তাহাকে সস্নেহে শিরশ্চুম্বন করিয়া "পুত্র" সম্বোধন করিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া মানবের সম্পূর্ণ অসাধ্য জানিয়া, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জননী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী অগত্যা তাঁহার বার্দ্ধক্যের স্নেহময় ধন পূর্ণচন্দ্রকেই দত্তক দিতে বাধ্য হইলেন। মহাসমারোহে দত্তকগ্রহণকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী এই দ্বিতীয় দত্তকের নাম রাখিলেন—"সূর্য্যকান্ত"। এই সময়ে ইঁহার বয়স সাত বৎসর মাত্র।

স্বর্গগতা লক্ষ্মী দেব্যাও বহুতীর্থ পর্য্যটন করেন। তিনি কামাখ্যা তীর্থে ৺কামাখ্যাদেবীকে স্বর্ণমুকুট প্রদান করেন। তিনি স্বীয় প্রসূতি আনন্দময়ীর নামে বিমলেশ্বর শিবমন্দিরের নিকটে "আনন্দময়ী" কালী স্থাপন করেন। *

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে পুণ্যশীলা লক্ষ্মী দেব্যা নাবালক সূর্য্যকান্তকে নিরাশ্রয় করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

---

* ৺ আনন্দময়ী কালী-মন্দিরে একখণ্ড প্রস্তরফলকে লিখিত আছে :—

অশীতি মিত্র মা শাকে,
কাশীকান্তস্য ভামিনী
নির্ম্ময়ে শ্রীমতী লক্ষ্মীঃ
শ্রীমৎ কালীনিকেতনম্।

সন ১২৬৫।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী।

মহারাজ সূর্য্যকান্ত

কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা,
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমী-ক্রমেণ।"

—কালিদাস।

মানবের সুখদুঃখ নিয়তির করে ক্রীড়াচক্রের বিপরীত আবর্ত্তন মাত্র। পর্ণকুটীরবাসী হইতে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই সেই অনতিক্রমনীয় আবর্ত্তনের অধীন। ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের বরপুত্র বালক সূর্য্যকান্তও আজ সেই নিয়তি-চক্রের ক্ষণ-নিষ্পেষণে নিরাশ্রয় হইয়াছেন। শৈশবে সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, জনক-জননীর কনিষ্ঠ পুত্র স্নেহের পূর্ণ (পরে সূর্য্যকান্ত) নিরতিশয় আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। অনন্তর তিনি সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ভাবী সৌভাগ্যের নীরব উপদেশে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী স্নেহময়ী লক্ষ্মী-দেবীর দত্তক পুত্ররূপে ক্ষুদ্র পল্লী বাজিৎপুরের দীন পর্ণকুটীর হইতে মুক্তাগাছার রাজ-প্রাসাদে আনীত হইয়া মাতার স্নেহে পরম সুখে দিন-যাপন করিতেছিলেন ; কিন্তু আজ তিনি নিয়তির স্বাভাবিক বিদ্রূপময় তীব্র ভ্রূভঙ্গীতে সেই আশ্রয়ে বঞ্চিত হইলেন।

তখন কুমার সূর্য্যকান্তের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র। সদাশয় সরকার বাহাদুর অপ্রাপ্তবয়স্ক সূর্য্যকান্তের সম্পত্তি স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাঁহাকে কলিকাতার 'ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনে' প্রেরণ করিলেন। প্রত্নতত্ত্বাভিজ্ঞ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছিল। তিনি কুমার সূর্য্যকান্তকে প্রতিভা-

সম্পন্ন দেখিয়া যত-দূর-সম্ভব তাঁহার প্রকৃতিদত্ত মনঃশক্তিসমুদয়ের বিকাশ-সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থি-গণের শারীরিক শিক্ষারও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অশ্বারোহণাদি শ্রমকর ক্রীড়া তাঁহাদিগের প্রতিদিনের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। ফল কথা, সেই সময়ে উল্লিখিত ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষা এমন পূর্ণাঙ্গ ছিল যে, তাহা তদানীন্তন শিক্ষার্থিগণের জীবন অনেক পরিমাণে ভবিষ্যতের উপযোগী করিয়া তুলিত। কুমার সূর্য্যকান্তের জীবনেও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের সৎশিক্ষার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকর হইয়াছিল, উত্তরকালেও কথা-প্রসঙ্গে মহারাজ সূর্য্যকান্ত তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কুমার সূর্য্যকান্ত উক্ত ওয়াড´ ইনষ্টিটিউশনে তিন বৎসরকাল মাত্র শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর দেওয়ান রুদ্রনাথের ঐকান্তিক যত্নে বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী কলম গ্রাম-নিবাসী ৺ভবেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজরাজেশ্বরী দেবীর সহিত তাঁহার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল। ইনি অসামান্যরূপলাবণ্যবতী, তীক্ষ্ণপ্রতিভাশালিনী ও একান্তআত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না ছিলেন।

শুভ বিবাহের অল্পকাল পরেই ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রাপ্তবয়স্ক জানিয়া রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিলেন, বস্তুতঃ তখনও তাঁহার নিয়মিত বয়ঃপ্রাপ্তির চতুর্দ্দশ মাস অবশিষ্ট ছিল। অতি বৃদ্ধ দেওয়ান রুদ্রনাথ বাগচী মহাশয় স্বয়ং এই সময়ে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্র বাগচি মহাশয়,—দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন।

"যৌবনং ধন সম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা;
একৈকমপ্য নার্থায়—কিমুতত্র চতুষ্টয়ম্।"

মোহের অসীম প্রভাব ; এই বিশ্বে অতি অল্প সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিই মোহ-মদিরার বিচিত্র প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। জীবনের মধ্যম অংশেই উহার প্রভাব গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজের ন্যায় একান্ত দুঃসহ হইয়া থাকে। সুশিক্ষা, সৎসঙ্গ এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনুকম্পা ব্যতীত তাহা অতিক্রম করা কাহারও শক্তির আয়ত্ত নহে। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী, অভিভাবকবিহীন যুবক সূর্য্যকান্ত কিয়ৎকালের জন্য কুসঙ্গের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাবী সৌজন্য, নগণ্য একটী সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার সেই ক্ষণিক ক্ষমতা অপসারিত করিয়াছিল।

একদা যুবক সূর্য্যকান্ত সঙ্গিগণে বেষ্টিত হইয়া মুক্তাগাছা প্রাসাদের বৈঠকখানায় কদর্য্য আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময়ে বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন, "গরীব যদি কম্বলে বসে, সে নিতম্ব চুলকায় আর হাসে।" এই ব্যঙ্গোক্তিতে আর কাহারও মনে কোনও রূপ অনুরাগ-বিরাগের সঞ্চার হইল কিনা আমরা জানি না, কিন্তু ভাবী সৌভাগ্যের বরপুত্র, পূর্ব্ববঙ্গের প্রখ্যাত জমিদার মহারাজ সূর্য্যকান্তের হৃদয়তন্ত্রীতে তাহা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। যে নর্ম্মসহচরগণের মনঃতুষ্টি সাধনের নিমিত্ত তিনি প্রতি রাত্রিতে প্রায় সহস্র মুদ্রা ব্যয় করাকে অর্থের সার্থকতা মনে করিতেন, আজ তাহাদিগের সহবাস নিতান্ত নীরস ও দুঃসহ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে, তিনি গম্ভীর ভাবে শয়নের নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, অপ্রকৃতিস্থ সহচরগণও সবিস্ময়ে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিরাজ্যে মানবের স্থান অতি উচ্চে। মানব অন্তঃ-

করণে দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সাধু বৃত্তির ন্যায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পাশববৃত্তিসমুদয়ও বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণিগণ যেমন কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বশীভূত, প্রকৃষ্ট বিবেক-শালী মানব তাদৃশ নহে। মানবগণ ইচ্ছা করিলে দাসত্বের পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তির উপরে প্রভুত্বও করিতে পারেন। ঐরূপ করিতে হইলে বিবেক-বিশোধিত চিত্তশক্তির প্রয়োজন। বিশ্বনিয়ন্তা পরমকারুণিক পরমেশ্বর যাঁহাকে সাধারণ মানবের, অনেক উর্দ্ধে স্থাপন করিবেন, সমগ্র পূর্ব্ব বঙ্গে যাঁহাকে দ্বিতীয় * ভূস্বামী করিলেন তাঁহার হৃদয়ে সেইশক্তিটুকু তিনি দিয়াছিলেন। যুবক সূর্য্যকান্ত এক রাত্রির মধ্যেই বিবেক বা সদসদ্‌বিচারবুদ্ধির সাহায্যে স্বীয় হৃদয়ে প্রভূত বল সঞ্চয় করিয়া লইলেন এবং পর দিবস প্রাতঃকালে নর্ম্মসহচর-দিগের নিকটে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে সঙ্গীত যন্ত্রগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব অধ্যায়ের আরম্ভ। তিনি দারুণ অধ্যবসায়সহকারে বাঙ্গলা ও ইংরেজি সংবাদ-পত্র পাঠ, সাহিত্যচর্চ্চা, বিভিন্ন উন্নত সুসভ্য সমাজের ইতিবৃত্তের আলোচনা, বিভিন্ন জাতীয় মনীষীদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিতে লাগিলেন। সুধী সূর্য্যকান্ত রাজকার্য্য-সমাপনান্তে এতাদৃশ পরিশ্রম-সহকারে মনুষ্যত্ব-অর্জ্জনে যত্নবান্ হইলেন যে, তিনি অল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে শৈশবের ঔদাস্যপূর্ণ উপেক্ষার ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি "শিকার কাহিনী" নামক এক-খানি সুললিত পুস্তক রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বহু সুললিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

* ঢাকার নবাব-এষ্টেট্ সম্মিলিত হইলে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদারী হয়। তৎপরেই মহারাজ সূর্য্যকান্তের এষ্টেট্।

কবিতা, তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার অমৃতময় ফলস্বরূপ মাতৃভাষার সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। মহারাজা 'নির্ম্মাল্য' নামক একখানি মাসিক পত্র অতি দক্ষতার সহিত কয়েক বৎসর সম্পাদন করিয়াছিলেন। সাময়িক সাহিত্যে নির্ম্মাল্যের আসন অতি উচ্চে ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি সাহিত্যের উৎসাহদাতাও ছিলেন। গরীব সাহিত্য-সেবিগণের জীবিকার্জ্জনের জন্য ভাবিতে না হয়, তজ্জন্য তিনি কোন কোন দীন সাহিত্যসেবককে তাঁহার নিজের ষ্টেটে এক একটী কাজ দিয়াছিলেন। কবিবর ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস, ঔপন্যাসিক ৺বরদা চরণ সেন এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্ ৺রামনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহারাজার ষ্টেটে দীর্ঘ দিন কার্য্য করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-চর্চ্চার ন্যায় ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষণেও তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল; তৎপ্রণীত শিকার-কাহিনীতে তাহার সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে। বঙ্গে ব্রিটীশ শাসন-প্রবর্ত্তনের সময়ে ইতিহাসে যে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ মধুপুরের নিবিড় অরণ্যমধ্যে, উক্ত সন্ন্যাসী-দলপতি রূপনির সন্ন্যাসীর বাসস্থান ছিল। মহারাজ সূর্য্যকান্ত শিকার-প্রসঙ্গে সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী দস্যুদলপতি রূপনির সন্ন্যাসীর প্রাসাদ-তুল্য দ্বিতল বাসভবনের ভগ্নাবশেষ-দর্শন-কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কিরূপে স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়।

মহারাজ সূর্য্যকান্তের জ্ঞানচর্চ্চা কেবল স্বীয় সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি স্বদেশবাসিগণের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত মুক্ত-হস্তে অর্থ বিতরণ করিয়াছেন। শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার উদার দানের কতিপয় দৃষ্টান্তমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমরা যে সময়ের কথা

বলিতেছি, সেই সময়ে কেবল ঢাকাতে একমাত্র কলেজই পূর্ব্ববঙ্গের সম্বল ছিল।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে মহারাজ সূর্য্যকান্ত উক্ত কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন, যাহার বাৎসরিক আয় হইতে ২০৲ টাকার দুইটী বৃত্তি প্রদান করা যাইতে পারে। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি ময়মনসিংহ-নগরের অধিবাসী জনসাধারণের হিতার্থ ৩০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে উক্ত নগরে টাউন হল নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ টাউন হলের এক অংশে সাধারণ পুস্তকালয়ও বিদ্যমান ছিল। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে তিনি ৩৯০০৲ টাকা ব্যয়ে মুক্তাগাছা 'রিডিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা নগরীতে 'কটন ননষ্টিটিউশন' ও 'মূকবধির' বিদ্যালয় তাঁহার উদার সাহায্যের ফলস্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি 'শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষাসমিতি'র প্রারম্ভ হইতে উহার হস্তে প্রতিবৎসর ১২০০৲ টাকা প্রদান করিতেন। তিনি ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ময়মনসিংহ নগরে সিটিকলেজ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ৬,৫০০৲ টাকা প্রদান করেন। সুদূর ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণের শিক্ষার্থ তথায় ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট নামক বিদ্যালয় স্থাপনের সাহায্যস্বরূপ এককালীন ৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিদানে তাঁহাকে বিদ্যালয়ের কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বঙ্গের সুবিখ্যাত চিত্রকর শশিভূষণ সেন মহাশয় তাঁহার অর্থেই সুদূর ইয়োরোপে গমন করিয়া চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ জে এন রায়ও তাঁহার অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতচর্চ্চার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে প্রতি বৎসর ৫,০০০৲ টাকা প্রদান করিতেন। তিনি

১৯০৮ খৃঃ অব্দে জাতীয় শিক্ষাসমিতির হস্তে এমন একটী সম্পত্তিদান করিয়া গিয়াছেন, যাহার বাৎসরিক আয় ১০,০০০৲ দশ সহস্র টাকা। শিক্ষা-বিষয়ে এই দানই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসনীয় দান।

স্বদেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে তাহার উদার দান অল্প প্রশংসনীয় নহে। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি মুক্তাগাছা মিউনিসিপালিটির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নী রাজরাজেশ্বরী দেবীর পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ ১,১২,৫০০৲ টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহ-নগরে 'রাজরাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস্' নামে জলের কল স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ অতিসার রোগের আক্রমণ হইতে নগর-বাসী নর-নারীকে রক্ষা করেন। স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরী দেবী তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ জলপান করিতে দিলে রোগের বৃদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় চিকিৎসকগণের উপদেশ-ক্রম তাঁহাকে অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জলপান করিতে দেওয়া হয় নাই। মহারাজ সূর্য্যকান্ত নগরবাসী নরনারীর জন্য সুপেয় জলের ব্যবস্থা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সেই শোকের লাঘব করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তিনি মুক্তাগাছা নগরে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তাহার পরিচালনের নিমিত্ত সদাশয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে ১৬,০০০৲ টাকা অর্পণ করেন। তিনি ৭,৯৫০৲টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহ নগরে "মেকেঞ্জি আই ওয়ার্ড" নামে এক চক্ষু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মনমনসিংহ নগরের জল নিকাশের সুব্যবস্থার নিমিত্ত তিনি ৫,০০০৲টাকা ব্যয় করিয়া-ছিলেন। এই জেলার অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে দাতব্য চিকিৎসা-লয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি এককালীন ২৫০০৲ টাকা দান করেন এবং পরিচালনের নিমিত্ত প্রতি বৎসর ১০০০৲ টাকা করিয়া প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে তিনি ঢাকা নগরীতে 'টমসন্

মেডিকেল হল' নির্ম্মাণের নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। তিনি, "ভিক্টোরিয়া' জেনেনা হস্পিটাল" স্থাপনের জন্য ৬০০০৲ এবং দার্জ্জিলিং স্বাস্থ্যনিবাস-নির্ম্মাণকল্পে ৩০০০৲ টাকা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার জন্মভূমি বাজিৎপুর গ্রামে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে স্বীয় জননীর পবিত্র নামে "ত্রিপুরাসুন্দরী" দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া তাহার পরিচালনার্থ ১৯০৭ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্টের হস্তে ২৫,০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ প্রদান করেন।

স্বদেশবাসীর শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এই সকল দান ব্যতীত এমন আরও অনেক দান আছে, যাহার জন্য মহারাজ সূর্য্য-কান্ত স্বদেশবাসী নরনারীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে তিনি মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী 'সুতিয়া' নদীতে লৌহসেতু নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। ঢাকা-ময়মনসিংহ-রেলপথ-নির্ম্মাণের নিমিত্ত তিনি প্রায় ৩০০/ বিঘা ভূমি দান করিয়াছিলেন। উহার মূল্য তখনও অন্যূন ২,০০,০০০ টাকা ছিল। কিন্তু মহারাজ তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাৎসরিক জুবিলি উৎসবের নিমিত্ত ময়মনসিংহ নগরে আরও ৮/ বিঘা ভূমি দান করেন। উহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬০০০৲ টাকা। ময়মনসিংহ জেলার যে সকল অংশে নিতান্ত জলকষ্ট, সেই সকল অংশে মহারাজ সূর্য্যকান্ত প্রায় পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে "করোনেশন কূপ" নামে কতকগুলি কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রনদে জন-সাধারণের অবগাহনের নিমিত্ত ২০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া এক ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ ভারতীয় এবং প্রাদেশিক সঞ্চিত ধনভাণ্ডারেও সর্ব্বসমেত ১৪,২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৯২ এবং ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে

তিনি স্বীয় আবাসভূমি মুক্তাগাছা ও ময়মনসিংহের দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত সহস্র সহস্র নরনারীকে তণ্ডুল দান করিয়া তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

১৯০১ খৃঃ অব্দে তিনি বঙ্গীয় জমিদার সভার উন্নতিকল্পে ২৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরীস্থিত চিড়িয়াখানার উন্নতিকল্পে তিনি ১২,০০০৲ এককালীন দান করেন। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে ভিক্‌টোরিয়া স্মৃতিভাণ্ডারে ৫৮,০০০৲ দান করিয়াছেন। তিনি ৪৫,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া স্বর্গগত ভারত-সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ও তদীয় মহিষী সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্তের স্বাভাবিক উদারতা ও মহত্ত্ব তাঁহাকে একদিকে যেমন স্বদেশবাসী নরনারীগণের ভক্তিভাজন করিয়া রাখিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি তাঁহাকে রাজসম্মানলাভেরও যোগ্যপাত্র করিয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী দিল্লীর রাজ্যাভিষেক দরবারে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিদানে গৌরবান্বিত করা হয় এবং ইহার সাত বৎসর পরে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার রাজত্বকালে জুবিলি দরবারে তাঁহাকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে কুইন ভিক্‌টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলী উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য গৌরব মহারাজ উপাধিদানে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা (Lieutenant Governor) সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকাঞ্জি 'মহারাজ' উপাধির সনন্দ প্রদানকালে মহারাজ সূর্য্যকান্তকে যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—মহারাজ সূর্য্যকান্ত আপনি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় আভিজাত্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এই নিমিত্ত সরকার

বাহাদুর আপনাকে যথাক্রমে 'রায় বাহাদুর' 'রাজা' "রাজাবাহাদুর" এবং পরিশেষে 'মহারাজ' উপাধি দানে আপনার লোকহিতকর মহত্ত্বের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আপনি স্বীয় বিশ্বজনীন গুণ-সমুদয় দ্বারাই তাহা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনি বঙ্গের ভূস্বামিগণের আদর্শস্থল হইয়া থাকুন। আমি অতি আনন্দের সহিত আপনাকে এই সনন্দ এবং খেলাৎ প্রদান করিতেছি।"

মহারাজ সূর্য্যকান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবারিক জীবনে কিঞ্চিন্মাত্রও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। একদিকে তিনি যেমন রাজসম্মান লাভ ও স্বদেশবাসী নরনারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অপর দিকে যদিও তিনি পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভের অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন পূর্ণাঙ্গ হইত। কিন্তু বিশ্বপতি পরমেশ্বরের তাহা ইচ্ছা নহে। তিনি এ বিশ্বে কিছুই সম্পূর্ণ সুন্দর করেন না। তাই মহারাজ সূর্য্যকান্তের জীবনেও একদিকে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছে। তিনি বাল্যের অবসান হইতে না হইতেই ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে রাজসাহী জেলার অন্তঃ-পাতী কলম গ্রাম-নিবাসী ভবেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মীরূপা রাজরাজেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া কতিপয় বৎসর মাত্র সুখে ও শান্তিতেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর নিয়তির অলঙ্ঘ্য শাসন-প্রভাবে রাণী রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ময়মনসিংহ ও কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের প্রাণপণ যত্ন সত্ত্বেও সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে গঙ্গাসাগরের পথে ভাগীরথীবক্ষে স্বামীর চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া আদর্শ হিন্দু মহিলা রাজরাজেশ্বরী দেবী স্বর্গে গমন করেন। রাণী রাজরাজেশ্বরীর অকাল মৃত্যু মহারাজ সূর্য্যকান্তের

হৃদয়ে তীব্র আঘাত করিল। আত্মীয় স্বগণের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহাতিশয় সত্ত্বেও তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন না; বরং তাঁহারই গুণ-গরিমা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিবার জন্য তাঁহার পবিত্র নামে "রাজ-রাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস্" প্রতিষ্ঠা করেন।

কৃত সীতা পরিত্যাগঃ স রত্নাকর মেখলাঃ
বুভুজে পৃথিবী পালঃ পৃথিবীমেব কেবলম্।
—কালিদাস

মহারাজ সূর্য্যকান্ত শৈশবাবধি অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। নানা-বিধ কার্য্যের মধ্যেও তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় মৃগয়া পরিত্যাগ করেন নাই। এত দিন রুগ্না রাজরাজেশ্বরী দেবীর চিন্তা, রাজকার্য্যে ও মৃগয়া ব্যাপারে সময়ে সময়ে অন্তরায়স্বরূপ ছিল। এখন সেই বন্ধনটুকু ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তিনি সম্পূর্ণরূপে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং কর্ম্মক্লান্ত জীবনে সাময়িক বিশ্রামলাভের নিমিত্ত মৃগয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্য-দর্শনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বসন্তের প্রারম্ভে পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে শিবির-সন্নিবেশ করিতেন এবং কখনও 'খেদা' করিয়া হস্তী ধরিতেন, কখনও হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি আরণ্য পশুর অনুসরণ করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার শতাধিক সুশিক্ষিত শিকারী হস্তী ছিল। ঐ সকল হস্তীর প্রতি তাঁহার এতাদৃশ যত্ন ছিল যে, তিনি স্বয়ং উহাদিগের লালন পালন পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মৃগয়া-ব্যাপারে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ শিকারিগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিকারী সার সেমুয়েল বেকার একবার মহারাজা সূর্য্যকান্তের সহিত মৃগয়ায় গমন করিয়া তাঁহার শৃঙ্খলা ও নিপুণতা দর্শনে নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ

করিয়াছিলেন। ইয়োরোপের যে সকল প্রসিদ্ধ লোক বিভিন্ন সময়ে মহারাজ সূর্য্যকান্তের সহিত শিকারে গমন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি সার জর্জ্জ হোয়াইট্, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ক্রোমার পেথারাম, রুসিয়ার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী গ্র্যাণ্ড ডিউক বরিস্। ভূতপূর্ব্ব চীফ্ জাষ্টিস্ সার ফ্রান্সিস্ ম্যাক্লিন্ এবং ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জ্জন বাহাদুরের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন বিখ্যাত শিকারী মিঃ আপকার মহারাজা সূর্য্যকান্তের শিকারে নিপুণতা দর্শন করিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মহারাজ সূর্য্যকান্তের এই পুরুষোচিত গুণের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ স্বীয় বন্দুকটী মহারাজকে উপহার প্রদান করেন।

মহারাজ সূর্য্যকান্ত বঙ্গের সাধারণ জমিদারগণের ন্যায় দুগ্ধফেননিভ ফরাসে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সুকোমল উপাধানে পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন করিয়া ফরাসীর নলে সুগন্ধ ধূমপানকেই মানবজীবনের উচ্চতম সুখ ও শান্তি বলিয়া কল্পনা করিতেন না; তিনি তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম দ্বারা সফলতা-লাভকে মনুষ্য-জীবনের বিপুল আনন্দ বলিয়া মনে করিতেন। এই নিমিত্তই তিনি মোহচ্ছেদনের পরে আর কখনও আলস্যবিজড়িত জীবন যাপন করেন নাই। তিনি তাঁহার জীবনের অমূল্য সময় ও শক্তি প্রধানতঃ রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে ব্যয়িত করিতেন। বিশ্রাম-সময়টুকু মৃগয়া, সাহিত্যচর্চ্চা, স্বদেশসেবা প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন। এইরূপ সাহিত্যচর্চ্চার ফলে তিনি সমসাময়িক সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তিনি "জমিদারী কার্য্যের নিয়মাবলী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

এই পুস্তকে তিনি পুরাতন শাসন-পদ্ধতির সংস্কার করিয়া এবং অংশ বিশেষে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ অভিনব সরল ও সৎ উপায়ে জমিদারী কার্য্য-পরিচালনার কৌশল অতি সরল ভাষায় বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তদানীন্তন বঙ্গীয় জমিদারগণ আগ্রহ-সহকারে উল্লিখিত পুস্তক পাঠ করিতেন এবং মহারাজা সূর্য্যকান্তের অভিজ্ঞতাপূর্ণ চিন্তাপ্রসূত উপাদেয় গ্রন্থকে একান্ত হিতকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ১৯০২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃগয়া-ব্যাপারের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ সরল ভাষায় বর্ণিত আখ্যায়িকাসমূহ "শিকার-কাহিনী" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বঙ্গভাষায় রচিত তাঁহার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ও সঙ্গীত অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহা একান্ত ভাবব্যঞ্জক এবং হৃদয়গ্রাহী। দুইটী প্রিয় হস্তীর সমাধির উপরে ক্ষোদিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত দুইটী কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইল :—

(১)

জন্মিলে মরিতে হয় ;　　নিয়তির এ নিয়ম
খণ্ডিবার নয়।
অনন্ত কালের সীমা,　　করিবারে অতিক্রম
কে জনম লয় ?
কিন্তু লোকে রসনায়,　　অন্তে যার গুণ গায়,
সেই ধন্য এ ধরায়,　　সফল তারই জনম,

(২)

জুলিয়ে কি শুভক্ষণে,　　জনম লভিয়াছিলে
তুমি এই ভবে।

প্রভুর আদরে এই পশুজন্ম কাটাইলে
মরিলে গৌরবে।
হ্যাদে তোর স্মৃতি-স্তম্ভ দাঁড়ায়ে করিছে দম্ভ
বল ত পশু-জীবনে এ সৌভাগ্য কার মিলে ?

(৩)

"প্রাণপণে রাজ-সেবা করিয়া সঁপিল প্রাণ
কৃতান্তের করে
রাজসিক সৎকারের চিহ্ন তব যে পাষাণ,
স্তম্ভের উপরে
রহিবে সে যতদিন মাটিতে না হবে লীন
* * * * গাবে গৌরব সে ততদিন।"

২। লিডিয়ার স্মৃতিস্তম্ভে : –

'দানবমর্দ্দনে কালী মহাকাল-প্রিয়া,
উল্লাস উন্মদা যথা ধায় রণস্থলে ;
ধাইত সে মৃগয়ায় মহা কুতুহলে
আর এ সংসারে আহা নাই সে লিডিয়া।"
কত শত শার্দ্দুল সে চরণে দলিয়া
বধিল পরাণে, যার করাল কবলে
হইত বিচূর্ণ বট-বিটপসকলে
কাল-কবলিতা সেই নির্ভীকা লিডিয়া।
চির তরে জীবনের খেলা ভঙ্গ দিয়া
অনন্ত নিদ্রায়, এই ভূমিখণ্ডতলে

অভিভূতা, অন্তিমের শয়নে লিডিয়া
আর কি জাগিবে সে ভবের কোলাহলে ?
প্রভুভক্তি-পূর্ণ সদা ছিল যায় হিয়া
লভিছে চিরবিশ্রাম হেথা সে লিডিয়া।"

মহারাজ সূর্য্যকান্ত বঙ্গের আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি পঁচিশ বৎসর কাল মাত্র তাঁহার জমিদারী কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ প্রজাকে চিনিতেন। তিনি ১৯০২ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারী 'ল্যাণ্ড হোলডারস্ এসোসিয়েশনে' যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, যে জমিদার তাঁহার প্রজাদিগকে জানেন না অথবা যাঁহার প্রজারা তাঁহাকে জানে না, এমন জমিদারকে আমি অবজ্ঞা করিয়া থাকি। * তিনি স্বয়ং প্রজাগণের অভাব ও অভিযোগ-শ্রবণে কখনও আলস্য অথবা ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না। কিংবা তদনুসারে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া তাহার ন্যায় বিচার করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে এমন এক তীব্রতা ছিল যে, প্রজারা প্রস্তুত হইয়া আসিলেও তাঁহার সমক্ষে কেহ মিথ্যা বলিতে সাহসী হইত না। ইহাতে প্রজাগণ তাঁহাকে অভিভাবকের ন্যায় আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে সমর্থ হইত। তিনি কখনও তাঁহার জমিদারীর মধ্যে পুষ্করিণী খনন, রাজপথ নির্ম্মাণ কিংবা বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন নাই অথবা প্রজাগণের বিপদের সময়ে অর্থসাহায্যে কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই। এইরূপে সুকৌশলে ন্যায়পরায়ণতার

(*) I despise the zaminder who does not know his tenants and whose tenantry does not know him."

সহিত জমিদারী পরিচালনের ফলে পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে তাঁহার জমিদারী দ্বিগুণেরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মহারাজ সূর্য্যকান্ত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে অত্যন্ত উদার মত পোষণ করিতেন। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ধার্ম্মিক লোকের আদর করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডাম্বলের নিকটে তিনি কর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কর্ম্মবীর ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া পরমেশ্বরের যে উপাসনা হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা; কেবল লোক-পরম্পরা-প্রচলিত আচার-পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণমাত্র উপাসনা নহে। এই নিমিত্তই তিনি কর্ম্মোপাসক ইংরেজ জাতির তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন। কর্ম্মতৎপর মহারাজা সূর্য্যকান্ত দুঃস্থ লোকের সহানুভূতি করাকেও ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই স্বভাব-সুলভ দয়াবৃত্তির প্রভাবে তিনি বহু দুরবস্থাপন্ন লোকের সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

ঢাকার পরলোকগত নবাব সার সলিম উল্লা বাহাদুর G. C. I. E. K. C. S. I. বাল্যাবধি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং এই নিমিত্তই তিনি তাহার পিতা নবাব আসান উল্লা বাহাদুরের একান্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন। ঢাকার তদানীন্তন কমিশনার বাহাদুর অল্পবয়স্ক হইলেও নবাব সলিম উল্লা বাহাদুরকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া ময়মনসিংহে স্থাপন করিলেন। কিন্তু অমিতব্যয়ী নবাব সাহেব তাঁহার বেতন এবং পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক ২০০৲ টাকা দ্বারা স্বীয় ব্যয় সঙ্কুলন করিতে পারিতেন না। দুই বৎসরের পরে তিনি যখন স্থানান্তরে বদলী হইলেন তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নানারকমে তাঁহার প্রায় পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ঋণ হইয়াছে। অনেক চিন্তা করিয়াও তিনি

ঋণ শোধ করিবার কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। পিতা অথবা ঢাকার অন্য কোনও বন্ধুর নিকট হইতে কোনও প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা তাঁহার বিন্দুমাত্রও ছিল না। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তিনি মহারাজ সূর্য্যকান্তের শরণাপন্ন হইলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আর একবার উক্ত নবাব সাহেব কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ পান্থনিবাসে বহু টাকা বাকী করিয়া মহারাজেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহারাজও অবিলম্বে সে ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞহৃদয় নবাব বাহাদুর পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব উপকারের বিষয় বিস্মৃত হয়েন নাই। স্বর্গীয় মহারাজ সূর্য্যকান্তের পুত্র মহারাজ শশিকান্ত আচার্য্য যখন ১৯১৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের জমিদারগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে অভিলাষ করেন, তখন নবাব বাহাদুর স্বজাতীয় জমিদারগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও মহারাজ শশিকান্ত আচার্য্যের নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপে দুরবস্থাপন্ন জ্ঞাতিগণের প্রতিও তাঁহার সদয় ব্যবহারের কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হইত না। তাঁহার অন্যতম জ্ঞাতি সারদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় এক সময়ে মহারাজের নিকট প্রায় ৩০,০০০৲ টাকা ঋণী হইয়াছিলেন। মহারাজ ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া অম্লানহৃদয়ে সমস্ত টাকা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যতম জ্ঞাতি সুশিক্ষিত স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ও তাঁহার নিকটে এক সময়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা ঋণী হইয়াছিলেন। তিনি মাত্র বিংশসহস্র মুদ্রা মূল্যের একটি সম্পত্তি লইয়া তাঁহাকে সমস্ত ঋণ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য সুশিক্ষিত

কেশবচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের মন্ত্রণানুসারে তিনি জীবনে বহু সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

মহারাজ সূর্য্যকান্তের হৃদয় একদিকে যেমন কুসুম অপেক্ষাও কোমল ছিল, অপর দিকে তেমনই বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ছিল। উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমুদয়ে তাঁহার অন্তঃকরণের কোমলতা যেমন প্রশংসনীয়, পক্ষান্তরে নিম্নলিখিত দুই তিনটী অসমসাহসিক ঘটনা হইতে তাঁহার অন্তরের বজ্রসদৃশ দৃঢ়তাও তেমনই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ময়মনসিংহের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ এ ডি ফিলিপ, আই সি এস্, মহারাজ সূর্য্যকান্তের বিরুদ্ধে মিউনিসিপালিটীর একটী জলপ্রণালী অবরোধ অপরাধে এক মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন। তিনি সমন দ্বারা মহারাজকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া সাধারণ অপরাধীর ন্যায় তাঁহাকে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াও উপবেশন করিতে বলেন নাই এবং পর দিবস লেপ্টেনাণ্ট্ গভর্ণরের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া কাঠগড়ায় একখানি চেয়ার প্রদান করিয়া মহারাজকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তেজস্বী মহারাজ সূর্য্যকান্ত, সেই কপট সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন; "আমার চরণদ্বয় দুর্ব্বল নহে, আমি অক্লেশে অন্যান্য লোকের ন্যায় এস্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইব।" এই ঘটনায় বঙ্গের শিক্ষিত লোকমাত্রেই একান্ত বিচলিত হইয়াছিল; সুদূর ইংলণ্ডের হাউস্ অব কমন্সেও মিঃ ফিলিপের এতাদৃশ অন্যায় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ হয়। তাহার ফলে মিঃ ফিলিপ মহারাজের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৯০৯ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গদেশীয় ভূস্বামীদিগের একজন প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান বিধিবদ্ধ হইলে সদস্য

নির্ব্বাচন লইয়া জমিদারগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। স্বাধীন-চেতা মহারাজ সূর্য্যকান্ত স্বীয় মত বলবৎ রাখিবার জন্য অবিলম্বে "ল্যাণ্ড হোলডারস্ এ্যাসোসিয়েশন' নামে এক অভিনব জমিদার-সভার সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মতানুরূপ সদসৎ নির্ব্বাচন করিলেন। তিনি ঐ সভার সভাপতি ছিলেন এবং উহার উন্নতিকল্পে ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। উচ্চপদস্থ বহু রাজপুরুষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপরোধ সত্বেও স্বাধীন-চেতাঃ মহারাজ নির্ভয়ে স্বীয় মতের সমর্থন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার এই প্রকার চিত্তের অবিচলিত দৃঢ়তা এবং বিচিত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠাদর্শনে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণও মুগ্ধ হইতেন।

১৯০২ খৃঃ অব্দে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন সস্ত্রীক বঙ্গের অতি প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিতে গমন করেন। ঐ স্থান বর্ত্তমান সময়ে মহারাজের অধিকারভুক্ত। সুতরাং তিনি রাজ-প্রতিনিধির উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া, যোগ্য পুত্র মহারাজকুমার শশিকান্ত আচার্য্যকে তথায় প্রেরণ করেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন সেই অভ্যর্থনায় যে কি প্রকার সন্তুষ্ট হইযাছিলেন, তাঁহার স্বহস্তলিখিত এই পত্রই তাহার নিদর্শন—

Viceroy's Camp
Maldah
February 27th 1902

My dear Maharaja,

I must in leaving write you a brief line of thanks for your Hospitable entertainment to me during the last two

days, and of regret that your illness has prevented you from taking any part in it. I should have greatly enjoyed your company both here and at Gour.

As it is I can only express my gratitude for the excellent arrangement made on my behalf and hope that you may shortly be fully restored to strength.

I am your sincere friend,

(*sd.*) Curzon.

মহারাণী রাজরাজেশ্বরী অনপত্য অবস্থায় পরলোকে গমন করিলে মহারাজের আর ভাবী উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। এই নিমিত্ত তিনি ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে স্বীয় জ্ঞাতি রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরীকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত তাঁহাকে নানাপ্রকারে সুশিক্ষিত করিয়া ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ২০শে জুন কলিকাতা নগরীতে স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী লীলা দেবীর সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ সম্পাদন করেন। এই বিবাহের পরে মহারাজ তাঁহার প্রিয় পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত হইলে নগরবাসিগণ সেই দিবসেই এক বিরাট সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। উক্ত অভিনন্দন-সভায় ময়মনসিংহের শিক্ষিত জনসাধারণ ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ সেই অভিনন্দনের উত্তরে সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর ময়মনসিংহ নগরে যত দূর সম্ভব সুশোভনরূপে তিনি পুত্রের বিবাহোৎসব সম্পাদন করেন। এই উৎসবের প্রায় ১ বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় গমন করিয়া সুশিক্ষা লাভের নিমিত্ত প্রিয় পুত্রকে

ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডে গমনকালে মহারাজের মালদহের ম্যানেজার মিঃ জে আর হলো মহারাজ. কুমারের সহযাত্রীরূপে তাঁহাকে ইংলণ্ডে রাখিয়া আসেন এবং মহারাজ স্বয়ংও বোম্বাই পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন।

১৯০৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দেই ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়, বি এল মহাশয়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর কাল মধ্যে তাঁহাকে জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞতা দানেরও সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সময়ে সকল সম্পত্তির ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, ১৯০৮ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে পুত্রবধূ ও পৌত্রের সহিত জলবায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য বৈদ্যনাথস্থ বাসভবনে গমন করেন। ঐ ভীষণ বৎসরের ২০শে অক্টোবর রাত্রিতে বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান, জন্মভূমির উজ্জল রত্ন মহারাজ সূর্য্যকান্তের ৫৭ বৎসর বয়সে জীবলীলা নিঃশেষ হয়! তাঁহার মৃত্যুতে কেবল ময়মনসিংহ নহে, সমগ্র বঙ্গ শোকার্ত্ত হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃঃ অব্দের ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে স্বর্গগত মহারাজ সূর্য্যকান্তের স্মৃতিরক্ষার্থ এক বিরাট সভা হয়। দ্বারবঙ্গের মহারাজ রামেশ্বর সিংহ উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। উল্লিখিত স্মৃতিসভায় যে Resolution সর্ব্ববাদি-সম্মতভাবে গৃহীত হয় তাহাই তাঁহার মহত্বের অমর সাক্ষ্যরূপে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে।

"That this Meeting desires to place on record the sense of the great and irreparable loss which the zamindars of Bengal and the Indian community at large have sustained by the death of Maharaja Suryakanta Acharyya

of Mymensingh. His public spirit, his independence of character, his open-handed munificence and his deep sympathy with all public movements will enshrine his memory in the grateful recollections of his countrymen. To his brother zamindars he has set an example of deep and abiding interest in the welfare of his tenants which will always remain with them a priceless possession."

মহারাজ শশিকান্ত আচার্য্য

কুমার শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্তের অন্যতম জ্ঞাতি স্বনামপ্রসিদ্ধ, উদারচরিত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জননীর নাম স্বর্গীয়া রাজবালা দেবী। ১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৮৮৫ অব্দে) মুক্তাগাছা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য স্বর্গীয় মোহিনীমোহন রায় এম-এ; বি-এল মহাশয় তাঁহার মাতামহ ছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ সূর্য্যকান্ত কুমার শশিকান্ত আচার্য্যকে যথাশাস্ত্র দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন।

স্বাভাবিক মনোবৃত্তিসমূহের বিকাশসাধনই শিক্ষা। মহারাজ সূর্য্যকান্ত মহারাজ-কুমারের সুশিক্ষা-বিধানের নিমিত্ত একদিকে যেমন সুশিক্ষিত ইয়ূরোপীয় এবং দেশীয় উভয়বিধ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই স্বয়ং সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া নিজের উচ্চ আদর্শ দ্বারা এবং অভিজ্ঞতা-প্রসূত উপদেশ দ্বারা তাঁহার শিক্ষার পূর্ণতা প্রদানে যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারই আন্তরিক যত্নের ফলে মহারাজ-কুমারের বাল্যশিক্ষা যতদূর সম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দূরদর্শী মহারাজ সূর্য্যকান্ত স্বীয় পুত্রের কেবল মানসিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি তাঁহার শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষাবিধানেও উদাসীন ছিলেন না। তিনি বাল্যাবধি মহারাজ-কুমারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া মৃগয়ায় গমন করিতেন। ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি যে সকল শ্রমকর ক্রীড়ায় শরীর বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়, কুমারকে প্রতিদিন সেই সকল পুরুষোচিত ক্রীড়ায় নিয়োগ করিতেন।

তাহার ফলে মহারাজ কুমার যেমন শীতাতপসহিষ্ণু, তেমনি ঐ সকল ক্রীড়ায় অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। ইনি এক্ষণে কলিকাতা Town Club নামক প্রসিদ্ধ Sporting Associationএর সভাপতিরূপে কাজ করিতেছেন।

অতঃপর মহারাজকুমার দার্জ্জিলিং St. Paul's Schoolএ কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করিয়া সেণ্টজেভিয়ার স্কুল হইতে ১৯০৪ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এ সময়েও তাঁহার নৈতিক ও শারীরিক শিক্ষায় ঔদাসীন্য ছিল না। ফল কথা, তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেরূপ চিররুগ্ন হইয়া শিক্ষালয় হইতে বহির্গত হইতেন, মহারাজ-কুমারের শিক্ষা তেমন একদেশাত্মক ছিল না।

মহারাজ সূর্য্যকান্ত এই সময়ে স্বীয় পুত্রকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া একটি যোগ্য পুত্রবধূলাভের নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ মনুষ্যজীবনের এমন এক অংশ আছে যখন অতুল ঐশ্বর্য্য কিম্বা নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু হৃদয়ের অভাব পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন স্নেহের আধার সরলতার প্রতিমূর্ত্তি পুত্রকন্যা কিম্বা তৎস্থানীয় কেহ সর্ব্বদা নিকটে না থাকিলে সংসার যেন কেমন শূন্যময় বলিয়া বোধ হয়। মহারাজ সূর্য্যকান্তেরও তখন সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। কুমার শশিকান্ত ব্যতীত এই বিশাল বিশ্বে তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ ঢালিবার আর স্থান ছিল না। কুমারও শিক্ষানুরোধে সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান, দেশনায়ক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুশিক্ষিতা তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী লীলাদেবীর সহিত মহারাজ-কুমারের শুভ বিবাহ ১৯০৪ খৃঃ অব্দের ২০শে জুন তারিখে

কলিকাতা নগরীতে মহাসমারোহে সম্পাদন করেন। স্নেহের বধূকে সকল বিষয়ে কুমারের অনুরূপ দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি অন্তরের চিররুদ্ধ স্নেহের আবেগ সুশিক্ষিতা পুত্রবধূর প্রতি ন্যস্ত করিয়া অভিনব শান্তির স্বাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন।

১৯০৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে মহারাজকুমার পিতৃদেবের ইচ্ছানুসারে বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তিনি সেইস্থানে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া বি-এ ও এল-এল-বি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। অনলস-প্রকৃতি মহারাজকুমার ঐ সময় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্যও লণ্ডনের Inns of Courts-এ উপস্থিত হইতেছিলেন। কিন্তু বিধির অলঙ্ঘ্য শাসন অতিক্রম করে কাহারও এমন শক্তি নাই! এই সময়ে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে একমাত্র আশ্রয়, দেবতুল্য পিতা মহারাজ সূর্য্যকান্তের মৃত্যুতে তাঁহার সেই বাসনা চিরদিনের জন্য অপূর্ণ থাকিয়া গেল! তিনি পিতৃ-বিয়োগ-বার্ত্তায় শোকে অভিভূত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন এবং দেশে প্রত্যাগমন করিয়া যথারীতি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন।

চন্দ্র সূর্য্যের দৈনিক উদয় অস্ত দ্বারা বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্ব-ব্যাপার নিয়মিত করিয়া থাকেন। বিধাতৃ-বিধানেই আজ যে কন্যা, কাল সে মাতা এবং আজ যে পুত্র কাল সে পিতা হইয়া থাকে। স্বভাবের সেই নিয়মানুসারেই মহারাজকুমার পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সমুজ্জ্বল সূর্য্যের অস্তগমনে জন-সাধারণের হৃদয়ে যে বিষাদের আবির্ভাব হইয়াছিল, চন্দ্রের উদয়ে তাহা আনন্দে পরিণত হইল। গুণগ্রাহী সরকার বাহাদুর তাঁহার

যোগ্যতা-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে গৌরব-সূচক "রাজা বাহাদুর" উপাধি দান করেন। ঐ বৎসরেই তিনি ঢাকা বিভাগের ভূম্যধিকারিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে উক্ত কার্য্য পরিচালনা করেন।

১৯১৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে স্বর্গীয় মহারাজের নিযুক্ত চীফ ম্যানেজার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে তিনি স্বয়ং এষ্টেটের কার্য্য-কলাপ প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। এতদিন জনসাধারণ তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে দেখিয়াছে, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সুযোগ পায় নাই। এক্ষণে তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অদম্য উৎসাহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, নিপুণতার সহিত কর্ম্ম করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র নিঃস্বার্থ ন্যায়পরতা, একান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সত্যের প্রতি অটল শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মিতাচার এবং সুসংযত স্বভাব সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। অল্পকালের মধ্যেই তিনি, এই বিপুল সম্পত্তি রক্ষা করিয়া নূতন ভূসম্পত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইনিও কর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই বিপুল এষ্টেটের কার্য্যসমুদয় স্বহস্তে পরিচালনা করিয়াও ময়মনসিংহ-নগরবাসিগণের ইচ্ছাক্রমে ইনি উক্ত নগরের মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। গুণজ্ঞ সরকার বাহাদুর তাঁহার যোগ্যতা-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ১৯২০ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারীতে তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য পুরস্কারে পরম প্রীত হইয়া মুক্তাগাছার এবং ময়মনসিংহ নগরের জনসাধারণ তাঁহা-

দিগের আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। ময়মনসিংহ নগরের অধিবাসিবর্গ যে অভিনন্দন দ্বারা মহারাজকে অভিনন্দিত করিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

* * * শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি আপনাকে "মহারাজ" উপাধিতে বিভূষিত করায় স্বদেশবাসীমাত্রই আনন্দিত ও উল্লাসিত হইয়াছে। এই শুভ ঘটনায় আমরা ময়মনসিংহ নগরের অধিবাসিবর্গ বিশেষভাবে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছি। আমাদের হৃদয়ে সেই গৌরব ও আনন্দের অনুভূতি প্রকাশ্যরূপে অভিব্যক্ত করিবার জন্যই অদ্য আমরা এই ক্ষুদ্র অভিনন্দনপত্র সহ মহাশয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। * * * * আপনার গৌরব, আপনার যশ ও আপনার কীর্ত্তির সহিত ময়মনসিংহ-নগরের অধিবাসিবর্গের চির ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। আপনার এই নূতন সম্মান ও নূতন গৌরবে আমরাও সম্মানিত ও গৌরবান্বিত। * * * আপনার স্বর্গগত পিতৃদেব প্রজার হিতার্থে ও দেশের কল্যাণের নিমিত্ত বিপুল অর্থব্যয় ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে যে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনি সেই সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া পিতৃনির্দ্দেশিত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা ময়মনসিংহের অধিবাসিগণের পক্ষে নিতান্ত উল্লাস ও গৌরবের বিষয়। * * * * আপনি ময়মনসিংহনগরের অধিস্বামী। এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের সহিত আপনার ও আপনার পিতৃপুরুষগণের নাম অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। তন্নিমিত্ত এই নগরের অধিবাসিবর্গ আপনার ও আপনার কীর্ত্তিশালী পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। * * * * আপনি স্বীয় নির্ম্মল চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা এবং সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে

সহানুভূতি প্রদর্শন ও সাহায্য করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন আমরা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন এবং উত্তরোত্তর দেশের ও জন-সমাজের কল্যাণ-সাধন করিয়া ময়মনসিংহের মুখ উজ্জ্বল করুন। ভগবানের অনুগ্রহ ও জন-সাধারণের শুভ ইচ্ছা আপনার সহায় হউক!"

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ঢাকা সহরে যে দরবার হয়, সেই দরবারে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা লর্ড রোণাল্ডশে স্বহস্তে মহারাজা শশিকান্তকে 'মহারাজ' সনন্দ প্রদান করেন। এই উপলক্ষে লর্ড রোণাল্ডশে মহারাজা শশিকান্তকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

"You are the head of the distinguished zemindar family of Muktagacha in Mymensingh and as such the most influential Hindu nobleman of Eastern Bengal. Your father the late Maharaja Surya Kanta Acharya Chaudhury was distinguished for the liberal assistance he gave to works of public utility and in his footsteps you are following. You liberally supported the various funds raised for services connected with the War and the hospital at the headquarters of the district in which you reside as well as the new King Edward Memorial Buildings. The Mitford Hospital, Dacca owe much to your generous contributions. The influence which your position in East Bengal carries with it has always been exerted on the side of law and order and your high personal character has been an example to others and the estimation in which you

are held was shown by your election in 1912 to the Bengal Legislative Council as a representative of the landholders of the Dacca Division. On 1913 my predecessor at a similar Darbar handed over to you the Sanad of the title of Raja Bahadur. It now gives me great pleasure to hand over to you the Sanad of the high title of Maharaja. May *you live long to enjoy the title and to carry on the high* traditions of your family."—অর্থাৎ আপনি ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট জমিদারবংশের প্রধান বা মুখ্য ব্যক্তি। এই হেতু পূর্ববঙ্গের হিন্দু-অভিজাত-সমাজে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আপনার পিতৃদেব স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী জনহিতকর অনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেন এবং আপনি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। বিগত মহাযুদ্ধে সহায়তা-সূচক বিবিধ অর্থভাণ্ডারে এবং ময়মনসিংহ জেলা-সদরের হাঁসপাতাল ও কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল বিল্ডিংস বা সম্রাট্ এডওয়ার্ডের স্মৃতিভবন-প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডারে আপনি উদারহস্তে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। ঢাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারেও আপনি প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে আপনার যে প্রভাব, তাহা আপনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্যই বিস্তার করিয়া থাকেন। আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র অপরের আদর্শস্বরূপ, পূর্ব্ববঙ্গে আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তি কত অধিক তাহা আপনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগের ভূস্বামিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কারমাইকেল আপনাকে 'রাজা বাহাদুরে'র সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি আপনাকে

উচ্চতর সম্মানসূচক 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করিতেছি, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই উপাধি ভোগ করিতে থাকুন এবং বংশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন।

বাল্যকাল হইতেই মহারাজ শশিকান্ত, নিপুণ শিকারী মহারাজ সূর্য্যকান্তের সহিত শিকারে গমন করিতেন। তাদৃশ সুবিজ্ঞ শিকারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যের ফলে ইনি মৃগয়াতে সাতিশয় নিপুণতা লাভ করিতে পারিয়াছেন এবং এখনও প্রায় প্রতি বৎসর বসন্তাগমে স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায় মৃগয়াতে গমন করেন। ময়মনসিংহের পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং আসামের উপত্যকা-ভূমিতেই ইনি সাধারণতঃ মৃগয়া করিয়া থাকেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বসন্তকালে Irelandএর ভূতপূর্ব্ব Lord Lieutenant Lord and Lady Wimborne এবং স্পেনের Duke of Penerandaর সহিত একযোগে শিকারে গমন করিয়া স্বীয় নিপুণতার দ্বারা তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে বসন্তের সময় ইজিপ্টের সুলতানের পুত্র Yusuf Kamel Pashaর সহিত মৃগয়া করিয়াছিলেন। সুলতান-পুত্র মহারাজের শিকারে দক্ষতা ও অপূর্ব্ব আতিথ্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায় মহারাজ শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুরেরও অকপট রাজভক্তি এবং রাজ-প্রতিনিধিগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আজন্মসিদ্ধ। বাল্যে পিতৃদেবের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতের রাজ-প্রতিনিধি মাননীয় লর্ড কর্জ্জনকে গৌড়ে অভিনন্দন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর বঙ্গেশ্বর প্রজাবৎসল লর্ড কারমাইকেলের অতিথি-সংকারেও ইনি প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন। ইনি উল্লিখিত রাজপ্রতিনিধির শুভাগমনের স্মৃতিরক্ষার্থ তদীয় গৌরবময় নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া "কারমাইকেল ক্লাব" ময়মনসিংহবাসী জনসাধারণকে

দান করিয়াছেন। অতঃপর বঙ্গের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা লর্ড রোণাল্ডশে যখন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ নগরে শুভাগমন করেন, তখন মহারাজ শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা ও আতিথ্য প্রদান করেন। মনস্বী রাজ-প্রতিনিধি তদীয় সৎকারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ স্বীয় চিত্রময় প্রতিকৃতি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

স্বর্গগত পিতৃদেবের ন্যায় মহারাজ শশিকান্তেরও জ্ঞানলিপ্সা একান্ত প্রবল। ইনি নিজের এবং পরিবারবর্গের পাঠের সুবিধার জন্য ময়মনসিংহস্থ প্রাসাদে এক সুবৃহৎ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই পুস্তকালয়ই উক্ত নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকালয়। ইনি জ্ঞানপিপাসার অদম্য উৎসাহে, বহু যত্নে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে "গজায়ুর্ব্বেদসংহিতা"র হস্তলিখিত প্রথম ভাগ মহীশূর রাজপুস্তকালয় হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহার এবং পুণা নগরী হইতে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের বঙ্গানুবাদ করাইয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি ও হস্তিচিকিৎসা বিষয়ে এক মহা অভাব দূর করিয়াছেন।

দানশীলতায় মহারাজ শশিকান্ত তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবকেও অতিক্রম করিয়াছেন। জনসাধারণের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানেই হউক, কলেজ-স্কুল-স্থাপনেই হউক, চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠায়ই হউক কিংবা দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পেই হউক মহারাজ শশিকান্ত মুক্তহস্ত। ইনি স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজে এককালীন ৪৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং কলেজ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ময়মনসিংহের 'সূর্য্যকান্ত চিকিৎসালয়ে' ইনি এককালীন ১,০২,০০০৲ টাকা এবং প্রতি বৎসর ১০০০৲ দান করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ এডওয়ার্ডের

স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত ইনি ঢাকা মিট্‌ফোর্ড চিকিৎসালয়ে ১,০০,০০০৲ এক লক্ষ টাকা দান করিয়া ঢাকাবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইনি স্থানীয় বিদ্যাময়ী বালিকা শিক্ষালয়ের জন্য, এডওয়ার্ড স্কুলের জন্য, মাদ্রাসার জন্য এবং জয়দুর্গা বিদ্যালয়ের জন্য বিনামূল্যে ভূমিদান করিয়া ময়মনসিংহবাসীর বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এডওয়ার্ড স্কুলের সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াও শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-দিগকে উৎসাহদান করিতেছেন।

কেবল ময়মনসিংহ-নগরবাসিগণই যে তাঁহার করুণা লাভ করি-তেছেন এমন নহে, সমগ্র বঙ্গদেশের উন্নতিকল্পে ইনি নিয়তই সচেষ্ট আছেন।

যাহাতে বঙ্গীয় যুবকগণ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে যাইয়া শিল্প-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া আসিতে পারে, তজ্জন্য ইনি বহুকাল যাবৎ কলিকাতার শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির হস্তে প্রতি বৎসর ১২০০৲ টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন যুদ্ধের সময়ে মহারাজ অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে সেণ্ট জন য়্যাম্বুলেন্স কোরে ৬০,০০০৲ টাকা দান করিয়া সেবাব্রতের মহত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতীয় হতাহত সৈনিকগণের (Indian War Relief Fund) সাহায্যার্থ স্থাপিত ধন-ভাণ্ডারের বঙ্গীয় শাখায় মহারাজ ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়া নিঃসম্বল পরিবারের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। বঙ্গের স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যবহারের নিমিত্ত 'বাঙ্গালী' নামক Hospital Ship ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মহারাজের দান ৬০০০৲ টাকা। যুদ্ধের সময়ে বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ইনি প্রতি-মাসে ৫০০৲ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন এবং বিগত ১৯১৯ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গের ঝটিকা-পীড়িত নরনারীর সাহায্যকল্পে ১০,০০০৲ টাকা
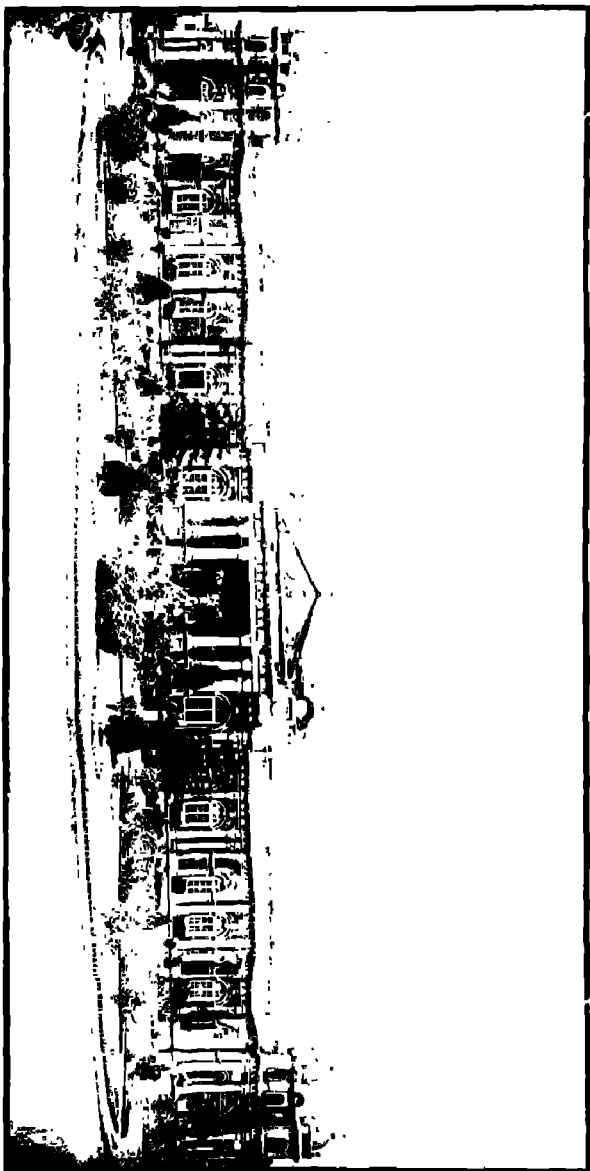
প্রদান করিয়া রাজা প্রজার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কেবল অর্থদান কেন, মহারাজ শশিকান্ত, যুদ্ধের সময়েও শক্তিদান করিয়াও যতদূর সম্ভব ভারতেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইনি ময়মনসিংহ বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ সমিতির সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। মহারাজ শশিকান্তের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, উদার প্রকৃতি, স্নেহপ্রবণ ও গুণগ্রাহী হৃদয় সকলেরই প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

---
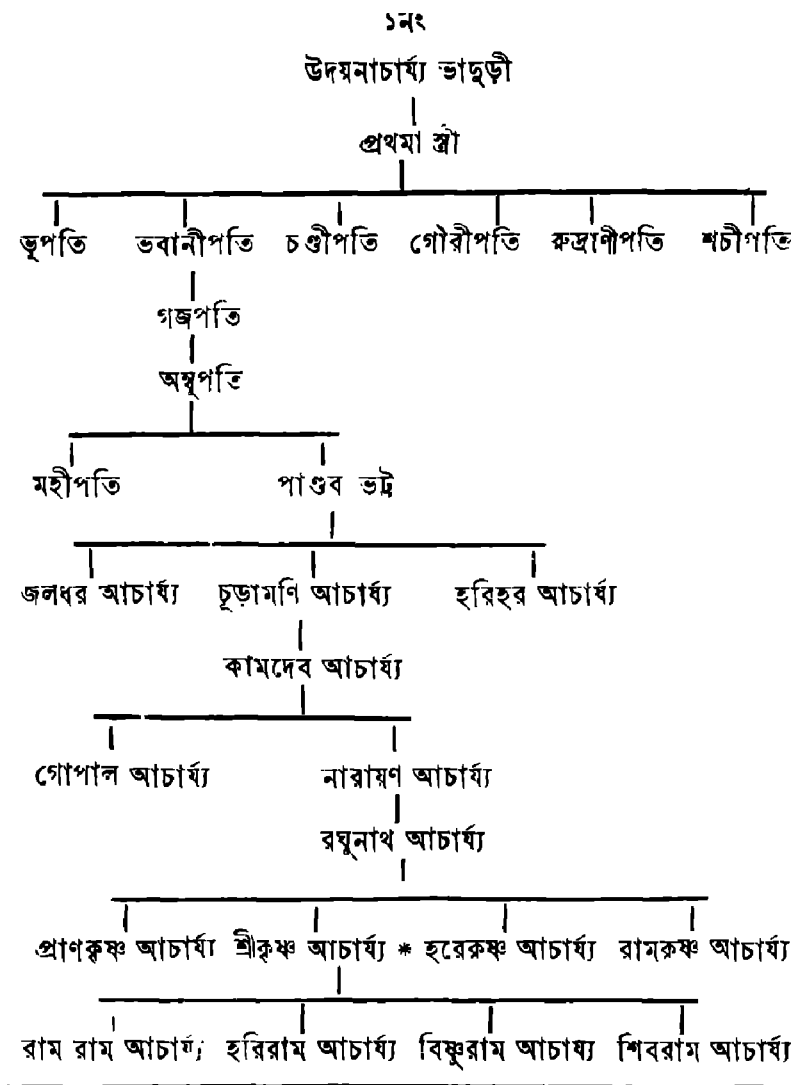
* এই শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যই মুক্তাগাছা আচার্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বীয় প্রতিভা-বলে বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন।

- রামরাম আচার্য্য
  - রুদ্ররাম
    - হরি নারায়ণ
      - গঙ্গা নারায়ণ
        - নরেন্দ্রনারায়ণ
        - হরেন্দ্রনারায়ণ
        - যোগেন্দ্রনারায়ণ
          - হেমেন্দ্রনারায়ণ
          - নগেন্দ্রনারায়ণ বি-এ
            - অমরেন্দ্রনারায়ণ
            - মনুজেন্দ্র
            - সমরেন্দ্র
      - বিষ্ণুনারায়ণ
      - রামনারায়ণ
        - কমলনারায়ণ
          - মহেন্দ্র নারায়ণ
            - যতীন্দ্র নারায়ণ
  - বিজয়রাম
  - কৃষ্ণচন্দ্র

৩নং
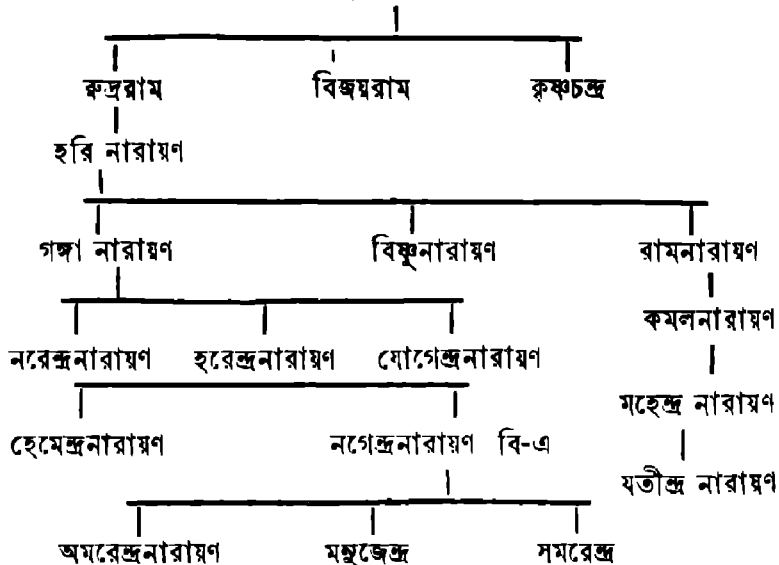
- বিজয়রাম
  - গৌরীশঙ্কর
    - আনন্দচন্দ্র
      - রাজর্ষি গোপালচন্দ্র
        - সুধীরচন্দ্র
    - রামচন্দ্র
      - ঈশ্বরচন্দ্র
      - ঈশানচন্দ্র
      - গোবিন্দচন্দ্র
      - কেশবচন্দ্র বি-এ
        - রমেশচন্দ্র
          - ক্ষিতীশচন্দ্র
        - কিরণচন্দ্র
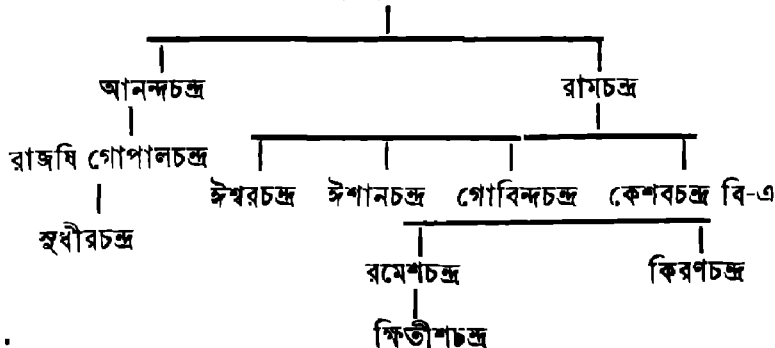
৪নং

কৃষ্ণচন্দ্র আচার্য্য (২নং দ্রষ্টব্য)
কৃষ্ণনারায়ণ
গোপালনারায়ণ
আনন্দনারায়ণ
রাজেন্দ্রনারায়ণ
অমৃতনারায়ণ
প্রসন্ননারায়ণ
সুরেন্দ্রনারায়ণ
সুখেন্দুনারায়ণ
ব্রজেন্দ্রনারায়ণ
সুধাংশুনারায়ণ
হিমাংশুনারায়ণ
বীরেন্দ্রনারায়ণ
ননী

৫নং

হরিরাম আচার্য্য
কৃষ্ণকান্ত
গৌরীকিশোর
ভবানীকিশোর
রামকিশোর
রাজা জগৎকিশোর
রাজেন্দ্রকিশোর
দেবেন্দ্রকিশোর
হেমেন্দ্রকিশোর
জিতেন্দ্রকিশোর
নমু
ননী
জীবন

৬নং

বিষ্ণুরাম
শ্যামকিশোর
কৃষ্ণকিশোর
চন্দ্রকিশোর
ব্রজকিশোর
শিবকিশোর
নবকিশোর
গোকুলকিশোর
কালীকিশোর
বরদাকিশোর
শম্ভুকিশোর
গোলককিশোর
সারদাকিশোর
কেদারকিশোর
ললিতকিশোর
বীরেন্দ্র
বিনোদ
বুধেন্দু
বসন্ত
দ্বিজেন্দ্রকিশোর

৭নং
কৃষ্ণকিশোর
রাম
নারায়ণ
শ্রীধর
দুর্গাদাস
গোপালদাস
বিনায়কদাস
হরদাস
বিধুভূষণ
শ্রীনাথ
হরিদাস
তারকদাস
সরোজকুমার
নথু
প্রিয়কুমার
শৈলেন্দ্র
কৃষ্ণদাস
তপনাথ

৮নং
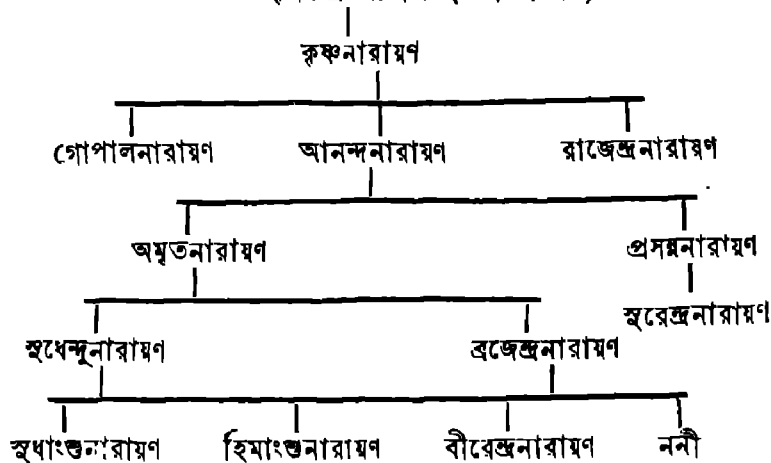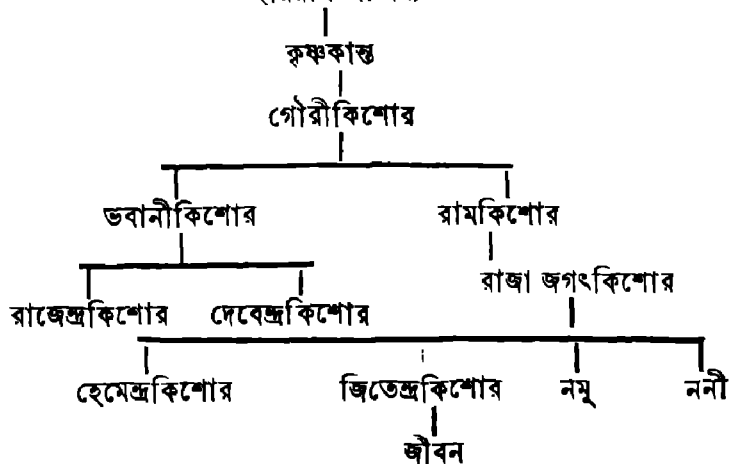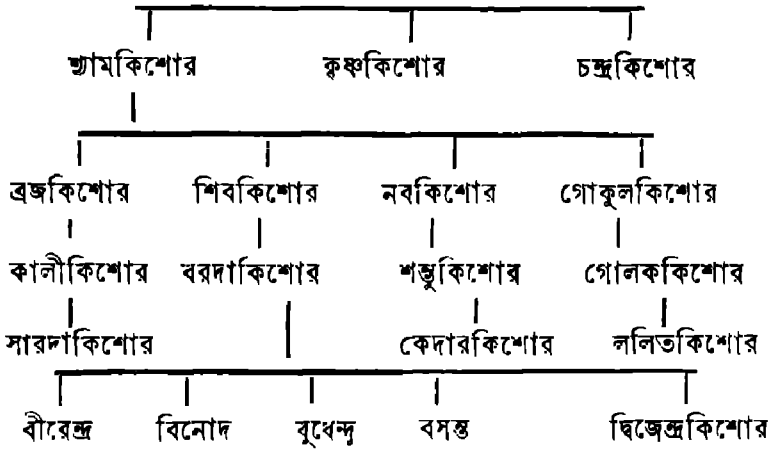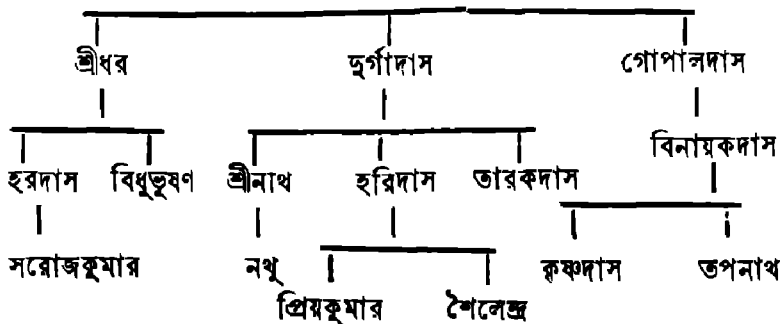
শিবনাথ আচার্য্য (শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র)
রঘুনন্দন
গৌরীকান্ত
কাশীকান্ত
মহারাজ সূর্য্যকান্ত
মহারাজ শশিকান্ত
শীতাংশুকান্ত
সুধাংশুকান্ত
স্নেহাংশুকান্ত

কাশিমবাজার-রাজবংশ।

খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল-গৌরব-রবি অস্তগমনোন্মুখ হইলে এবং মহারাষ্ট্রীয়, ইংরাজ ও ফরাসীর প্রতাপালোকে ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে, মুকসিদাবাদ অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ নামে জনৈক মুসলমান বাঙ্গালা রাজ্যের দেওয়ানী-পদে নিযুক্ত হইয়া উক্ত প্রদেশের তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীর নগরে উপস্থিত হন; পরে তথা হইতে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী মুকসুদাবাদ বা মুকসুদাবাদে আপনার বাসস্থান স্থাপন করেন। উক্ত মুকসুদাবাদ তদীয় নামানুসারে মুর্শিদাবাদে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উত্তর বঙ্গের রাজধানী হইয়া উঠে। সেই সময় হইতেই মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ইতিহাস আরব্ধ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উহা বাঙ্গালার রাজধানীরূপে অভ্যুত্থিত হওয়ায় মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সহিত সমগ্র বঙ্গ রাজ্যের ইতিবৃত্ত বিজড়িত হইয়া, জগতের সমক্ষে তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। মুর্শিদাবাদের উক্ত প্রকৃত ইতিহাস প্রদান করিবার পূর্ব্বে আমরা একবার তাহার প্রাচীন সময়ের বিবরণাবলীর আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

মুর্শিদাবাদ।

বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহা ভাগীরথীর উত্তর তীরে একটী বিস্তৃত নগররূপে বিদ্যমান ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথমতঃ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে রাজ-

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ।

ধানী স্থাপন করেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা ভাগীরথীর পশ্চিমপ্রান্তেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ভাগীরথীর উত্তর তীরবর্ত্তী একটী বিস্তীর্ণ জনপদ মুর্শিদাবাদ প্রদেশ নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন মুর্শিদাবাদের অবস্থান নির্ণীত করিতে হইলে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক হইয়া উঠে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র শুম্ভ উৎকল প্রভৃতি প্রদেশের উল্লেখ দেখা যায়। বেদ বেদাঙ্গ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐ সকল দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদ প্রাচীনকালে ঐ সকল রাজ্যের কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তাহাই প্রথমতঃ দেখিতে হইবে। ঐ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে গঙ্গা ও ভাগীরথীর স্থিতিস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। গঙ্গা ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন নদী। বেদে ও বৈদিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণের সময়ও উক্ত গঙ্গা ভাগীরথী নামে অভিহিত ছিল। ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা ভূতলে আনীত হন বলিয়া তিনি ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে ভাগীরথী গঙ্গার একটী শাখারূপে পরিগণিত। কিন্তু প্রাচীনকালে এই ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান প্রবাহরূপে গণ্য ছিল। কিছুকাল পরে পদ্মা প্রধান প্রবাহ হইয়া উঠিলে, ভাগীরথী ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়েন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—গঙ্গা তাঁহার প্রাচীন প্রধান প্রবাহ ভাগীরথী হইতে পূর্ব্ব মুখে সরিয়া ক্রমে পদ্মাকে আপনার প্রধানত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পদ্মা ক্রমে ক্রমে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে যে স্থানে পদ্মা অবস্থিত, পূর্ব্বে তাহা যে সমুদ্রগর্ভে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণের সময়ে নিম্ন বঙ্গের অনেক স্থান সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া

বোধ হয় এবং বর্ত্তমান পদ্মা এখন যে স্থানে অবস্থিত তাহাও যে রামায়ণের সময়ে সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু রামায়ণের সময়ে পদ্মার অস্তিত্ব যে একেবারেই ছিল না এরূপ নহে। সেই সময়ে পদ্মা বর্ত্তমান পদ্মা হইতে আরও উত্তরে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল। ভাগীরথী বা গঙ্গার সহিত তখন তাহার সংযোগ সাধিত হয় নাই। বরং তাহা বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদের স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। পরে সমুদ্রে দ্বীপ সৃষ্টি আরম্ভ হইলে সমুদ্রের একাংশ প্রাচীন পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া, নদীর আকার ধারণ করে এবং বর্ত্তমান পদ্মারূপে পরিণত হয়। রামায়ণে লিখিত আছে,—ভগবান শঙ্কর মহারাজ ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গাকে স্বীয় জটাজুট হইতে বিন্দ্য সরোবর-অভিমুখে পরিত্যাগ করেন। তথা হইতে গঙ্গা সপ্তধারে প্রবাহিত হন। তাঁহার হ্লাদিনী, নবনী ও নলিনী নামে তিনটী স্রোত পূর্ব্বদিকে ; সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধুনামে তিনটী স্রোত পশ্চিমদিকে এবং অবশিষ্ট আর একটী স্রোত মহারাজ ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে। এই স্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী। সুতরাং ভাগীরথী ও নলিনী যে দুইটী বিভিন্ন নদী তাহা রামায়ণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত নলিনী পদ্মার নামান্তরমাত্র। এই পদ্মা এখন যে স্থানে অবস্থিত, তাহা হইতে ইহা যে আরও উত্তরে প্রবাহিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্রমে সমুদ্রগর্ভে বর্ত্তমান পদ্মার সৃষ্টি হইয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ ভাগীরথী হইতে ক্রমে পূর্ব্বমুখে বর্ত্তমান পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই গঙ্গা বা ভাগীরথী পূর্ব্বে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহার আলোচনা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এক্ষণে যে স্থানে মুর্শিদাবাদ প্রদেশ

অবস্থিত, রামায়ণের সময়ে সেই পর্য্যন্ত ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র-গর্ভে পতিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় নবীনচন্দ্র দাস-প্রণীত একখানি ইংরাজী প্রাচীন ভূগোল হইতে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রামায়ণের যুগে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় রামায়ণের সময় নবদ্বীপ পর্য্যন্তই সমুদ্রগর্ভে থাকাই সম্ভব, কারণ গঙ্গার ভাগীরথী নাম কেবল বর্ত্তমান ভাগীরথী নদী ও তাহার সংলগ্ন গঙ্গার কতকাংশ দ্বারা বুঝা গিয়া থাকে। সুতরাং রামায়ণের সময় হইতে গঙ্গার ভাগীরথী নাম আরব্ধ হওয়ায়, বর্ত্তমান ভাগীরথী নদীর কেবল উক্ত নাম থাকায় রামায়ণের সময় হইতে তাহার কিয়দংশ বিদ্যমান ছিল এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

মহাভারতের সময় নিম্ন বঙ্গের যে স্থান সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল তথায় দ্বীপসৃষ্টি আরব্ধ হইয়া সমুদ্রকে শত শত নদীর আকার করিয়া তুলিয়াছিল এবং গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের নিকট ঐরূপ শত শত নদীর আকার দৃষ্ট হইত। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নন্দা ও কৌশিকী তীর্থে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হন এবং তথায় পঞ্চশত নদী মধ্যে অবগাহন করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মহাভারতের সময় হইতে সমুদ্রগর্ভস্থ নিম্ন বঙ্গের দ্বীপসৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে; পরে ক্রমে ক্রমে তাহা বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তমান নিম্ন বঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তুলে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগ বন্ধুর, ঈষৎ পীতবর্ণাভ ও কঙ্করময় কঠিন মৃত্তিকা দেখিয়া পশ্চিম মুর্শিদাবাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠে এবং ভাগীরথী তাহার বর্ত্তমান প্রবাহ হইতে আরও পশ্চিম দিকে যে

প্রবাহিত ছিল না তাহাও প্রতিপন্ন হয়। আবার ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরস্থ পল্বলময় আর্দ্র সমতল ভূভাগ দেখিয়া তাহা যে ক্রমে ক্রমে চরভূমি হইতেও উৎপন্ন হইয়াছে ইহাও বেশ বুঝা যায়। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ প্রাচীন হিন্দু রাজধানীগুলির চিহ্ন তাহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে এবং ভাগীরথী ও পদ্মা মধ্যস্থিত অসংখ্য বিল ও নদী তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তনের প্রমাণস্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে নদী-ধর্ম্মানুসারে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহেরও পূর্ব্ব ও পশ্চিমে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভূগোলাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে মুর্শিদা-বাদের অবস্থিতি-সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নিখিল-নাথ রায় মহাশয় স্বপ্রণীত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ প্রদেশ প্রাচীন কোন্ কোন্ জনপদের অন্তর্গত ছিল তাহা এক প্রকার প্রতি-পন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাচীন কাল হইতে প্রাচ্য ভারত-বর্ষে অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদের উল্লেখ দেখা যায়; এবং প্রাচীন গ্রন্থাদির বর্ণনায় এইরূপ অনুমান হয় যে, গঙ্গা বা ভাগীরথীর পশ্চিমে অঙ্গ ও পূর্ব্ব পুণ্ড্র এবং বঙ্গ এই দুই রাজ্য অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান মালদহ প্রদেশ পুণ্ড্র বলিয়া স্থির হয় এবং বঙ্গ তাহার দক্ষিণ পূর্ব্ব ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মুর্শিদাবাদ প্রদেশের পশ্চিম ভাগ প্রাচীন কালে অঙ্গ রাজ্যের এবং পূর্ব্বভাগ বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ পশ্চিম মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন স্থান দাতাকর্ণের আবাসস্থল ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচ-লিত আছে। কর্ণ যে অঙ্গদেশাধিপতি ছিলেন এবং মহারাজ যুধি-ষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে বিদিত ছিলেন, তাহা মহাভারতের পাঠক-মাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং উক্ত প্রবাদ হইতেও প্রতিপন্ন

হয় যে, পশ্চিম মুর্শিদাবাদ অঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই অঙ্গ বঙ্গ বিভাগের পর ভাগীরথীর পশ্চিম ও পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশ গৌড় ও বঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে এবং গৌড় ও বঙ্গ উভয়ই সাধারণতঃ গৌড়দেশ নামে অভিহিত হইত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড় ও বঙ্গ দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বঙ্গে ও বঙ্গ হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত গৌড়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, গৌড় অনেক পরিমাণে প্রাচীন অঙ্গ ও পুণ্ড্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্ত্তমান ভাগীরথী-প্রবাহ বঙ্গ ও গৌড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। গৌড় ও বঙ্গ যে দুইটী পৃথক্ প্রদেশ তাহা পরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। বরাহমিহির বঙ্গ ও গৌড়কে দুইটী স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের রচনা হইতেও গৌড় ও বঙ্গের পার্থক্য বুঝা যায়। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে গৌড় প্রদেশ হইতে মুর্শিদা-বাদের পশ্চিমভাগ গৌড়ের ও পূর্ব্বভাগ বঙ্গের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটী কর্ণসুবর্ণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং পশ্চিম মুর্শিদাবাদ যে, গৌড়দেশের কর্ণসুবর্ণ বিভাগের অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং পূর্ব্ব মুর্শিদাবাদ যে সমতট বা বঙ্গের অন্তর্গত ছিল ইহাও অল্পায়াসে বুঝা যাইতেছে। গৌড় বঙ্গবিভাগের পর আমরা মিথিলা, রাঢ়, উপবঙ্গ, বা বাগ্‌ড়ি বঙ্গ বরেন্দ্র এই পাঁচ বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, বল্লাল সেন দেব বঙ্গ বা গৌড় রাজ্যকে এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত পাঁচ ভাগের মধ্যে রাঢ় প্রদেশ অনেক পরিমাণে অঙ্গ বা গৌড়ের স্থান অধিকার করে এবং তাহা উত্তর রাঢ় দক্ষিণ রাঢ় নামে বিভক্ত হয়। ভাগীরথী, পদ্মা ও

সমুদ্রের মধ্যস্থিত ব-দ্বীপ উপবঙ্গ বা বাগড়ি নামে অভিহিত। সুতরাং এই বাগড়ি যে প্রাচীন বঙ্গের একাংশ মাত্র তাহা বুঝা যাইতেছে। রাঢ় বিভাগ সেন-বংশের সময় হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেও বহু-পূর্ব্ব হইতে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিগাস্থিনিস্ গঙ্গ্যা-বিডি নামে এক জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিণী সেইখানেই গঙ্গা এই জনপদের পূর্ব্বসীমা। ইহাতে রাঢ় দেশই বুঝাইতেছে এবং তাঁহার গঙ্গ্যাবিডি যে গঙ্গাবাড়ি বা গঙ্গারাষ্ট্রের অপভ্রংশ তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। সুতরাং রাঢ়প্রদেশ যে বহুপূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেন বংশের সময় তাহা একটী প্রসিদ্ধ বিভাগ হইয়া উঠে এবং অদ্যাবধি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত ভূভাগই রাঢ় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ ভূভাগ অদ্যাপি বাগড়ি নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং মুর্শিদাবাদের পশ্চিম অংশ উত্তর রাঢ়েরও পূর্ব্বাংশ উক্ত বঙ্গ বাগড়ির অন্তর্গত। মুসলমান বিজয়ের পর মুর্শিদাবাদ গৌড়ের পাঠান নরপতিগণের অধীন ছিল। কিন্তু সে সময় বঙ্গরাজ্য কিরূপ ভাবে বিভক্ত হইয়াছিল তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মোগলকেশরী আকবর বাদশাহের রাজত্ব সময়ে বঙ্গবিজয়ের পর তোড়রমল্ল সুবা বাঙ্গালাকে ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদের কতকাংশ সরকার উদম্বর বা টাঁড়ার ও কতক অংশ সরকার সেরিফাবাজের অধীন হয়। উক্ত সরকার উদম্বরের অন্তর্গত চুয়াখালি পরগণায় মুর্শিদাবাদ নগর স্থাপিত হয়। সরকার সেরিফাবাদের অন্তর্গত ফতেসিংহ মুর্শিদাবাদের একটী প্রসিদ্ধ পরগণা। এই সরকার পরগণা বিভাগের সময়ে ভাগীরথীকে প্রাকৃতিক সীমারূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এই জন্য তাহারা ভাগীরথীর

পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর পারে বিস্তৃত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ যে বাঙ্গালা দেশকে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে মুর্শিদাবাদ চাকলার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। কোম্পানীর রাজত্বারম্ভেও মুর্শিদাবাদ একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদ একটী জেলারূপে অবস্থিত। ১৮৭৫ খৃঃ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা রাজসাহী বিভাগের অন্তর্ভূর্ত ছিল। এক্ষণে উহা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভূর্ত। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন অবস্থা নির্ণয়-প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশই মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। পূর্ব্ব পারের কতকাংশ বিদ্যমান থাকিলেও ভাগীরথী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাওয়ায় তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই জন্য মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব তীরে কোন প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান নাই। কেবল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে তাহার প্রাচীন চিহ্নের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ মুর্শিদাবাদ প্রদেশের মধ্যে কিরীটেশ্বরী একটী পুরাতন স্থান। ইহার প্রকৃত নাম কিরীটকণা। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খৃঃ পূর্ব্ব ৪০০ বৎসরের পর হইতে কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। *

কাশিমবাজার।

পশ্চিম বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের ধ্বংশের পর যৎকালে কলিকাতার অভ্যুদয় সুদূর ভবিষ্যৎ গর্ভে অন্তর্নিহিত ছিল, সেই সময় কাশিমবাজার বাণিজ্যব্যাপারে নিম্নবঙ্গে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

* নিখিল বাবুর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ৭৩ পৃষ্ঠা।

মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হইবার পূর্ব্ব হইতে কাশিমবাজারের নাম পাশ্চাত্য জগতে বিঘোষিত ছিল। ইহাতে এবং ইহার নিকটস্থ অনেক স্থানে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় জাতির কুঠী সংস্থাপিত হয়। তন্মধ্যে কাশিমবাজারে ইংরাজদিগের, কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের, শেতাখাঁর বাজারে আর্ম্মেনিয়দিগের ও সৈদাবাদ ফরেসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কাশিমবাজার ও কালিকাপুরে ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের একটী সমাধিক্ষেত্র এবং শেতাখাঁর বাজারে আর্ম্মেনিয়দিগের একটী উপাসনা-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কাশিমবাজার সমাধিক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরী ও শিশু কন্যা এলিজাবেথের সমাধি নিহিত আছে। আর্ম্মেনিয়দিগের উপাসনা-মন্দিরে তাহার নির্ম্মাণ অব্দে ১৭৫৮ খৃঃ লিখিত রহিয়াছে। ফরাসীদিগের নির্ম্মিত ফরাসডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বাঁধের ভগ্নাবশেষ আজিও ভাগীরথীর স্রোত প্রতিহত করিয়া সমস্ত নগরকে রক্ষা করিতেছে। ফরাশডাঙ্গায় কিছুকাল কূটনীতিবিশারদ ডুপ্লে বাস করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সময়ল সাহেব এইখানে অধ্যক্ষতা করিতেন। সিরাজের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। কাশিমবাজারে ইংরাজ কুঠী বা রেসিডেন্সির কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নাই। লোকে সেই স্থানগুলির নির্দ্দেশ করিয়া থাকে মাত্র। তৎকালে ভাগীরথী এই সকল স্থানের নিম্নদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেন, কিন্তু তাঁহার গতি বক্র হওয়ায়, কাশিমবাজার হইতে মুর্শিদাবাদে যাইতে অনেক সময় লাগিত। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন যে, অন্ধকূপ-হত্যার পর যখন তাঁহাকে কলিকাতা হইতে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনয়ন করা হয়, তখন তিনি প্রাতঃকালে সৈদাবাদ-ফরাসডাঙ্গা হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় মুর্শিদাবাদে

পৌঁছিয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে সহসা ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের নিম্নস্থ ভাগীরথীর অংশ বদ্ধ বিলে পরিণত হয় এবং ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইয়া উক্ত স্থানসমূহকে মহা-শ্মশানে পরিণত করে।

খৃঃ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশিমবাজারের নাম ইউরোপখণ্ডে বিস্তৃত হয়। ভাগীরথীর যে অংশ পদ্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া জলঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই ভাগ সচরাচর ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক কাশিমবাজার নদী নামে অভিহিত হইত এবং পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যস্থিত ত্রিকোণ ভূভাগ কাশিমবাজার দ্বীপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মেজর রেণেল কাশিমবাজার দ্বীপ নাম দিয়া উক্ত ত্রিকোণ ভূভাগের একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত মানচিত্র অঙ্কিত হয়। তাহাতে সৈদাবাদ-ফরাসডাঙ্গা হইতে কাশিমবাজারের নিম্ন দিয়া মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর বক্রগতি নদীর প্রবাহরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রেণেলের মানচিত্র হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক স্থানের স্থিতিস্থান সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়। কাশিমবাজার নদীর সঙ্কীর্ণতার কথা বহুদিন হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বার্নিয়ার ও টেপারনিয়ার হুগলিতে পৌঁছিলে বার্নিয়ার জলপথে আসার অসুবিধা-বোধে স্থলপথে কাশিমবাজারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। টেবারনিয়ার ইহাকে একটী ক্ষুদ্র খাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হেজেস্ ১৬৮৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে নদীয়া হইতে মহনায় উপস্থিত হইয়া জলপথে আসিতে না পারিয়া স্থলপথেই কাশিমবাজারে আগমন করেন। হলওয়েলও কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিবার সময় জলাভাবে বজরা পরিত্যাগ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি নৌকার সাহায্যে মুর্শিদাবাদ

মুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য হন। বরাবর সঙ্কীর্ণ থাকিলেও ভাগীরথীর এমন দুর্দ্দশা আর কখনও ঘটে নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কাশিমবাজার বহু পূর্ব্ব হইতেই নিম্ন বঙ্গের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে প্রখ্যাত হয়। ১৬৩২ খৃঃ অব্দে ব্রুটান নামক জনৈক ইউরোপীয় ইহাকে রেশম মসলিনের প্রধান বন্দর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কাশিমবাজারে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির উল্লেখ দেখা যায়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে জন কিন বার্ষিক ৪০ পাউণ্ড বেতনে কাশিমবাজারে ইংরাজ কুঠীর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ জব চার্ণক কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁর কঠোর আদেশে বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশিমবাজার কুঠীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার পর ইংরাজেরা পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলে কাশিমবাজার কুঠীর পুনঃনির্ম্মাণ হইতে থাকে। সিরাজউদ্দৌল্লা যৎকালে কাশিমবাজার কুঠী আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ওয়াট্‌স্ রেসিডেণ্টে ওয়ারেন হেষ্টিংস একজন সামান্য কর্ম্মচারীরূপে কর্ম্ম করিতেন। কাশিমবাজার পূর্ব্বে অগণ্য অট্টালিকায় পরিপূর্ণ ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহার পরস্পর-সংলগ্ন গগনস্পর্শী অট্টালিকারাজির জন্য রাজপথে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারিত না এবং দুই তিন ক্রোশ-ব্যাপিনী সৌধমালার অগ্রভাগ দিয়া লোকে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিত। ইহার পূর্ব্ব বিবরণ এক্ষণে আরব্য উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। কয়েকটি সমাধি-ক্ষেত্র ভিন্ন ইহার পূর্ব্ব নিদর্শন এখন আর কিছু নাই।

কাশিমবাজারে প্রাচীন কালের চিহ্নের মধ্যে একটী জৈন মন্দির মুর্শিদাবাদের জৈন মহাজনদিগের যত্নে অদ্যাপি সুরক্ষিত রহিয়াছে।

এই মন্দিরকে নেমীনাথের মন্দির বলা হইয়া থাকে; যেখানে নেমিনাথের মন্দির অবস্থিত তাহার নাম মহাজনটুলি। ইহার চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণ বাস করিত। নেমীনাথের মন্দিরের সম্মুখে জগৎশেঠদিগের একটী ব্যবসায়-ভবন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যতদিন হইতে কাশিমবাজার বাণিজ্যস্থান বলিয়া কথিত, ততদিন হইতে নেমীনাথের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে একটী উদ্যান এবং উদ্যানের পশ্চাৎ ভাগে একটী পুরাতন পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর নাম মধুগড়। মধুগড় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। মধুগড়ের চতুষ্পার্শে জৈন মহাজনদিগের বাসভবন ছিল। চারিদিক সোপানাবলির দ্বারা পরিশোভিত হইয়া মধুগড় সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। যৎকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ সমস্ত বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিয়া মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, সেই সময়ে ইহার চতুষ্পার্শের মহাজনেরা আপনাদিগের ধনসম্পত্তি চিহ্নিত করিয়া মধুগড়ের গর্ভে নিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই আপনাদিগের ধনসম্পত্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। তদবধি এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যক্ষদেব তৎসমুদয়কে অধিকার করিয়া ইহার গর্ভে বাস করিতেছেন। কাশিমবাজার-ধ্বংসের সহিত মধুগড়ের কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমে শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ দ্বারা উহা সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। মধুগড়ের চতুর্দ্দিক এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকায় কুম্ভীর-সকল ইহার গর্ভে বাস করিতেছে এবং সময়ে সময়ে বিশাল অজগর ইহার জলে কিংবা বনমধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

নেমীনাথের মন্দির ব্যতীত কাশিমবাজার ব্যাসপুরে একটী সুন্দর শিবমন্দির আছে। এই মন্দির ব্যাসপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতা ভৈরব ন্যায়বাগীশ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

হয়। মন্দির মধ্যে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ অবস্থিত। মন্দিরটী নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তিবিশিষ্ট ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত। বরানগরস্থ রাণী ভবানী-নির্ম্মিত শিবমন্দিরের অনুকরণে ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরটী অধিক পুরাতন নয় বলিয়া আজিও দেখিবার উপযোগী। ইহার উপর লালগোলার ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ইহার পুনঃসংস্কার করায় ইহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। কাশিমবাজারের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে বিষ্ণুপুর নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ কালীমন্দির বিদ্যমান। এই মন্দিরে পূজা-উপলক্ষে বিশেষতঃ প্রতিবৎসর পৌষমাসে অগণ্য লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরের কালীমন্দির কৃষ্ণেন্দ্র হোতা নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত আছে। কৃষ্ণেন্দ্র হোতার অনেক সৎকীর্ত্তি এতদঞ্চলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সৈদাবাদের দয়াময়ী ও জাহ্নবী-তীরস্থ শিবমন্দির সর্ব্বপ্রধান। খাগরা হইতে বিষ্ণুপুরে আসিতে হইলে একটী বিল অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া হোতা তথায় একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাপি তাহা হোতার সাঁকো নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণেন্দ্র হোতা পলাশীর যুদ্ধ, দেওয়ানী গ্রহণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘটনার সময় বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোন কোন দেব-মন্দিরের শিলালিপির সময় হইতে ঐ রূপই অনুমান হয়। এইরূপ দুই একটী মন্দির ও সমাধিক্ষেত্র ব্যতীত কাশিমবাজারের পুরাতন চিহ্ন অপর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

খৃঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশিমবাজার বাঙ্গালার মধ্যে একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে ইহাতে ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্যকার্য্য চালাইবার

নিমিত্ত অনেক দেশীয় লোক কাশিমবাজারে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেক বঙ্গবাসী কাশিমবাজারে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কাশিমবাজার আদিপুরুষের নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। সচরাচর তিনি কান্তবাবু বলিয়া প্রসিদ্ধ। কান্তবাবুর পূর্ব্বপুরুষেরাও সেই উদ্দেশ্যে কাশিমবাজারে আপনাদের আশ্রয়-স্থান স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্ত্রেশ্বরের অধীন রিপী গ্রাম বা সিজনা। তথা হইতে ব্যবসায়ের অনুরোধে ইঁহারা কাশিমবাজারের নিকট শ্রীপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান কাশিমবাজারের রাজবাটী সেই শ্রীপুরেই অবস্থিত। কান্তবাবুদের ২।৩ পুরুষ পূর্ব্ব হইতে রেশম ও সুপারীর ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে। ইঁহারা ধনশালী ব্যবসায়ী না হইলেও কখনও অন্নবস্ত্রের অভাবনীয় কষ্ট বোধ করেন নাই। ইঁহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন।

[কাশিমবাজার-রাজবংশের আদিপুরুষ]

রাধাকৃষ্ণ নন্দী সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পিতা। কাহারও কাহারও মতে রাধাকৃষ্ণের পিতা সীতারাম এবং কাহারও কাহারও মতে তাঁহার পিতামহ অর্থাৎ সীতারামের পিতা কালী নন্দী প্রথমে কাশিমবাজারে আগমন করেন। রাধাকৃষ্ণ বর্দ্ধমান জেলার কুরুম্ব গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতিতে তিলি। অনেকে তাঁহাদিগকে তেলী বলিয়া ভ্রমে পতিত হন এবং সেইজন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে "অয়েলম্যান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহারা তেলী নহেন, কিন্তু তিলি। তিলিগণ নবশাখ শূদ্রের মধ্যে এক শাখা। সুতরাং জাত্যংশে তাঁহারা শূদ্রদের মধ্যে হীন নহেন। রাধাকৃষ্ণের পাঁচ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণকান্ত অন্যতম। রাধাকৃষ্ণ

পূর্ব্বপুরুষদিগের রেশমের ও সুপারীর ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতেন। তাঁহার মুদিখানার দোকানও ছিল। তিনি নিজে ভাল ঘুড়ি উড়াইতে পারিতেন, এজন্য লোকে তাঁহাকে 'খলিফা' নামে অভিহিত করিত। কাশিমবাজারে ইংরাজ-কুঠী ও রেসিডেন্সির নিকটে তাঁহাদের দোকান ছিল। সেইজন্য কুঠীর লোকদিগের সহিত তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় হয়। কৃষ্ণকান্ত বাল্যকালে বাঙ্গালা, ফরাসী ও সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কান্তবাবু ২।৩ হাজার ইংরাজি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা হিসাব-পত্রেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কান্তবাবুর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ থাকায়, তিনি কাশিমবাজারের ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইংরাজ বণিকদিগের সহিত ব্যবসায়-বিষয়ে সম্পর্ক থাকায় কান্তবাবু ক্রমে ক্রমে কাশিমবাজারে ইংরাজদের কুঠীতে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে নিজেদের রেশমের ব্যবসায় দেখিয়া আসিতে-ছিলেন, তজ্জন্য উক্ত বিষয়ে তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মে। ইংরাজদের কুঠীতে রেশমের ব্যবসায়ই প্রধান বলিয়া এবং সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া শীঘ্রই তাঁহার পদোন্নতি ঘটে। এই সময় বঙ্গের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৫৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহাবত জঙ্গের রাজত্বকালে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতা হইতে কাশিমবাজার-কুঠীতে গমন করেন। ক্রমে কান্তবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় জন্মিলে তদীয় কার্য্যদক্ষতায় তিনি তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। ওয়ারেন হেষ্টিংস এই সময়ে একটী নিম্নতম কর্ম্মচারী ছিলেন। যাহা হউক, এই সময় হেষ্টিংসের কর্ত্তব্য-পালনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহার

প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলিবর্দ্দি মৃত্যুকালে বলিয়া যান, ইংরাজেরা দিন দিন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে, যেরূপে পার তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিবে। মাতামহের সেই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া সিরাজ ইংরাজদিগের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং অবিলম্বে কাশিমবাজার-কুঠী আক্রমণ করিলেন। নবাব সৈন্যের নিকট ইংরাজ বণিকগণ আত্ম-সমর্পণ করিল। এই সময় ওয়াট্‌সন সাহেব কাশিমবাজারের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলেট ও বাটসন সাহেবদ্বয় তাঁহার সদস্যস্বরূপ অবস্থিতি করিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ তাঁহার অধীন একজন কর্ম্মচারীমাত্র ছিলেন। ইংরাজেরা আত্মসমর্পণ করিলে নবাবের সেনানীগণ তাঁহাদিগকে সুচতুর প্রহরা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। এই বন্দীদিগের মধ্যে কান্তবাবুর সুপরিচিত হেষ্টিংস সাহেবও কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হয়েন। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। কথিত আছে, মুক্তিলাভের সহিত কান্তবাবুর এক বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার ভবিষ্যৎ-ভাগ্যোদয়ের সূচনা হইয়াছিল।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ওয়ারেন হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় থাকিতে থাকিতে তথা হইতে পলায়ন করিয়া কাশিমবাজারে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। হেষ্টিংস কালিকাপুরের ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ভিনেট সাহেবের জামিনে নবাবের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদেই অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক ও অন্যান্য ইংরাজগণ কলিকাতা আগমনের পর ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস এই সভায় নবাব সরকারের যাবতীয় সংবাদ তাঁহাদিগকে গোপনে প্রেরণ

করিতেন। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, ভীত হইয়া হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ এই পলায়নের সময়ই তিনি কাশিমবাজারে স্বীয় পরিচিত বন্ধু কান্ত বাবুর আশ্রয়েই থাকিতে বাধ্য হন। তাঁহার পরিচিত কান্তবাবু আপনার ভীষণ বিপদ সম্মুখীন দেখিয়াও এবং নবাবের কঠোর শাসনে ভীত না হইয়া হেষ্টিংসকে আশ্রয় দান করিলেন। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কান্তবাবু তাঁহার জন্য কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য আয়োজন করিতে পারেন নাই। গৃহে পর্য্যুষিত অন্ন) পান্ত ভাত) ও চিঙ্গট মৎস্য মাত্র ছিল। ক্ষুৎপীড়িত হেষ্টিংস তাহাই পরিতোষসহকারে আহার করিয়াছিলেন। এদিকে নবাবের প্রহরিগণ হেষ্টিংসের অনু-সন্ধানে কাশিমবাজারে বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু নির্ভীক কান্তবাবু তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। পরিশেষে তাহারা যখন অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, তখন কান্তবাবু হেষ্টিংসের পলায়নের আয়োজন করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস কান্তবাবুর চেষ্টায় কাশিমবাজার পরিত্যাগ করিলেন। কাশিমবাজার পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাশ্রুনয়নে কান্তবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এক নিদর্শনপত্র দিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর যদি কখনও দিন দেন, তাহা হইলে যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করিব।" বলা বাহুল্য, হেষ্টিংস এই অঙ্গীকার সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া-ছিলেন। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বিভীষিকার মধ্য হইতে যে উপকারী বন্ধু স্বীয় প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিপদস্বপ মস্তকে লইতে অগ্রসর, যাহার হৃদয়ে কণামাত্র মনুষ্যরক্ত আছে সে তাহার প্রত্যুপকার না করিয়াই থাকিতে পারে না। সেই সঙ্কটকালে কান্তবাবু আশ্রয়দান না করিলে হয়ত হেষ্টিংস ধৃত হইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হইতেন, এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইত। এইজন্য হেষ্টিংস

কান্তবাবুর উপকার জীবনেও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁহার যেরূপ পদোন্নতি ঘটিয়াছে, তিনিও তদনুযায়ী কান্তবাবুর উপকার করিয়াছেন। কান্তবাবুর উপকারের নিমিত্ত তিনি মাথা পাতিয়া অম্লান-বদনে কর্ত্তৃপক্ষের তিরস্কার পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পলাসী যুদ্ধের পর যখন মিরজাফর ক্লাইবের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই সময় হইতে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মিরজাফর ও অন্যান্য নবাবগণ ইংরাজদিগের বিনা পরামর্শেই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। এই সময়ে তাঁহাদিগের পরামর্শেই নবাব-দরবারের অবস্থা জানিবার জন্য একজন করিয়া ইংরাজ রেসিডেণ্টের মুর্শিদাবাদে থাকার প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে কাশিমবাজার-কুঠীর অধ্যক্ষ নবাব-দরবারে ইংরাজদের আর্জি পেস করিতেন এবং হুকুমাদি লইতেন; এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল। অর্থাৎ নবাবকে কোন পরামর্শ দিবার ও তাঁহাকে কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে সর্ব্বদা একজন রেসিডেণ্ট থাকেন। মরাদবাগে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। হেষ্টিংসের বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হইয়া ক্লাইব ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে উক্ত রেসিডেণ্ট-পদ প্রদান করেন। হেষ্টিংস পূর্ব্ব হইতেই কান্তবাবুর উপকারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেইরূপ উচ্চ পদ না পাওয়ায় সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার পর ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি কাউন্সিলের একজন সদস্য নিযুক্ত হয়েন। এই সময় হইতে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। মিরজাফরের রাজত্বকাল হইতে তাহার সূচনা হয়। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে মির কাশিমের রাজ্যাভিষেক হইলে এই বিষয়ের অধিকতর বিস্তার

ঘটে। গভর্ণার হইতে কোম্পানীর সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আপন আপন ব্যবসায় চালাইতে থাকেন। এতদ্ভিন্ন বেসরকারী ইংরাজগণও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুবিধা করিয়া লয়েন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস প্রভৃতিও এ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। হেষ্টিংস এই সময় কান্তবাবুকে আপনার মুৎসুদ্দী নিযুক্ত করিয়া লয়েন। কান্তবাবুও তাঁহার ভ্রাতা নৃসিংহ হেষ্টিংসের ব্যবসায় পরিচালনা করিতেন।

এইরূপ কথিত আছে যে, হেষ্টিংস ও ভান্সিটার্ট এই সমস্ত ব্যবসায় পরিচালনের অর্থ নবাব মিরকাশিমের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। যখন মিরকাশিমের নিকট তাঁহারা মুর্শিদাবাদের সিংহাসন বিক্রয় করেন, তখন তাঁহার নিকট উভয়েই উৎকোচস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেরূপেই হউক, তাঁহারা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া লাভবান হইতে থাকেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় স্বীয় আত্মীয়দিগের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। এমন কি, তাঁহার নিজের ব্যবসায়ের অর্থ পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়া যায়। তিনি অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেন। অবশেষে কান্তবাবুকে ১২ হাজার টাকার জন্য লিখিয়া পাঠাইতে বাধ্য হয়েন। কান্তবাবু যদিও তাঁহার মুৎসুদ্দি ছিলেন, তথাপি তাঁহার দ্বারা সে সময়ে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে নাই, কাজেই তিনি স্বীয় ১২ হাজার টাকা দিতে অক্ষম হয়েন। অনন্যোপায় হইয়া হেষ্টিংস সজা পিদ্রুষের নিকট হইতে শেষে সেই টাকা গ্রহণ করেন এবং যখন তিনি দ্বিতীয় বার মান্দ্রাজে আগমন করেন, সেই সময়ে উক্ত অর্থ পরিশোধ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস জানিতেন যে, কান্তবাবু সেরূপ ধনী ছিলেন না যে, তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন; তজ্জন্য নিজ বিপদের সময়ও কান্তবাবুর সাহায্য না পাইয়াও তাঁহার উপর বিরক্ত হন নাই

এবং তাহার পরও তাঁহাকে চিরদিনই ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উন্নতির জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে বার্ণিয়ার সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে তাঁহার পদে গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং তিনি আসিয়াই পুনর্ব্বার কান্তবাবুকে আপনার মুৎসুদ্দি নিযুক্ত করেন। এই সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ আর আপনাপন ব্যবসায় পরিচালন করিতে পারিতেন না। ব্যক্তিগত বাণিজ্যে কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া, কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হয়েন। কাজেই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ, আপনাদিগের মুৎসুদ্দিদের স্বনামে বা বেনামে ব্যবসায় পরিচালন এবং জমিদারী ও ফারম প্রভৃতির ইজারা লইতে আরম্ভ করেন। মুৎসুদ্দিগণ ইহাতে যথেষ্ট অর্থাগমের উপায় করেন। তাঁহারাই দেশ মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহাই করিতে পারিতেন। সাহেবদের সহিত দেখা বা কোনও কথা বলিতে হইলে প্রথমে তাঁহাদিগকে জানাইতে হইত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে হয়ত সে কথা সাহেবদিগকে জানাইতেন নতুবা গোপন করিয়া রাখিতেন: এই সকল বেনীয়ন বা মুৎসুদ্দিগণ যাবতীয় শস্যশালিনী ভূমির জমীদারী ও প্রধান প্রধান লবণের কুঠীগুলি আপনাদের অধিকারে রাখিতেন, ও দেশ মধ্যে অনেক দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা সাহেবদিগের দেওয়ান বলিয়া অভিহিত হইতেন।

১৭৭৩ খৃঃঅব্দে লর্ড নর্থের রাজ্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী যথাবিধি প্রবর্ত্তিত হইলে হেষ্টিংস গবর্ণর-জেনারল হন। তাঁহার সাহায্যের জন্য চারিজন সদস্যের মধ্যে তিনজন এবং রাজ্যের বিচার জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ যথাসময়ে কলিকাতায় আগমন করেন। এই নবাগত-

দিগের মধ্যে সদস্যগণের সহিত হেষ্টিংসের বিরোধ ও বিচারকদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর-পদ-প্রাপ্তির পর হইতে এবং তাঁহাকে গবর্ণর জেনারেল হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কান্তবাবুর যথেষ্ট উন্নতি করিয়া দেন। তিনি কান্তবাবুকে কতকগুলি জমিদারী পরিদর্শনের ও তাহার সুশৃঙ্খলা-সাধনের ভার প্রদান করেন। কান্তবাবু প্রথম প্রথম জমিদারীর কার্য্য ভাল বুঝিতেন না, কিন্তু অবশেষে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সাহায্যে তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হেষ্টিংস যৎকালে শাসন-ব্যাপারে নানাবিধ নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময়ে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন, এবং হেষ্টিংসও সেই সময়ে তাঁহাকে অনেকগুলি লাভকর জমীদারী ও ফারম ইজারা করিয়া দেন। এই সময় কান্তবাবু কাশিমবাজাব হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। প্রথমে তিনি বহুবাজারে একটী ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিতেন, পরে তথা হইতে যোড়াসাঁকোর বৃহৎ বাটীতে আসিয়া বাস করেন। যোড়াসাঁকোর সে বাটী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ সকল ফারম ও জমীদারী হইতে তাঁহার প্রচুর ধনাগম হয়।

কান্তবাবুকে জমীদারী ও ফারম প্রভৃতি প্রদান করিবার জন্য হেষ্টিংস অনেক অসদুপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তিনি প্রথমতঃ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অবহেলা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অনেক জমিদারের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই সময়ে কতকগুলি লোকের সাহায্যে তিনি বাঙ্গালার জমীদার ও প্রজাবর্গের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। উহাদের সাহায্যে হেষ্টিংস যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই অনেক লাভকর জমিদারী প্রদান করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয় কান্তবাবুই অধিক সুবিধা প্রাপ্ত

হন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে রাজ্যসংক্রান্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলে তাহার মধ্যে এইরূপ একটী বিধি থাকে যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের কোনও পেস্কার, বেনীয়ন বা অন্য লোক কিম্বা তাহাদের আত্মীয় কোনও জমিদারী বা ফারম ইজারা লইতে পারিবে না, এইরূপ করিলে সেই কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত হইতে হইবে। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ যদি ইজারাদার-দিগকে সাহায্য করেন তাহা হইলে কেহ তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইবে না। কোম্পানী ইচ্ছা করেন না যে, উহাদের কর্ম্মচারীদের সহিত কোনও রূপ বন্দোবস্ত হয়। কেরাণীর কর্ম্মচারীরা এইরূপ ইজারাদার হইলে প্রজাগণ আপনাদিগের সম্পত্তি-রক্ষার জন্য কাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সুতরাং তাঁহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে ভূয়োভূয়ঃ এই বিধি-অনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্ণর জেনারেলই তাহা লঙ্ঘন করিয়া আপনার বেনিয়নদের অত্যন্ত সুবিধা করিয়া দেন, এবং তজ্জন্য জমিদার ও প্রজাদিগের উপর যদিও অত্যাচার করিতে হইত তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। এক সময়ে কান্তবাবু তাঁহার বিশেষ উপকার করেন, এমন কি প্রাণরক্ষা করিয়াছেন বলিতে হইবে, সেইজন্য তিনি তাহার প্রত্যুপকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু দস্যুদিগের মত পরস্বাপহরণ করিয়া প্রত্যুপকারের এই উপায় ন্যায়ধর্ম্মানুসারে সমর্থন করিতে পারা যায় না। সদুপায়ে সেই প্রত্যুপকার করিলে উপকর্ত্তা—উপকৃত ও উভয়েরই পুণ্যলাভ হয়।

হেষ্টিংস বলপূর্ব্বক কান্তবাবুকে যে সমস্ত জমীদারী প্রদান করেন, তন্মধ্যে বাহারবন্দ পরগণাই সর্ব্বপ্রধান, বাহারবন্দ রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত; ইহা একটী বিস্তৃত ও আয়কর জমীদারী। বাহারবন্দ আজিও

কাশিমবাজার-রাজবংশের অধীন আছে এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও লাভকর জমীদারী। বাহারবন্দ পরগণা পূর্ব্বে রাণী সত্যবতীর জমীদারীর অন্তর্গত ছিল; তিনি ধর্ম্মোপার্জ্জন-মানসে সংসার পরিত্যাগ করিয়া যৎকালে পুণ্যভূমি কাশীতে গমন করেন, সেই সময় স্বীয় ভগিনীপুত্রী, হিন্দুবিধবার উচ্চ আদর্শ, বঙ্গভূমির জলন্ত গৌরব, মূর্ত্তিমতী পতিব্রতা, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-রূপিণী রাণী ভবানীকে বাহারবন্দ প্রদান করিয়া যান। রাণী সত্যবতীর সুকীর্ত্তি আজও বাহারবন্দ অলঙ্কৃত করিতেছে। তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত দেবমন্দির আজিও তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ধর্ম্মপালন যাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সেই ধর্ম্মপালন আরও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে বলিয়া তিনি রাণী ভবানীকে স্বীয় জমীদারী প্রদান করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রচলিত, শুধু বঙ্গদেশে কেন ভারতের অনেক স্থানে তাঁহার গৌরব বিঘোষিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে তাঁহার দেবভক্তি, ব্রাহ্মণ-প্রতিপালন, দীন দুঃখীর প্রতি কৃপার তুলনা আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ কতদূর প্রবল, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। যাঁহাকে বাঙ্গালী ছদ্মবেশধারিণী ভবানী বলিয়া জানে, তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে রাণী সত্যবতী স্বীয় উদ্দেশ্যপালনের জন্য নিজ সম্পত্তি প্রদান করিতে পারেন? রাণী ভবানী স্বীয় মাতৃস্বসার নিকট বাহারবন্দ পাইয়া সত্যবতীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন।

বাহারবন্দ পরগণা অত্যন্ত লাভজনক দেখিয়া হেষ্টিংসের মন বিচলিত হইল। তিনি স্বীয় প্রতিপালক কান্তকে কিরূপে তাহা প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, রাণী ভবানী স্ত্রীলোক। তিনি এরূপ জমীদারী শাসন করিতে অক্ষম। অতএব

তাঁহার হস্তে বাহারবন্দ থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। হেষ্টিংস যে দোষ দেখাইয়া রাণী ভবানীর হস্ত হইতে বাহারবন্দ কাড়িয়া লন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি রাণী ভবানীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বাহারবন্দ লইয়া কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথকে ৪২,৬৩৪৲ টাকায় চিরস্থায়ীরূপে ইজারা প্রদান করিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে এই ব্যাপার ঘটে। লোকনাথ তৎকালে ১০।১১ বৎসর বয়স্ক বালকমাত্র ছিলেন। যদিও কান্তবাবুর বেনামীতে লোকনাথকে জমীদারী দেওয়া হয়, তথাপি প্রকাশ্যভাবে একটী বালকের হস্তে জমীদারী প্রদান করিতে হেষ্টিংস কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই।

হেষ্টিংস বাহারবন্দ কান্তবাবুকে প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু প্রজারা রাণী ভবানী ভিন্ন আর কাহাকেও কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল না। কান্তবাবু অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেন, তাঁহার পক্ষে সরকারের রাজস্ব দেওয়া ভার হইয়া উঠিল। যদিও অন্যান্য লোকের সহিত তুলনায় তাঁহার রাজস্ব অতি সামান্য মাত্র ছিল, তথাপি কর আদায় না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি হেষ্টিংস সাহেবকে সমস্ত বিষয় জানাইলে, হেষ্টিংস তাঁহার সুবিধা করিয়া দেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে যখন কান্তবাবু নিজে বাহারবন্দ পরিদর্শনে গমন করেন, তখন হেষ্টিংস রঙ্গপুরের কলেক্টার গুডল্যাড সাহেবকে এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠান—আমার দেওয়ান কান্ত আমার অনুমতিক্রমে তাঁহার জমীদারী দেখিতে যাইতেছেন। সেখানকার বিদ্রোহী প্রজা-দিগকে দমন করিবার জন্য কান্তবাবুকে সাহায্য করিবে এবং এখন যখন খাজনা আদায়ের সময়, তখন নাগাদ বৈশাখ প্রজাদিগের কোন অভিযোগ আপত্তি শুনিবে না; তাহাতে কান্তের ক্ষতি হইতে পারে। গুডল্যাড্ সাহেব হেষ্টিংসের আজ্ঞাপালনে ত্রুটি করেন নাই। আজিও

তাঁহার নাম রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রচলিত রহিয়াছে। হেষ্টিংসের আদেশে ও গুডল্যাড সাহেবের যত্নে কান্তবাবু বাহারবন্দ হইতে রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। বাহারবন্দ ব্যতীত হেষ্টিংস কান্তবাবুকে আরও অনেক জমীদারী ও কোন কোন লবণের গোলা ইজারা করিয়া দেন। এই সমস্ত জমীদারীর মধ্যে বিষ্ণুপুর ও পাঁচেটের ইজারার উল্লেখ দেখা যায়। ১৭৭৩ সালের জন্য কান্তবাবু ইজারা লন; কিন্তু উক্ত সময় কোম্পানীর ২,১৯,৮০৬৲ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ে। লবণের গোলার মধ্যে তৎকালে হিজলীর গোলা লাভ-জনক ছিল। এরূপ শুনা যায় যে, কান্তবাবু বেনামীতে সেই কার্য্যের ইজারা লইয়াছিলেন।

প্রকাশ, কান্তবাবুর সহিত হিজলীর লবণের গোলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কমলার কৃপা-কটাক্ষে কান্তবাবু সামান্য অবস্থা হইতে দিন দিন লক্ষপতি হইতে লাগিলেন। যে জমীদারী বা গোলা লইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাই তাঁহার করায়ত্ত হইল। যেরূপে তিনি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিলে কোটীশ্বর হইতে পারিতেন। যদি বাস্তবিকই এই সমস্ত জমীদারী কান্তবাবুর নিজেরই হইত এবং স্বীয় লালসাকে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যে কালে অর্দ্ধবঙ্গের একাধিপত্য তাঁহার করতলগত হইত তাহা কতক পরিমাণে বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কিন্তু এই সমস্ত জমীদারী গ্রহণের মধ্যে কিছু গুপ্ত রহস্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। কাজেই বাধ্য হইয়া পরিণামে তাঁহাকে এ লালসা দিন দিন সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কাউন্সিলের ৩ জন সদস্য হেষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ এ বিষয়ে যথাসাধ্য বাধা প্রদান

করিতে লাগিলেন। যখন হেষ্টিংস সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা পদদলিত করিয়া যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের প্রিয়-পাত্রের উদর-পূরণের নিমিত্ত অনেকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিলেন, তখন সদস্যগণ ডিরেক্টরদিগকে এ বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়া পাঠান। অল্পদিনের মধ্যে হেষ্টিংসের এই সমস্ত অত্যাচার, অবিচার ও কোম্পানীর ক্ষতিজনক কার্য্যের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আন্দোলন চলিতে লাগিল। ডিরেক্টাররা বুঝিতে পারিলেন যে, হেষ্টিংসের যথেচ্ছাচারিতায় বাস্তবিকই কোম্পানীর অতিশয় ক্ষতি হইতেছে। তখন তাঁহারা হেষ্টিংস সাহেবের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলেন। ডিরেক্টরেরা সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা আপনাদের মন্তব্যে একস্থলে প্রকাশ করেন যে, গত রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্তে এমন কোন প্রকার চুরী-ডাকাইতি দেখা যায় না যাহাতে মাননীয় গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর বিরত থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস সাহেবের প্রতি এরূপ তিরস্কার বর্ষণ হওয়ায় তিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রদিগের আর সেরূপ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কাজেই কান্তবাবুর আশা দিগন্ত-প্রসারিণী হইতে পারিল না।

এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, হেষ্টিংস কান্তবাবুর জন্য এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন কেন? তিনি বাস্তবিকই কি কান্তবাবুর প্রত্যুপকারের জন্য এরূপ অবমাননার ডালি মস্তকে লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যুপকারের সহিত স্বার্থ-পরতারও কতক মিশ্রণ ছিল। তাঁহার হৃদয় তত উচ্চ হইলে আজ তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ, কাশীধাম বা অযোধ্যার মানবগণের মানস-চক্ষের সমক্ষে নৃত্য করিয়া বেড়াইত না। আমাদের বিবেচনায়, কান্তবাবুর সহিত যে সমস্ত

জমীদারীর বন্দোবস্ত ছিল, তাহার অধিকাংশই হেষ্টিংস সাহেবের নিজের। কান্তবাবুর জমীদারীর সহিত যে হেষ্টিংস সাহেবের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহা মহামতি বার্ক স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ অনেক সময়ে একই জমীদারী পর পর ৩।৪ জনের বেনামীতে লইতেন। হেষ্টিংস কান্তবাবুর বেনামীতে অনেক জমীদারী লইয়াছিলেন, নতুবা কান্তবাবুর প্রতি তাঁহার এত অনুগ্রহ হইল কেন?

হেষ্টিংসের সহিত কান্তবাবুর মাত্র এক বৎসরের পরিচয়; এ পরিচয়ে এরূপ বন্ধুতা হইতে পারে না যে, তিনি তাঁহাকে এতটা সুবিধা করিয়া দিবেন। পূর্ব্বে কান্তবাবু সাইক্‌স সাহেবের কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি হেষ্টিংস সাহেবের নিকট কান্তবাবুর জন্য অনুরোধ করেন। সুতরাং ইহা হইতে সকলে এ বিষয়ে অনুমান করিতে পারেন। হেষ্টিংস সাহেবের সহিত যে কান্তবাবুর পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না, বার্কের এ কথা সঙ্গত নহে। আমরা পূর্ব্বে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি এবং তিনি এক সময়ে বিলাত হইতে কান্তবাবুর নিকট কিছু টাকা চাহিয়া পাঠান তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। কর্ণেল ম্যানসন এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হেষ্টিংস প্রথমে এ দেশে আসিলে কান্তবাবু তাঁহার অধীন ১৫।২০৲ টাকায় নিযুক্ত হন। হেষ্টিংসের পদোন্নতির সহিত কান্তবাবুরও উন্নতি হইতে থাকে। পরে তিনি সাইকস্ সাহেবের বেনিয়ন নিযুক্ত হন। হেষ্টিংস পুনর্ব্বার গভর্ণর হইয়া আসিলে আবার কান্তবাবুকে নিজ বেনিয়ন নিযুক্ত করেন। ম্যানসনের এই কথা হইতে বার্কের উক্তির খণ্ডন হইতেছে। হেষ্টিংসের সহিত কান্তবাবুর পূর্ব্ব পরিচয় থাকিলেও এই সমস্ত জমীদারীর সহিত তাঁহার যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমস্ত জমীদারী কান্তবাবুর

হইলে কাশিমবাজার রাজবংশের আয় আরও অধিক হইত। কান্তবাবুর ১৩ লক্ষ টাকার জমীদারী পরে ৫ লক্ষে পরিণত হয়। তাহার পর তিনি আরও কিছু বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন। হেষ্টিংস সাহেবের সহিত তাঁহার জমীদারীর সম্বন্ধ থাকায় ডিরেক্টরগণের ভয়ে তাঁহাকে অনেক জমীদারী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং হেষ্টিংস মানে মানে লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। হেষ্টিংস অন্যায় পূর্ব্বক কান্তবাবুকে যে সমস্ত জমীদারী ও কার্য্যাদি প্রদান করেন তাহার আলোচনা করা হইল। হেষ্টিংসের সহিত কান্তবাবুর জমীদারীর বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেও দুই একটী প্রধান জমীদারী যে কান্তবাবুর নিজস্ব ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সকলের মধ্যে বাহারবন্দই প্রধান। হেষ্টিংস লোকনাথের বেনামীতে কান্তবাবুকে বাহারবন্দ প্রদান করিয়া কান্তবাবুর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহবলে বাহারবন্দ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কান্তবাবুকে আর অধিক রাজস্ব দিতে হয় নাই। হেষ্টিংসের আদেশে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তাহাই বহাল থাকে। অদ্যাপি কাশিমবাজার রাজবংশ সে অনুগ্রহ লাভ করিতেছে।

হেষ্টিংসের সহিত কান্তবাবুর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠই ছিল। যেখানে হেষ্টিংস সেইখানেই কান্তবাবু। যে কার্য্যে হেষ্টিংস হস্ত প্রদান করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে কান্তবাবুও তাহাতে অগ্রসর। কি জমীদারী-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, কি কর্ম্মচারী-নিয়োগ সমস্ত কার্য্যেই হেষ্টিংসের সহিত কান্তবাবুকে দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি বার্ক বলিয়াছেন যে, ভারত-সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে হেষ্টিংসের নাম শুনা যায় তৎসঙ্গে তাঁহার বেনিয়ান কান্তবাবুর নামও জড়িত।

কান্তবাবু বারাণসীর অত্যাচার হইতে আপনার স্বার্থসাধন করিলেও

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি এ বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন না। তবে হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার একরূপ সমবায়-সম্বন্ধ ছিল ও তিনি সে সময় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া লভ্যাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উৎকোচ-গ্রহণের নিমিত্ত হেষ্টিংস অনেক লোক নিযুক্ত করেন, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের বিষয় বিদিত ছিল না। চৈৎসিংহ-সংক্রান্ত কোন উৎকোচ কান্তবাবু অবগত ছিলেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সম্ভবতঃ হেষ্টিংসের ফার্সি সেরেস্তাদার মুন্সি তাহা জানিতেন এবং তাঁহারই হিসাব-পুস্তকে সে সমস্ত বিষয় লিখিত থাকার সম্ভাবনা। চৈৎসিংহের উৎকোচ বলিয়া কেন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ কোন উৎকোচের বিষয় কান্তবাবু জানিতেন না। তিনি ফার্সিভাষায় অনভিজ্ঞ হওয়ায় হেষ্টিংস সাহেবের মুন্সি কর্ত্তৃক তৎসমুদয় লিখিত হইত। কান্তবাবু বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালার যাবতীয় হিসাবপত্র বাঙ্গালাতে লিখিয়া রাখিতেন। যদিও তিনি সর্ব্বত্রই ছায়ার ন্যায় হেষ্টিংসের অনুবর্ত্তন করিতেন, কি বাঙ্গালা, কি উত্তর-পশ্চিম কোন স্থানেই তাঁহার গতি অব্যাহত ছিল না, তথাপি বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য স্থানের বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মহামতি বার্ক ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। কান্তবাবু হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। হেষ্টিংসের ভীষণ অত্যাচারের সময় তিনিও বারাণসীতেই উপস্থিত ছিলেন এবং প্রভুর পিশাচ-প্রকৃতির পরিচয় প্রতিনিয়ত অবলোকন করিতেন। তিনি চৈৎসিংহের মিনতিক্রমে একবার স্বীয় প্রভুকে ক্ষমা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। এই অনুরোধের মূলে চৈৎসিংহ-প্রদত্ত কোনও চাকচিক্যশালী পদার্থ ছিল অথবা তিনি হিন্দুর প্রধান তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুরাজার প্রতি অবৈধ অত্যাচার অবলোকন করিয়া স্বীয় প্রভুকে শান্তভাব অবলম্বন করিতে অনুরোধ

করিয়াছিলেন তাহা আমরা সবিশেষ অবগত নহি। রাজা চৈৎসিংহ কান্তবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, হেষ্টিংস সাহেব যাহা আদেশ করিবেন তিনি তৎক্ষণাৎ অবনতমস্তকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

কান্তবাবু চৈৎ সিংহের প্রার্থনা যথাক্রমে হেষ্টিংসকে অনেক প্রকার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাস্তবিকই তিনি অশেষ প্রকার চেষ্টা করেন, কিন্তু হেষ্টিংসের মন কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। চৈৎসিংহের প্রলোভনে হউক অথবা তীর্থক্ষেত্রে হিন্দু রাজার প্রতি অত্যাচারে কষ্ট বোধ করিয়াই হউক, কান্তবাবু যে উদ্দেশেই হেষ্টিংসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি হিন্দুমাত্রেরই প্রশংসার পাত্র। যদি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন তাহা হইলে তীর্থক্ষেত্রে প্রভূত পুণ্যের সঞ্চয় করিয়া চিরদিনই হিন্দুর নিকট আদরণীয় হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার প্রভু তাঁহার সেই অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। হেষ্টিংস যে প্রকারে হউক চৈৎসিংহের নির্য্যাতন করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে রাজার পক্ষীয় সমস্ত লোকেরা নগরে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত করিল; তাহাতে হেষ্টিংস আপনার জীবনকে নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। যদি তাহারা তাঁহার আশ্রয়স্থান আক্রমণ করিত, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার ও তাহার সঙ্গী ৩০ জন ইংরাজের রক্তে তরবারি রঞ্জিত করিতে পারিত। হেষ্টিংস নিজমুখেই উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহারা নায়ক-বিহীন হইয়া ইতস্ততঃ গোলমাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাতে হেষ্টিংস কাশীতে অবস্থান করা নিরাপদ নহে মনে করিয়া রজনীযোগে চুনার দুর্গে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পলায়ন উপলক্ষ করিয়া চৈৎসিংহের লোকেরা এইরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিল—

হাতি পর হাওদা ঘোড়া পর জিন
জলদি যাও জল্‌দি যাও ওয়ারেণ হেষ্টিং

কান্তবাবু প্রভৃতিও হেষ্টিংসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে হেষ্টিংস চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরণ করিলে, দলে দলে ইংরাজ সৈন্য আসিতে আরম্ভ করে। তাহারা রামনগর প্রভৃতি স্থান আক্রমণের পর চৈৎসিংহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শোণ নদ হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বিজয়গড় নামক দুর্গে উপস্থিত হইল। এই দুর্গে চৈৎসিংহের মাতা, স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারবর্গ বাস করিতেছিলেন। চৈৎসিংহ তথায় উপস্থিত হইয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন; কিন্তু মেজর পপহামের নেতৃত্বে একদল ইংরাজ সৈন্য বিজয়গড় আক্রমণ করিতে গমন করায় চৈৎসিংহ আপনার যাবতীয় ধনসম্পত্তি সহ বিজয়গড় হইতে বুন্দেলখণ্ডে পলায়ন করেন। তাহার মাতা, স্ত্রী ও পরিবারবর্গ অরক্ষিতভাবে উক্ত দুর্গে অবস্থিতি করিতে থাকেন। মেজর পপহাম বিজয়গড়ে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, চৈৎসিংহ পলায়ন করিয়াছেন। কেবল তাঁহার পরিবারবর্গ তথায় অবস্থিতি করিতেছে। মেজর পপহাম এই কথা হেষ্টিংসকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি আদেশ করিলেন যে, অবিলম্বে স্ত্রীলোকদিগকে দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি তাহারা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আক্রমণ করা যাইবে। পপহাম পুনর্ব্বার লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা গোপনে দ্রব্যাদি লইয়া গেলে তাহাদের কার্য্যোদ্ধারের কোনই উপায় নাই। তাহাতে সুসভ্য ইংরাজ জাতির সুসভ্য গবর্ণর লিখিয়া পাঠাইলেন, রাজমাতা হয়ত রমণীদিগকে বাহির করিবার জন্য বিজয়গড় হইতে অনেক ধন-সম্পত্তি মণি-মুক্তা লইয়া পলায়ন করিবেন,

তাঁহাদিগকে বিনা পরীক্ষায় যাইতে দেওয়া সঙ্গত নহে। এই সময়ে হেষ্টিংস কান্তবাবুকেও বিজয়গড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজমাতা কান্তবাবুকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া এবং তাঁহাকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান করিয়া এই অনুরোধ করেন যে, যদি তাঁহার ও তাঁহার সহচরীদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বা অবমাননা না করা হয়, তাহা হইলে তিনি বিজয়গড় দুর্গ ও যাবতীয় ধনসম্পত্তি ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। হেষ্টিংস রাজমাতার এই কথা নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। হেষ্টিংস কান্তবাবুর নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া বলিয়া পাঠান যে, রাজমাতা যদি ২৪ ঘণ্টায় আপনাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যতীত মূল্যবান দ্রব্য সমস্ত সমর্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রার্থনা বিবেচনা করা যাইতে পারে। সময়াভাবেই হউক অথবা যে কারণেই হউক রাজমাতা গবর্ণর-জেনারেলের আদেশ পালন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই পরিণামে তাঁহাকে অত্যাচার ও অবমাননা ভোগ করিতে হয়। সৈন্যগণ সেনাপতির নিষেধ সত্ত্বেও রাজমাতা ও তাঁহার সহচরিবর্গকে আক্রমণ করিয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিল। তাহারা তাঁহাদিগের অঙ্গস্পর্শ করিয়া আপনাদিগের লুণ্ঠনযোগ্য মণিমুক্তা অনুসন্ধান করিল। রাজমাতা রাজরাণী আজ সহায়হীনা। সৈন্যদের অত্যাচারে অচেতনার ন্যায় হইলেন; নিকটে কেহ নাই যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন। কান্তবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পপহাম সাহেবের অনেক চেষ্টায় পরিশেষে তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সৈন্যদিগের অত্যাচারকাহিনী পপহাম সাহেব নিজে হেষ্টিংসকে লিখিয়া পাঠান এবং কেবলই গবর্ণরের কঠোরতার জন্য এই লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

হেষ্টিংস চৈৎসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভাগিনেয়কে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন। এই সময়ে সকলে আপন আপন উদর পূরণ করিয়াছিলেন। কেবল সৈন্যগণ যে লুণ্ঠন করিয়া আপনাদের ক্ষোভ মিটাইয়াছিল এমন নহে, হেষ্টিংস ও তাঁহার অনুচরগণও তাঁহাদের পেটিকা পূর্ণ করিয়াছিলেন। রাজমাতার অলঙ্কার ব্যতীত কান্তবাবু লুণ্ঠনেরও অংশ পাইয়াছিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সঙ্গে কান্তবাবু রাজভবন হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, রামচন্দ্রী মোহর, একমুখ রুদ্রাক্ষ ও দক্ষিণাবৃত শঙ্খ লুণ্ঠনের অংশস্বরূপ আনয়ন করেন; সে সমস্ত অদ্যাপি কাশিমবাজার রাজবাটীতে অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাদিগের রক্ষক হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই লুণ্ঠনের সময় কান্তবাবু আর একটী দ্রব্য আনয়ন করেন। সেইটী একটী পাথরের দালান; চৈৎসিংহের বাটী হইতে উত্তোলন করিয়া দালানটী কাশিমবাজারে তাঁহার স্ববাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করা হয়। তাহা আজিও অক্ষত অবস্থায় কান্তবাবু ও চৈৎসিংহ উভয়ের নামই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অনেক দ্রব্য লুণ্ঠনের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু দালান লুণ্ঠনের কথা আমরা জানিতাম না। এই সমস্ত ব্যতীত কান্তবাবুর আরও একটী লাভ হয়। চিরকালই কান্তবাবুর জমিদারী-লাভের পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সে পিপাসা প্রবল হওয়ায় প্রভু হেষ্টিংস তাহাও মিটাইয়াছিলেন। তিনি বারাণসী রাজ্য হইতে স্বীয় প্রিয়-পাত্রকে বালিয়া নামক একটী জমীদারী জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। বালিয়া এখন গাজীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত; অদ্যাপি তাহা কাশিমবাজার রাজবংশের হস্তগত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বারাণসী-সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলেও কান্তবাবুর লভ্যাংশ বড় কম

হয় নাই। কান্তবাবু হেষ্টিংসের সহিত যেখানে যে কোনও ব্যাপারে গমন করিতেন সেই স্থান হইতে নিজের সুবিধা করিয়া লইতে পারিতেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে মনুষ্যের সুবিধা ও সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়।

নিজের বেনিয়ানী ব্যতীত হেষ্টিংস সাহেব কান্তবাবুকে আর একটী সরকারী কার্য্য প্রদান করেন। তাহা অবৈতনিক কি না জানা যায় না। সম্ভবতঃ বেতন থাকিতে পারে। কোম্পানীর বিচারালয়-সমূহে জাতিঘটিত কোন গোকর্দ্দমা উঠিলে কান্তবাবুর উপর অনেক সময় তাহার বিচার-ভার অর্পিত হইত। কিন্তু সেই সকল বিচারালয়ে উচ্চ শ্রেণীর কোনও জাতির বিচার হইত না বোধ হয়। মহারাজা নন্দকুমার জাল করা অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে কারাবাসে ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যাহ্নিক করা চলে কি না এবং না করিলে কিরূপ প্রত্যবায় ঘটে তাহা কান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার কথা উঠিলে হেষ্টিংস সাহেব বলিয়াছিলেন, কান্তবাবু উচ্চশ্রেণীর কয়েদী-দিগের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন না, কারণ তাঁহার হিন্দুশাস্ত্র অধিগত নাই। আমরা দেখিতে পাই মহারাজা নন্দকুমারকে বিপন্ন করিবার নিমিত্ত কান্তবাবু বিশেষ উৎসুক ছিলেন।

দেশের যাবতীয় লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে হইবে বলিয়া তিনি কোম্পানীর দেওয়ানী লইতে সম্মত হয়েন নাই। তাঁহার অপারগতা তাহার প্রধান কারণ থাকিলেও উপরিউক্ত কারণটী তাহার অন্যতম। উক্ত দেওয়ানী গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি অর্পিত হইলে তিনি বঙ্গদেশে পরে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। অর্থলালসা প্রবল থাকায় কান্তবাবুকে অনেক সময় অনেকগুলি অসৎ কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। অর্থলালসার সহিত স্বীয় প্রভু হেষ্টিংসের মনোরঞ্জন অন্যতম উদ্দেশ্য

ছিল। যদিও অর্থলালসার জন্য কান্তবাবু সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়াছেন, তথাপি যে সময়ে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের কথা ভাবিতে গেলে তাঁহাদিগের দোষের মাত্রা অত্যধিক মনে না করাই যুক্তিসঙ্গত। যে সময়ে উৎকোচ গ্রহণ প্রতারণা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিশেষ দোষের মধ্যে গণ্য ছিল না, সে সময়ের লোকেরা উক্ত কোনও অপরাধ করিলে সেই সময়ের কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করাই উচিত। তবে দোষ চিরকালই নিন্দার যোগ্য, তৎসম্বন্ধে সময়াসময় বিবেচনা করা যাইতে পারে না, কাজেই সত্যের অনুরোধে কান্তবাবুর সম্বন্ধে আমাদিগকে দুই এক কথা বলিতে হইয়াছে। হেষ্টিংস কান্তবাবুর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কান্তবাবু নিজে তাহা গ্রহণ করিয়া, স্বীয় পুত্র লোকনাথকে প্রদান করিতে অনুরোধ করায়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লোকনাথকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের প্রথমে হেষ্টিংস সাহেব ইংলণ্ডে গমন করিলে কান্তবাবু কাশিমবাজারে আসিয়া বাস করেন। তিনি কলিকাতায় থাকিতে ভালবাসিতেন না। হেষ্টিংস সাহেবের সময়ই তিনি মধ্যে মধ্যে কাশিমবাজারে আসিতেন। কলিকাতায় তাহার বাস-ভবন থাকিলেও কাশিমবাজার হইতে তাঁহার ভাগ্যের সূচনা হওয়ায় তিনি কাশিমবাজারকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভারত পরিত্যাগ করার পর হেষ্টিংস সাহেব অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। নিজে রাজোপাধি গ্রহণ না করায় সাধারণ লোকে হেষ্টিংসের দেওয়ান বলিয়া তাঁহাকে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নামে অভিহিত করিত। দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নামে আর একজন কৃতী পুরুষও মুর্শিদাবাদে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন। ইনি বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার সেনবংশীয়গণের আদিপুরুষ। কলিকাতার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ

তাঁহার বাসভবন অদ্যাপি 'দেওয়ানবাটী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেন কৃষ্ণকান্ত কোম্পানীর নিমক মহলের দেওয়ান ছিলেন। উভয়ে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নামে অভিহিত হওয়ায়, তাঁহাদের প্রসঙ্গ লইয়া পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় প্রাচীনেরা অনেক সময় গোলযোগ করিতেন। কান্তবাবু অনেকবার দার পরিগ্রহ করেন, শেষবারে লোকনাথের জন্ম হয়। লোকনাথের মাতার নাম ক্ষুদ্রমণি। বর্দ্ধমান জেলারও কুরুম্ব নামক গ্রাম লোকনাথের মাতুলালয়। কাশিমবাজার-রাজবংশের আদিপুরুষ ও হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র কান্তবাবু আপনার একমাত্র পুত্র লোকনাথকে রাখিয়া বাঙ্গালা ১২০০ সালে পৌষমাসে জাহ্নবীতীরে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

তাঁহার অর্জ্জিত বিশাল সম্পত্তি আজিও তাঁহার পরিচয় দিতেছে। কান্তনগর নামে একটী পরগণা তাঁহার নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। বহরমপুরের পূর্ব্বভাগে ঐ নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামও রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, অর্থলোভে কান্তবাবু কোনও কোনও অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহার হৃদয় হইতে একবারে হিন্দু-জনোচিত ধর্ম্মভাবের লোপ হয় নাই। তিনি অনেক স্থলে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আমরা দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি। কান্তবাবু যখন কাশিমবাজার ইংরাজ-কুঠীতে মুহুরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় হইতে এক ঘর কলু তাঁহার বাটীর নিকট বাস করিত। কান্তবাবুকে প্রতিদিনই তাহার মুখদর্শন করিয়া কার্য্যস্থলে যাইতে হইত। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদানুসারে তাঁহার কার্য্যের কোনরূপ ক্ষতি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হয়। যৎকালে তিনি বিশাল সম্পত্তির অধিপতি হইয়া

কাশিমবাজারে স্বীয় বাস-ভবন নূতনরূপে নির্ম্মাণ করাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সম্মান ও গৌরব লাভ করিতেছিলেন, তৎকালে উক্ত কলু তাঁহার বাটীর নিকটেই বাস করিবার অধিকার পায়। কান্তবাবু তাহাকে নির্ভয়ে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন। একদিন তাঁহার কোন আত্মীয় কান্তবাবুকে বলেন যে, আপনার প্রাসাদের নিকট একজন ইতর-জাতিভুক্ত লোক বাস করিবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব যাহাতে উক্ত কলু স্থানান্তরিত হয় তজ্জন্য আপনার যত্ন করা কর্ত্তব্য। কান্তবাবু উত্তর করিলেন যে, তিনি প্রতিদিন উহার মুখ দেখিয়া কার্য্যস্থলে গমন করিতেন, তাহাতে তাঁহার উন্নতি ব্যতীত কদাচ অবনতি ঘটে নাই। এখন তাঁহার উন্নতির এক প্রকার চরম সীমা হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যদি এক্ষণে ঐ দরিদ্রকে বাসস্থান হইতে বিদূরিত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে, তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন উহাকে রক্ষা করিবেন। কান্তবাবু উক্ত কলুকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতেন। এইরূপ অনেক গল্প তাঁহার জীবনের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

কান্তবাবু একবার তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন। ক্রমে ক্রমে জগন্নাথক্ষেত্র পুরীধামে উপস্থিত হইয়া অন্নসত্র খুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটী বিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। পাণ্ডারা প্রথমে বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনী আসিতেছে জানিয়া কান্তবাবুকে দোহন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি অন্নসত্র খুলিবার প্রস্তাব করিলে তাহারা কোনওরূপে অবগত হইল যে, কান্তবাবু জাতিতে তেলী; তৈলজীবীর নিকট হইতে পাণ্ডারা দানগ্রহণে স্বীকৃত হইল না। কান্তবাবু অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন, তিনি বাস্তবিক তৈলজীবী নহেন। অথচ পাণ্ডা-গণের এ ভ্রম দূর করা সহজ নহে। তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া যদি কেহ

দান গ্রহণ না করে অথচ নিজ সঙ্কল্প সংসাধিত না হয়, তাহা হইলে যে হিন্দু-হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি স্বীয় জাতিত্বের প্রমাণের জন্য নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবস্থা আনয়নের বন্দোবস্ত করিলেন। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন যে, তাঁহারা বাস্তবিক তৈলজীবী নহেন তিলজীবী অর্থাৎ তেলী নহেন তিলি; তিলিগণ নবশাখ শূদ্রের অন্যতম, তাহারা সৎশূদ্র, তাহাদের দানগ্রহণে সেরূপ প্রত্যবায় নাই। তখন তাহারা স্বীকৃত হইয়া কান্তবাবুর দানগ্রহণ করে এবং তাঁহার অন্নসত্রেরও সুবন্দোবস্ত করিয়া দেয়। তীর্থস্থানে অপদস্থ হওয়ায় কান্তবাবু যে বিচলিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সমস্ত গল্প ও প্রবাদ বিচার করিলে কান্তবাবুর যে কিছু কিছু ধর্ম্মভীরুতা ছিল তাহাও বেশ বুঝা যায়। কিন্তু অর্থলালসার জন্য তিনি যে সমস্ত অসৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার জীবনে কলঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে, সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের হত্যা-ব্যাপারে তাঁহার লিপ্ত থাকার কথা এবং রাণী ভবানীর নিকট হইতে বাহারবন্দ গ্রহণের কথা যখন মনে হয় তখন তাঁহার অহিন্দুচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া বাঙ্গালীজাতির প্রতি ঘৃণার উদয় হইয়া থাকে। যাহা হউক কান্তবাবু একেবারে ধর্ম্মহীন ছিলেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কান্তবাবুর মৃত্যুর পর রাজা লোকনাথ অতীব দক্ষতা সহকারে পিতৃগণের ও নিজকীর্ত্তি বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিষয়-লাভের অব্যবহিত পরেই কালব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তিনি স্বীয় জীবনকে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়াছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন উহার আক্রমণে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গালা ১২১১ সালে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। রাজা লোকনাথের মৃত্যুর পর

তাঁহার এক বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র কুমার হরিনাথ কাশিমবাজার রাজ-সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত শিশু ছিলেন বলিয়া সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হয়। হরিনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া অনেক সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য তিনি ১৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত প্রজাপালক ছিলেন। স্বীয় জমীদারীর মধ্যে প্রজাদিগের জলকষ্ট হইলে তিনি পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নিবারণ এবং অনেক প্রকার উপায়ে তাহাদের উপকার করিতেন। কাশিমবাজার রাজবংশের ন্যায় প্রজাপালক জমীদার অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। হরিনাথ পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ও মল্লদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি কবি-ওয়ালাদিগকে অতিশয় আদর করিতেন। তাঁহার সময়ে হরিঠাকুর, নীলুঠাকুর, ভোলা ময়রা, রাম বসু, চিন্তা ময়রা, আণ্টুনী সাহেব,—ইহারা কয় জন প্রধান কবিওয়ালা ছিলেন। রাজা হরিনাথ কবির এত আদর করিতেন যে, নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্য স্থানের কবির গান শুনিতে যাইতেন। তাঁহার সময়ে কাশিমবাজারের বিখ্যাত নৈয়ায়িক কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন বঙ্গদেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। লর্ড আমহার্ষ্ট কুমার হরিনাথ বাহাদুরকে রাজোপাধি প্রদান করেন। ১২৩৯ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ হরিনাথ একমাত্র পুত্র কৃষ্ণনাথ, বিধবা রাজ্ঞী হরসুন্দরী ও কন্যা গোবিন্দসুন্দরীকে রাখিয়া পরলোকগত হন।

কৃষ্ণনাথ বাল্যকালে ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ইংরাজি শিখিয়া বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ যে দোষ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনাথেরও তাহাই হয়। যৌবনারম্ভে তিনি ইংরাজি সভ্যতা অনুযায়ী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠেন, কিন্তু তিনি পিতার সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়

অত্যন্ত উচ্চ ছিল, তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত লোক তৎকালে দৃষ্ট হইত না, তিনি শিক্ষাকার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহদাতা ছিলেন। হেয়ার সাহেবের স্মরণ-চিহ্ন-স্থাপন-সভায় তিনি সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করেন। তাঁহার প্রিয় উদ্যানবাটীতে একটী বিশ্ববিদ্যালয় করিবার জন্য প্রায় সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া যান। বিদ্যাশিক্ষার জন্য এরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত কয়টী দেখিতে পাওয়া যায়? কৃষ্ণনাথ লর্ড অকল্যাণ্ড কর্ত্তৃক রাজো-পাধিতে ভূষিত হন। একটী মোকর্দ্দমায় বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার কথায় কৃষ্ণনাথ সম্মান-হানির আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ৩০শে অক্টোবর এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত ও উচ্চ-হৃদয় পুরুষ এতদ্দেশে বিরল।

রাজা কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া কাশিমবাজার রাজ-সম্পত্তির অধিকারিণী হন। মহারাণী মহোদয়ার নূতন পরিচয় দেওয়া বাতুলের কার্য্য। যাঁহার নাম বঙ্গের প্রত্যেক দরিদ্রের গৃহ হইতে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, যাঁহার দানস্রোত বিশাল ভারতভূমি অতিক্রম করিয়া সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, তাঁহার আবার নূতন পরিচয় কি? যিনি মূর্ত্তিমতী দয়া, পরোপকার যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, তাঁহার নাম কোন্ বাঙ্গালী অবগত নহে? তিনিই বঙ্গদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণসেবা ও দরিদ্র-পালনের ভার লইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শত শত ব্রাহ্মণ, শত শত দরিদ্র তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। স্বর্ণময়ীর নাম চিরদিনই বাঙ্গালার ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। মহারাণী মহোদয়ার সুকীর্ত্তির বিবরণ লিখিতে হইলে এক অতি বৃহদায়তন পুস্তক হইয়া উঠে। সুতরাং সে বিষয়ে অধিক লেখা সম্ভব নহে।

চিরদিন হইতে মহারাণী মহোদয়ার সুনাম বিঘোষিত হইতেছে; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, এক্ষণে তাঁহার সুনামের চতুর্দ্দিকে একটু একটু করিয়া যেন কালিমা পড়িতেছে। স্বজন-বর্জ্জন, প্রজাপীড়ন দান-সঙ্কোচের কলঙ্কচ্ছায়া যেন ধীরে ধীরে তাঁহার যশোভাতির নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের বিশ্বাস মহারাণী মহোদয়ার অজ্ঞাতসারে ইহাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। নতুবা যিনি মূর্ত্তিমতী দয়া, তাঁহার যশঃকিরণের নিকট কখনও কি কলঙ্কচ্ছায়া অগ্রসর হইতে পারে? মুক্তহস্ততার জন্য তিনি মহারাণী ও, সি, আই উপাধি লাভ করেন এবং দুর্ভিক্ষের সময় অর্থসাহায্য করায় তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হইবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করেন। রাজা কৃষ্ণকান্তের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাণী মহোদয়ার একমাত্র উত্তরাধিকারী।

অনারেবল

মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কে, সি, আই, ই।

১২৬৭ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দশহরা দিবসে অপরাহ্ণ ৫।১৪ মিনিটের সময়ে কলিকাতা বাগবাজারে মণীন্দ্রচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদির সংস্থিতি দ্বারা রাজযোগ পূর্ণভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও কেতু কেন্দ্রী এবং বৃহস্পতি ও মঙ্গল তুঙ্গী। পিতা নবীনচন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতার সেই বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। দুই পুত্র ও ছয়

কন্যার পর আর একটী পুত্র প্রসূত হওয়াতে তাঁহার সংসারে আনন্দের মহারোল পড়িয়া গেল; মাতা গোবিন্দসুন্দরীও প্রভূত চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন। নবীনচন্দ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইলেও কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ নন্দী বাহাদুরের জামাতা; সুতরাং পুত্রকন্যাদিগের ভরণ-পোষণে তাঁহার কোনই কষ্ট হয় নাই। তাঁহার জন্মস্থল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট মাথরুন গ্রাম হইলেও রাজ-জামাতা নবীনচন্দ্র রাজধানীতে রাজপ্রদত্ত বাটীতে সপরিবারে বাস করিতেন এবং সময়ে সময়ে পল্লীগ্রামের শান্তমাধুর্য্যে সহরের একঘেয়ে বিরস বিভ্রমের অপনোদনে সচেষ্ট হইতেন।

পঞ্চমবর্ষে প্রবিষ্ট হইলে মণীন্দ্রচন্দ্রের যথাবিধি বিদ্যারম্ভ হয়। বাটীতেই একটী গুরুমহাশয় ছিলেন; বালক তাঁহারই কাছে তালপাতায় বর্ণমালার বিবিধ বিন্যাস এবং শতকিয়া ও গণ্ডাকিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা ও বোধোদয় প্রভৃতি শেষ করিয়া ৯॥০ বৎসর বয়সে শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন এবং ৬ মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বিশেষ মনোযোগসহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেধা, একাগ্রতা ও অভিনিবেশ দেখিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনেক সময় চমৎকৃত হইতেন।

যথাকালে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নির্ব্বাচন-পরীক্ষা শেষ হইলে তাহার ফলদর্শনে প্রধান শিক্ষকের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, মণীন্দ্রচন্দ্র সগৌরবে উত্তীর্ণ হইবেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইবেন, তদীয় পিতা ও শিক্ষক মনে মনে এইরূপ আশা পোষণ করিয়া রহিলেন,

কিন্তু বিধাতা অলক্ষ্যে বসিয়া তাঁহাদের আশা সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রবল জ্বর হইল, তিনি শয্যাগত হইলেন। রোগশয্যায় পড়িয়া তিনি পরীক্ষার দিন গণিতে এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা—পরীক্ষা দিতেই হইবে। কিসে জ্বরের নিবৃত্তি হয়? ডাক্তার আসিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় কুইনাইন দিলেন; দুই দিনে ১২০ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করা হইল। তরুণ জ্বরে বৃহৎ মাত্রায় তিক্তরস সেবনে শরীরের তন্তু, বল ও স্নায়ু বিকৃত হইয়া পড়িল। স্নায়ুমণ্ডল উগ্র হইল, জ্বর বন্ধ হইল, কিন্তু নির্ম্মূল হইল না।

জ্বরান্ত দৌর্ব্বল্যে ও অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবনের ফলে মণীন্দ্রচন্দ্রের শরীর অতিশয় বিকল হইয়া পড়িল, তথাপি পরীক্ষা দিতেই হইবে, সুতরাং তদবস্থাতেই পরীক্ষাগারে উপস্থিত হইলেন। মাথার ভিতর তখন দারুণ উত্তাপ অনুভূত হইতেছিল; সেই জন্য ক্রমাগত কেবল জলসেচন পূর্ব্বক লিখিতে লাগিলেন। শিরঃপীড়া প্রবল হইয়া উঠিল, সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারিলেন না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেন। কবিরাজী চিকিৎসায় শরীরে একটু বলাধান হইলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র নবমশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন; "ডবল প্রমোশন" পাইয়া সপ্তম শ্রেণীতে এবং সপ্তম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। কর্তৃপক্ষের মনে আবার প্রবল আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক গলাধঃকরণ পূর্ব্বক গৌরবলাভের জন্য মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় নাই। ভাগ্যদেবতা যে গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে আরোপ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন, প্রবল সহজজ্ঞান ও লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা যাহার দুইটী প্রধান

উপায়, মণীন্দ্রচন্দ্র সহসা সেই পথে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আশানৈরাশ্যের প্রহেলিকায় তাঁহার জীবন গঠিত হইতে লাগিল। আবার সেই দারুণ শিরঃপীড়া দেখা দিল। কবিরাজী চিকিৎসায় কিছুমাত্র সুফল ফলিল না। কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন কলিকাতার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার চার্ল্‌স্‌ আসিয়া তাঁহার চিকিৎসাভার গ্রহণ করিলেন এবং অধ্যয়ন একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। একাদিক্রমে দুই বৎসর মণীন্দ্রচন্দ্র পুস্তক হাতে করিতে পাইলেন না। সিবিল সার্জ্জন তাঁহাকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মের জীবন কতক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিতে পারে? সেই সময় বাঙ্গালা ভাষায় যত নাটক, নভেল, গল্প, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, মণীন্দ্রচন্দ্র সমস্তই পড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে দুইজন এম-এ, বি-এলের নিকট ইংরাজি ও সংস্কৃতপাঠ্য পুস্তকগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর মধ্যেই তদানীন্তন প্রবেশিকা ও এফ্‌-এ পরীক্ষার উপযোগী সমস্ত পুস্তক রীতিমত অধ্যয়ন করিলেন। তদ্ব্যতীত অধিকাংশ ইংরাজী নভেল ও নাটক, বার্কের সমগ্র পুস্তক, গিবনের রোম, স্মোলেটের ইংলণ্ড এবং টেনিসন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ যথাবিধি পড়িয়া লইলেন। এইরূপ রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিতে করিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের দিকে তাঁহার চিত্ত ধাবিত হইল। সেই শাস্ত্রসম্পর্কে সেই সময় যত পুস্তক বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছিল তৎসমুদায়ই তদানীন্তন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ শ্যামপুকুর-নিবাসী ঠাকুরদাস চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। এখনও তাহাতে বিরতি নাই। জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন নূতন গ্রন্থ পাইলেই মণীন্দ্রচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে তাহা পাঠ করেন।

১৩০৪ সালের ভাদ্র মাসে মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বর্গগমনে উত্তরাধিকার-স্বত্বে মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন। মধ্য-বিত্ত গৃহস্থের অবস্থা হইতে একেবারে বিপুল সম্পত্তির অধিকার-লাভ পৃথিবীতে বিরল নহে, কিন্তু চিত্তের সাম্য ও চরিত্ররক্ষা নিতান্ত বিরল। বাবু মণীন্দ্রচন্দ্র এক মুহূর্ত্তে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র হইলেন; কিন্তু কিছুমাত্র বিকার নাই, আড়ম্বর নাই, দম্ভ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য নাই, যেন ঠিক সেই বৃত্তিভোগী মধ্যবিত্ত গৃহস্থই আছেন।

তিনি দানে মুক্তহস্ত, পরোপকারে সদাই সমুদ্যত। এত সরল ও নিরীহ যে, একটী শিশুও নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে। সম্পদে অপ্রমত্ত, ঐশ্বর্য্যে অনাসক্ত, বিলাস ও ব্যসনে বিরক্ত, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মত চরিত্রবান পুরুষ দুর্ল্লভ। জাতীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের অকপট বন্ধু; দেশীয় কোনও সদনুষ্ঠানই তাঁহার সম্বন্ধবিহীন নহে।

মহারাজার সম্বর্দ্ধনা।

১৩০৪ সালের ভাদ্র মাসে মহারাণী স্বর্ণময়ী সি-আই মহোদয়ার মৃত্যুর পর যখন কাশিমবাজার এষ্টেটের উত্তরাধিকার লাভ করিয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বেনারস হইতে বহরমপুরে আসেন, তখন তাঁহার সসম্মান অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত মুর্শিদাবাদ জেলার এত অধিক জনসঙ্ঘ বহরমপুরে সমবেত হইয়াছিল, যে জীবিত স্মৃতির মধ্যে কেহ এরূপ বহুল জনস্রোত বহরমপুরে কখনও দেখেন নাই। মণীন্দ্রচন্দ্রও সকলকে তাঁহার স্বাভাবিক নম্র-মধুর আপ্যায়নে প্রীত করিয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরে পদার্পণ করিয়াই প্রথমে তথাকার অন্যতম জমীদার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের বাগান-বাড়ীতে উঠেন। তথা হইতে শোভাযাত্রা করিয়া রাস্তার দুই ধারে পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে

বিপুল মহানন্দের মধ্যে শুভ দিনে তিনি কাশিমবাজার রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁহার জীবনের যাহা ব্রত ও লক্ষ্য ছিল, যাহা এতদিন পূর্ণ বিকাশ পাইতে পায় নাই, আজ অর্থ, ঐশ্বর্য্য ও জনবল পাইয়া তাঁহার সেই ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে জনহিতকর কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

শিক্ষা-বিস্তার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র বাঙ্গালা দেশে নূতন যুগ আনিয়াছেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছেন যে, দেশের দারিদ্র্য, মূর্খতা ও অজ্ঞানতা দূর করিবার মুখ্য উপায় কেবলমাত্র শিক্ষার বিস্তার। দেশের এই উন্নতিকল্পে তিনি রাজ-সিংহাসনে বসিয়াই তাঁহার পৈতৃক ভূমি মাথরুণ গ্রামে বহুব্যয়ে একটী ইংরাজী হাইস্কুল স্থাপনা করেন ও স্কুলের মাহিনা যথাসম্ভব কম করেন, উদ্দেশ্য তাঁহার দরিদ্র প্রজাগণ ও স্বগ্রামবাসীরা স্বল্প ব্যয়ে নিজের সন্তানদিগকে নিজগ্রামে বিদ্যা-শিক্ষা দিতে পারেন।

তৎপর সীতারামপুরের নিকট এখোড়ায় আর একটী হাই স্কুল স্থাপনা করেন। তার পর ক্রমে শক্তিপুর, বেলডাঙ্গা ও হাবাসপুর, কলিকাতা পলিটেকনিক, সয়দাবাদ হার্ডিঞ্জ, বনগাঁ ইত্যাদি হাই স্কুল স্থাপনা করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল-সাধনে যত্নবান হইয়াছেন।

এই স্কুলগুলির সমগ্র ব্যয়ভার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বহন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত মধ্য ইংরেজী স্কুল যে কত স্থাপনা করিয়াছেন তাহার সংখ্যাও অল্প নহে এবং স্কুলের ছাত্রদের জন্য বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থাও প্রত্যেক স্কুলে করিয়াছেন। প্রতি স্কুলে গুণানুসারে বিনাবেতনে অর্দ্ধবেতনে ছাত্রদিগের অধ্যয়নের ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

স্থানে স্থানে তিনি বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহিলা-শিল্পের জন্য মাসিক সাহায্য দান ইত্যাদি করিয়া থাকেন।

কলিকাতা মহাকালী পাঠশালা, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন, বহরমপুর মহাকালী পাঠশালা, কলিকাতা মহিলাশিল্পসমিতি, ডোনোভান ফরিদপুর বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি তাঁহার নিঃস্বার্থ দানের কয়েকটী উদাহরণ।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ বাঙ্গালা দেশের গৌরব। এ গৌরবের জন্য বাঙ্গালা দেশ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট অশেষ ঋণী। তিনি অকাতরে অকুণ্ঠায় সমগ্র কলেজটীর ব্যয়ভার একা বহন করিয়া আসিতেছেন।

বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরী ইত্যাদি সবই আধুনিক। প্রেসিডেন্সী কলেজের পরেই বোধ হয় এই কৃষ্ণনাথ কলেজ। এই কলেজের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এত সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে, বাঙ্গালা দেশের খুব অল্প কলেজেই সেরূপ আছে।

কলিকাতায় আচার্য্য বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরে (Dr. Bose Institute) তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রচারের জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে ২০ হাজার, ল কলেজে ৫০ হাজার, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিতে ১ লক্ষ १০ হাজার ও বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে ১৫ হাজার ইত্যাদি রাজোচিত দান করিয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র দেশের কি উপকার করিতেছেন তাহার সীমা নাই।

আবার মণীন্দ্রচন্দ্র যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী তাহা নহেন, সংস্কৃত ভাষার ও পুরাকালের ধর্ম্মশাস্ত্রে যথাবর্ণিত শুদ্ধাচারী ব্রহ্মচর্য্যরত হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া হিন্দুশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া অথচ তাহার মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা সংযোগ করিয়া, মণীন্দ্রচন্দ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার এক অভিনব মহামিলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাঁচিতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য

বিদ্যালয়ই ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ৺পুরীধামে ও কাশীতে তিনি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া, দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। প্রায় ২৫০ জন দরিদ্র অথচ উপযুক্ত ছাত্রের বোর্ডিং খরচ ও পরীক্ষার ফিস্ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রতি বৎসর সাহায্য করেন। মোট কথা, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান তাঁহার জীবনের মহাব্রত। সে ব্রত উদ্‌যাপন জন্য তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাহায্য করেন।

মণীন্দ্রচন্দ্রের দয়া যে শুধু বিদ্যাদানেই আবদ্ধ আছে তাহা নহে; ভীতকে অভয়দান, রোগীকে ঔষধদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান—সবই তিনি যথাসাধ্য করিয়া থাকেন। কত ধনিসন্তান অবস্থাহীন হইয়া তাঁহার সাহায্যে জীবনধারণ করিয়া ঋণের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যে সকল বুনিয়াদি ঘর ঋণজালে জড়িত হইয়া অকূল পাথারে ভাসিতেছিলেন, মণীন্দ্রচন্দ্রের কৃপায় তাঁহারা আজও তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ফলতঃ কতিপয় বিশিষ্ট জমিদারের অস্তিত্ব যে আজিও আছে তাহার একমাত্র কারণ মহারাজা মণীন্দ্রের ট্রাষ্টী হওয়া। বহরমপুরের খ্যাতনামা জমিদারবংশ শ্রীবনবিহারী সেন, শ্রীবিষ্ণুচরণ সেন, মালদহের মদনগোপাল এষ্টেট, কলিকাতা পশুপতিবাবুর ত্যক্ত এষ্টেট—ইত্যাদি মহারাজার দয়া ও পরামর্শে উপকৃত ও অনুগৃহীত হইতেছে।

স্বর্গীয় মহারাণী স্বর্ণময়ী বহরমপুরে জলের কল স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। মহারাজা বাহাদুর মুক্তহস্তে ঐ জলের কলের জন্য আরও ২,৪০,০০০৲ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। পূর্ব্বে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে বৎসর বৎসর কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী বহরমপুর গোরাবাজার, সয়দাবাদ ইত্যাদি স্থানে অত্যন্ত

শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অভাব দূর করিবার জন্য জলের কলের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। মণীন্দ্রচন্দ্র সহরের সেই মহা অভাব দূর করিয়া, সাধারণের ও গভর্ণমেন্টের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন ও প্রশংসার্হ হইয়াছেন। ১৩০৫ সালে ভাদ্রমাসে স্বর্গীয়া মহারাণীর দানসাগর শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাপন হয়। অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রায় ৫০ হাজার কাঙ্গালী বিদায় ও ভোজন হয়।

১৩০৫ সালের ১৫ই মাঘ, তাঁহার প্রথম সামাজিক ব্যাপার হয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে। বরাবরই তাঁহার নিজ সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলি একত্র করিয়া একটী বৃহৎ সমাজে পরিণত করিবার ইচ্ছা। তিনি জাতির একতা ও সমাজবন্ধন বৃদ্ধি করিতে তিনি এই সময় হইতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩০৭ সালের ৯ই ফাল্গুন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহিমচন্দ্রের শুভবিবাহ উপলক্ষে তাঁহার এই মহতী ইচ্ছা ফলবতী হইতে আরম্ভ হইল। রাণাঘাট সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের কোনও সামাজিক আদান-প্রদান ছিল না। তিনিই প্রথমে রাণাঘাটের শ্রীযুক্ত রামলাল মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র কন্যার সহিত মহিমচন্দ্রের বিবাহ দেন এবং এই বিবাহে তিনি সর্ব্বসম্প্রদায়ের তিনি জাতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র ভোজন করান। এই উৎসবে যাবতীয় ধনী, মানী, গুণী নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন। সুদীর্ঘ দেড় মাস ধরিয়া দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ও নৃত্যগীতাদি চলিয়াছিল। এই উপলক্ষে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রাজা প্রজা সম্বন্ধ।

১৩০৬ সালে তিনি তাঁহার বাহারবন্দ জমীদারী প্রথম পরিদর্শন করেন। প্রজাগণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দিত করিয়া-

ছিল। সমস্ত পরগণা মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আড়ম্বরশূন্য সরল উদার ব্যবহার প্রজার অন্তর হইতে ভক্তি আপনা হইতে বাহির করে। মণীন্দ্রচন্দ্রও তাহার মাধুর্য্যে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

১৩০৮ সালে তিনি বঙ্গীয় জমিদারদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৩১১-১৩ পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৩১৪ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং ১৩১৭ সালে পুনরায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন, এ সময়ে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হন নাই।

মহারাজের মধ্যম কুমারের মৃত্যু ১৩১০ সালে গোষ্ঠাষ্টমীর দিন হইয়াছিল। মধ্যম মহারাজকুমার কীর্ত্তিচন্দ্র শান্ত-প্রকৃতি, গম্ভীর, অল্পভাষী ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজা শোকে মুহ্যমান হইলেও তাঁহার অন্তর্নিহিত সর্ব্বলোকের অভাব ও দুঃখমোচনের ইচ্ছা হারান নাই। ঐ দিনেই তাঁহার হেডক্লার্ক জগৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। মণীন্দ্রচন্দ্র এই মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াই লোকজন ডাকাইয়া নিজেই জগৎবাবুর মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৩১১ সালে রাণাঘাটের জমিদার হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র নীরদচন্দ্র পালের সহিত মধ্যম মহারাজকুমারীর বিবাহ হয় এবং অল্পকাল মধ্যে তিনি বিধবা হন।

১৩১১ সালে মহারাণী হরসুন্দরীর মৃত্যু হয়। ১৩১২ সালে মহারাণী হরসুন্দরীর শ্রাদ্ধ হয়। এত ধূমধামের ব্যাপার কেহ কখনও দেখেন নাই। সমস্ত বঙ্গদেশ ও দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া-

ছিলেন। ৬০ হাজার কাঙ্গালী বিদায় হইয়াছিল। দুই হাতে সকলে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ জন্য প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

মহারাজার সপরিবারে তীর্থভ্রমণকালে ব্রজমণ্ডলে গিরিগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে তাঁহার জীবনের অবলম্বন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৭ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৩১০ সালের ১১ই চৈত্র এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর গ্রাজুয়েট হইয়াছিলেন।

এমন অমায়িক সুন্দরপ্রকৃতি যুবকের অকাল মৃত্যুতে পিতা-মাতার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। দুঃখের বিষয়, যখন মহিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় তখন তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্বা ছিলেন। ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্যামাপূজার দিন একটী কন্যা প্রসব করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই কন্যাটী এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু মুরলী রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী।

মহারাজা কাশিমবাজারের সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার পর হইতে বৎসর বৎসর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান থাকাকালে তিনি মিউনিসি-পালিটীর ও সহরের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত মিউ-নিসিপালিটী অনেক সময় অর্থাভাবে বিপদে পড়িলে তিনিই তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

সন ১৩২৪ সালের ২০শে বৈশাখ তারিখে মহাসমারোহে মহারাজ-কুমার শ্রীশচন্দ্রের শুভবিবাহ দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় বাহা-দুরের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নীলিমার সহিত সুসম্পন্ন হয়। নৃত্যগীত, ৪০।৫০ হাজার কাঙ্গালী বিদায়, ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায় ইত্যাদির কিছুই ত্রুটি ছিল না।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া

অবধি দেশহিতকর কার্য্যের জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার দানের তালিকা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার দান সর্ব্ব-দেশব্যাপী ও সর্ব্বজনব্যাপী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের টোলের বৃত্তি, মধ্যবিত্তগণের পিতৃ মাতৃ ও কন্যাদায়ের সাহায্য, বিদ্যার্থিগণের আহার, বিদ্যালয়ের মাহিনা, পুস্তকের মূল্য ইত্যাদি কতই যে দিয়া থাকেন তাহার পরিসীমা নাই। তাঁহার জমীদারীর মধ্যে শত শত পুষ্করিণী-খনন, বিদ্যালয়-স্থাপন, অতিথি-অভ্যাগত দীন-দরিদ্রদিগের জন্য সদাব্রত-স্থাপনাদি তাঁহার জীবনের ব্রত। তাঁহার মত স্বজাতিপ্রিয়তা, আত্মীয়বৎসলতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অনন্যসাধারণ অনুরাগ। তাঁহার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা প্রকৃতই বিরল। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' যে ভূমিখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা মহারাজের দান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নানাবিষয়ে মহারাজার নিকট ঋণী। কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র তাঁহার প্রদত্ত অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

চুঁচুড়ার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, মহারাজা তাঁহার সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যখন যেখানেই অধিবেশন হইয়াছে, মহারাজা তাহাতে প্রায় সকল-গুলিতেই যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজা পরম বৈষ্ণব; তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ। মহারাজা স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য-সভা'র সভাপতি।

মহারাজের নিম্নলিখিত দানের তালিকা দেখিলে তিনি যে কত বড় দান বীর তাহা বুঝা যায়:—

কলেজ, স্কুল, টোল ও চতুষ্পাঠী—		২৩,৯৪,২৬৭৸৬
দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল	..	১,০৯,৬৬২।৴৪ ৫/৭
লাইব্রেরী বা পাঠাগার	...	৭,৪৯৫৸৵৩
স্মৃতি-ভাণ্ডার	...	১,২৭,৫২৯॥৶৬
অভ্যর্থনা-ভাণ্ডার	...	৩৪,৬২২॥৶৬
রিলিফ-ফণ্ড	.	১৮,৬২৮।০
যুদ্ধ ফণ্ড	...	৩৯,৯৫০৲
জলের কল	...	১,০৩,২৩১।৴৩
পথ ও বাটী নির্ম্মাণ	...	৫২,৬২৩৸৴৩
সাধারণহিতকর কার্য্য	...	৬,৬০৫৲
বিভিন্ন সদনুষ্ঠান	...	১৫,৪৮১॥৴০
পুস্তক-প্রকাশ	...	৭৪,৯৪৩॥৩
বিভিন্ন দাতব্য ভাণ্ডার	...	২৩,৮৭৮৸৶৩
ধর্ম্মানুষ্ঠান	...	১,০৯,৯৮০৸৶৩
দীন-দরিদ্রদিগকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য		১,২২,৪০২।৴৮
ব্যক্তিগত সাহায্য	...	৬,৪৫,০৩৪।৵৮
সভা-সমিতি		৮১,২১৪॥৵৩
প্রদর্শনী	...	১,২৯,৪৬৭॥৴৯
ক্লাব	...	২,০২১৲
আচার্য্য বসুর বিজ্ঞান-মন্দির	...	২,০০,০০০৲
	মোট	৪৩,৯৯,০৪১৸/৪

মহারাজা ইংরেজী ১৮৯৭-৯৮ সাল হইতে ১৯১৭-১৮ সাল পর্য্যন্ত উপরি-উক্ত দানগুলি করিয়াছেন।

নশীপুর-রাজবংশ

নশীপুর-রাজবংশের প্রাচীনত্ব সর্ব্বজনবিদিত। এই বংশের আদি-পুরুষের নাম মহারাজ তারাবা। ইনি খ্রীষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেজাপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে নশীপুর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিতে হইলে মহারাজ দেবী সিংহকেই বলিতে হয়। ইনি লর্ড ক্লাইবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। লর্ড ক্লাইব ইঁহাকে মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

আদিপুরুষ

পরলোকগত মহারাজা রণজিৎ সিংহ এফ-আর-এস-এ মহোদয় রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুত্র। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে মহারাজা রণজিৎসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইনি যত দিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, ততদিন ইঁহার বিস্তৃত জমিদারীর তত্ত্বাবধান-ভার 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে'র হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাজা রণজিৎসিংহ বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তথাকার কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং নিজ জমিদারী দেখিতে আরম্ভ করেন। ইনি প্রজাবর্গের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতেন এবং বহু প্রজা ইঁহার আনুকূল্য লাভ করিত। ইনি আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি জমিদারীকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "The rules of the management of the Nashipur Raj Estate" নামক

মহারাজ রণজিৎসিংহ।

স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ

পুস্তকখানি জমিদারী-সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট পুস্তক। তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গকে এই সকল নিয়ম অনুসারে কর্ম্ম করিতে হয়। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের মত 'প্রিভিলেজ লিভ' ও 'পেন্সন' পাইয়া থাকে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মহারাজা দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি লালবাগ ইন্‌ডিপেনডেণ্ট বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে বৃত হন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তিনি স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতিকর বহু ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে ভীষণ বন্যা হয় এবং তাহাতে বহুলোক বিপন্ন ও গৃহহারা হইয়াছিল; এমন কি তাহাদের ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এই অনশন-ক্লিষ্ট বন্যা-পীড়িত নরনারীর ক্লেশ ও দুর্দ্দশামোচনের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। এই উপাধির সনন্দ-প্রদানকালে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট বলেন,—"এই সনন্দ ভারতের রাজপ্রতিনিধি আপনাকে পরম প্রীতিসহকারে প্রদান করিয়াছেন। এই রাজোপাধি পুরুষানুক্রমে আপনার পূর্ব্ববংশীয়গণ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। সেই বংশপরম্পরাগত উপাধির সনন্দ এক্ষণে আপনার হস্তে অর্পিত হইতেছে। আপনার পূর্ব্বপুরুষ রাজা দেবী সিংহ পলাশী যুদ্ধের সময়ে লর্ড ক্লাইবকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট এইজন্য নশীপুর রাজবংশকে আনুকূল্য ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আপনি সম্প্রতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনার বিপুল সম্পত্তির পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি আপনার পূর্ব্ব-

পুরুষগণের মত সুচারুরূপে আপনার জমিদারী পরিচালনা করিবেন এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিয়া উত্তরোত্তর উচ্চতর রাজ-সম্মান-লাভে অধিকারী হইবেন।”

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করেন এবং তিনি তখন হইতে একক বসিয়া বিচার করিবার অধিকার লাভ করেন। গভর্মেণ্ট তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করেন। এখন হইতে তিনি লোকের অভিযোগ ও পুলিশ কর্ত্তৃক আনীত অভিযোগসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইলেন। এই সময়ে প্রকৃতপক্ষে লালবাগ বেঞ্চের সম্পূর্ণ পরিচালন-ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল; বলিতে কি লালবাগ হইতে মহকুমা উঠিয়া যাইলে তিনি মহকুমার হাকিমের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ‘রাজা বাহাদুর’ উপাধি লাভ করেন। এই উপাধির সনন্দ-প্রদানকালে বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সার চার্লস ষ্টিভেন্স বলেন,—“রাজা আপনি অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান এবং বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী। আপনার কার্য্যকলাপ আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের অনুরূপ। আপনি প্রজারঞ্জক এবং উন্নত-হৃদয় ভূস্বামীর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের বলবতী ইচ্ছা আপনার হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এইজন্য আপনার কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তৃততর হইয়া পড়িয়াছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে আপনি স্থানীয় শাসনবর্গকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। এক্ষণে গভর্মেণ্ট আপনাকে ‘রাজা বাহাদুর’ উপাধি দান করা নিতান্ত সঙ্গত বোধ করিয়াছেন। আপনাকে সেই উপাধির সনন্দ প্রদান করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিতেছি।”

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন।

গভর্মেণ্ট মহারাজা রণজিৎ সিংহকে অতীব সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যে গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন তাহাতে উহাই প্রমাণিত হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে কর্ম্ম-কুশলতা, যোগ্যতা ও দেশ-হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার খ্যাতি শিক্ষিত-সমাজে বদ্ধমূল হয়। এই সময়ে প্রস্তাবিত সংশোধিত মিউনিসিপ্যাল আইনের সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যুক্তি-তর্কে ও বিচার-নৈপুণ্যে তাহা অসাধারণ। সেই বক্তৃতায় তিনি শিক্ষিত-সমাজের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গভর্মেণ্ট তাঁহাকে একজন প্রকৃত মন্ত্রণাদাতা অমাত্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি উচিতবক্তা ছিলেন; যাহা তাঁহার বিবেচনামতে ঠিক মনে হইত, তাহা তিনি অকপট এবং নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতেন। যে বিষয়টীর উপর তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, সেই বিষয়টী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি অধ্যয়ন করিতেন। তিনি হঠাৎ কোনও মন্তব্য প্রদান করিতেন না। তিনি ধীর, স্থির এবং প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন; উচ্ছ্বাস বা ভাবের আবেগে কখনও বক্তৃতা করিতেন না। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল বা মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন যে শ্রেণীর রাজনীতিক ইনিও সেই শ্রেণীর রাজনীতিক ছিলেন।

দেশহিতকর বহু কার্য্যের জন্য গভর্মেণ্ট ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার এডওয়ার্ড নরম্যান বেকার তাঁহাকে এই উপাধির সনন্দ-প্রদানকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—'যাঁহারা দেশ-হিতকর-কার্য্যে যোগ্যতা

প্রদর্শন করিয়া গভর্মেণ্টের সম্মানের পাত্র হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সেই সম্মানের পরিচায়ক সনন্দ প্রদান করিবার অধিকারী হইলে আমি নিতান্ত প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। আবার যখন দেখি, আমার কোনও পুরাতন ও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু সেই সনন্দ লাভ করিতেছেন, তখন আমার সেই আনন্দ আরও অধিক হইয়া থাকে। আপনার সহিত আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে; তখন আমরা উভয়েই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কার্য্য করিতেছিলাম। সেই সময়ে আমি আপনার ন্যায়পরায়ণতা, সারল্য, অকপটতা এবং ধীরতা দেখিয়া মুগ্ধ ও আপনার গুণ-পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। আপনি যে বংশের বর্ত্তমান বংশধর, সেই বংশ অতি প্রাচীন ও সম্মানিত। আপনার জনৈক পূর্ব্বপুরুষ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আপনিও ইতিপূর্ব্বে দুইবার ১৮৯২ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনাকে তদপেক্ষা উচ্চ সম্মান— 'মহারাজা'র সনন্দ প্রদান করিয়া অধিকতর প্রীতি অনুভব করিতেছি।

আপনি মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে দেশের কল্যাণসাধনে ব্রতী হইয়া যে এই রাজ-সম্মানের অধিকার লাভ করিয়াছেন, কেবল তাহাই নহে; আপনি সঙ্কটকালে গভর্মেণ্টের প্রতি যে আনুগত্য, আনুকূল্য ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন এই রাজসম্মানলাভ তাহারও ফল বটে।"

বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল জন-হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দানশীল ছিলেন; প্রতি বৎসর হাজার হাজার টাকা তিনি সৎকর্ম্মে দান করিতেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতেন। তিনি কোর্ট ফি আইনের সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এজন্য ভারত গভর্মেণ্টের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে "রাজা বাহাদুর" উপাধি নশীপুর রাজ-বংশের বংশানুগত অধিকার বলিয়া গভর্মেণ্ট ঘোষণা করেন অর্থাৎ নশীপুর-রাজবংশে "রাজা বাহাদুর" উপাধি চিরন্তন হইয়া রহিল।

জীবনের অপরাহ্নে তিনি দেশে স্বায়ত্তশাসন কিরূপে সুবিস্তৃতভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহারই চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তিকা রচনা করেন তাহাতে তিনি যে সকল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেগুলি প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিরই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। তিনি কর্ম্মকুশলতা, দেশ-হিতৈষিতা, অকপট ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বৈশ্য আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশবাসীর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা গভর্ণমেণ্টের নিকট ধীর ও অকপটভাবে ব্যক্ত করিতে তিনি সততই উৎসাহ দিতেন এবং স্বয়ং এ কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। কিন্তু তিনি উগ্র রাজনীতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। বিপ্লব দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজন্য ও ভূস্বামিবর্গের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র প্রচারিত করিয়াছিলেন, মহারাজা রণজিৎ সিংহ প্রথমেই তদুত্তরে গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজা রণজিৎ সিংহ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রকৃত অনুরাগ ছিল। হিন্দুর সামাজিক আচারপদ্ধতির বিন্দুমাত্র অপহ্নব তিনি সহিতে পারিতেন না। হিন্দু আচার-ব্যবহারের ষোল আনা পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। তিনি মধুরভাষী, সদালাপী এবং অমায়িকস্বভাব ছিলেন। তিনি নশীপুরবাসীর সর্ব্বস্ব ছিলেন। তিনি তথায় কূপখনন, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে নশীপুরের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

মহারাজা রণজিৎ সিংহ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা বাহাদুর ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ত্তমান সময়ে নশীপুর রাজ-বংশের উত্তরাধিকারী। ইনি সুশিক্ষিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। দ্বিতীয় পুত্র মহারাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তৃতীয় পুত্র মহারাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি-এ পরীক্ষার জন্য এবং কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

রাজা বাহাদুর ভূপেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ।

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি-এ বাহাদুর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার প্রথম পুত্রসন্তান বলিয়া নশীপুর আনন্দোৎসবে মগ্ন হইয়াছিল। সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে ইনি টাইফয়েড পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং ইঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। কলিকাতা হইতে লেপ্টেনাণ্ট-কর্ণেল আর এল দত্ত প্রমুখ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের চিকিৎসায় এবং জগদীশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার জীবন-রক্ষা হয়। শৈশবে তিনি উত্তম গৃহ-শিক্ষকগণের নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করেন; পরে মুর্শিদাবাদের নবাব হাই স্কুলে (এক্ষণে নবাব

রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর বি-এ, ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গ—মহারাজ-কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি-এ, মহারাজ-কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি-এ, ও মহারাজ-কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

বাহাদুর ইনষ্টিটিউসন্) ভর্ত্তি হন। প্রথম হইতেই অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁহার অনুরাগ দৃষ্ট হয় এবং অঙ্কবিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও মহারাজ-কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণের স্বভাবে ঔদ্ধত্য বা দর্প-দম্ভ একেবারেই ছিল না। ছাত্রজীবনে তিনি যেমন বিনয়ী, মিষ্টস্বভাব, অমায়িক এবং সচ্চরিত্র ছিলেন, এখনও তেমনই আছেন।

এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহারাজ-কুমার কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অঙ্কশাস্ত্রে ও পদার্থ-বিদ্যায় প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি আইন-অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন; আইনের পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্পও ইঁহার ছিল; কিন্তু এই সময়ে ইঁহার পরলোকগত পিতৃদেব জমীদারীর কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাজনীতিক আলোচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। এইজন্য নশীপুর-রাজের বিপুল জমিদারী পরিদর্শনের ভার মহারাজ-কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণের উপর ন্যস্ত হয়। মহারাজ-কুমার যেভাবে এই সময়ে জমীদারীর কার্য্য পরিচালন করেন, তাহাতে তাঁহার পিতা অতীব সন্তুষ্ট হন। জমীদারীর হিসাব-পত্র পরিদর্শনে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন এবং অল্পদিনেই জমীদারী পরিচালন-ব্যাপারে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে।

এই সময়ে অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহারাজা রণজিৎ সিংহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে মহারাজ-কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণের উপর যে গুরুভার ও বিপুল দায়িত্বের

বোঝা নিপতিত হয়, তাহা তিনি অসাধারণ ধৈর্য্য, বিপুল সহিষ্ণুতা ও বীরত্বের সহিত বহন করিতে থাকেন। জমীদারী-কার্য্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকিলেও তাঁহার সম্মুখে প্রতিদিন নূতন নূতন জটিল সমস্যা উপস্থিত হইত; কিন্তু মহারাজ-কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেগুলি সমাধান করিয়া প্রবীণ কর্ম্মচারিগণকে বিস্মিত করিয়া দিতেন।

জমিদারী-সংক্রান্ত কোনও গুরুতর ব্যাপারে তিনি তাঁহার সহোদরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন। তাঁহার সহোদরগণ সকলেই সুশিক্ষিত। সকল ভ্রাতাই নশীপুর-রাজবংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অতীত গৌরবরক্ষার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত আছেন।

নশীপুর রাজবংশের প্রথা-অনুসারে জ্যেষ্ঠই সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টও বংশগত এই প্রথার অনুমোদন করিয়া মহারাজকুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে তিনি বংশগত "রাজবাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি এক বৎসর অশৌচ রক্ষা করিয়াছিলেন।

পিতার জীবদ্দশাতেই ইনি লালবাগ বেঞ্চের তৃতীয় শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার কর্ম্মকুশলতা ও যোগ্যতা-দর্শনে প্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও বিচারাসনে একাকী বসিয়া বিচার করিবার অধিকার দান করিয়াছেন। ইনি মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার। আজিমগঞ্জ ফেরিঘাট ইতিপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন ছিল; পরে এই ফেরিঘাট এই মিউনিসিপ্যালিটীর হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। কিন্তু রাজা বাহাদুরের চেষ্টায় এই ঘাট পুনরায় মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে আসিয়াছে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি মুর্শিদাবাদ জেলা-বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। তদবধি তিনি জেলা-বোর্ডের কার্য্য মনোনিবেশসহকারে সুসম্পন্ন করিতেছেন।

রাজা বাহাদুর এখন বয়সে নবীন; কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার অসামান্য যোগ্যতা, বিপুল কর্ম্মশক্তি ও পরিশ্রমশীলতা পরিদর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার উন্নততর ভবিষ্যৎ আশা করিতেছেন। তিনি প্রজাগণের কল্যাণকামী এবং তাহাদের কল্যাণের চেষ্টা সতত করিয়া থাকেন। তিনি বিস্তর চৌকিদারী মামলা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রাজা বাহাদুর ভূপেন্দ্রনারায়ণ স্বধর্ম্মানুরাগী এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি সমুদার মত পোষণ করিয়া থাকেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ধীরপন্থী।

রাজা বাহাদুরের একটী কন্যা; কন্যাটির বয়স ৮ বৎসর মাত্র। রাজা বাহাদুরই এক্ষণে নশীপুর রাজ-পরিবারের কর্ত্তা। তাঁহার সহোদরগণ তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

মহারাজ কুমার নৃপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহারাজা রণজিৎ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। সম্প্রতি ইনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি সুশিক্ষিত ও উন্নতহৃদয়। ইনি ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা বাহাদুর ভূপেন্দ্র-নারায়ণের দক্ষিণহস্ত। সকল পারিবারিক ও জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজা বাহাদুর ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ষ্টেটের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইনি বিনয়ী এবং মধুরপ্রকৃতি। ইঁহার হৃদয় দয়া ও সহানুভূতিপ্রবণ। এইজন্য সকলেই

মহারাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

ইঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে। ইনি পিয়ানো, অর্গান ও হারমোনিয়াম বেশ ভালরূপ বাজাইতে জানেন।

মহারাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

মহারাজ কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংহ রণজিৎসিংহের তৃতীয় পুত্র। এক্ষণে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। ইঁহার এক পুত্র—পুত্রের নাম কুমার জিতেন্দ্রজিৎ। জিতেন্দ্রজিৎ এক্ষণে পরিবারের নয়নতারা-স্বরূপ। মহারাজ কুমারের ছাত্রাবস্থা বলিয়া এক্ষণে ষ্টেটের কার্য্য পরিদর্শন করিতে পারেন না। ইনিও মধুরস্বভাব এবং ভ্রাতৃভক্ত ও ভ্রাতৃবৎসল।

মহারাজকুমার বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ।

মহারাজা রণজিৎসিংহের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মহারাজ-কুমার বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ। এক্ষণে ইনি ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। সকল ভ্রাতাই ইঁহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য চেষ্টিত আছেন।

কাশিমবাজার ব্রাহ্মণ-রাজবংশ।

কাশিমবাজার ব্রাহ্মণ-রাজবংশ অতীব প্রাচীন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম অযোধ্যারাম রায়; ইনি হটু রায় নামে বিখ্যাত। মহারাজা আদিশূর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, দক্ষ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অযোধ্যারাম সেই দক্ষের অধস্তন দ্বাবিংশতিতম বংশধর। কৃষ্ণানন্দ ও জয়গোপাল রায় যথাক্রমে ইঁহার উর্দ্ধতন ষষ্ঠ ও চতুর্থ পুরুষ।

অযোধ্যারাম রায়ের পুত্র দীনবন্ধু রায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার রেশম-কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি নবাব সরকারের নিকট হইতে খেলাত ও রৌপ্যমণ্ডিত ছড়ি ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছিলেন। তখনকার কালে রৌপ্যমণ্ডিত ছড়ি ব্যবহার করা বিশিষ্ট সম্মান ও সম্ভ্রমের পরিচায়ক ছিল।

দীনবন্ধু রায়ের পুত্র জগবন্ধু রায় ও ব্রজমোহন রায় কিছুকাল কাশিমবাজার রেশম-কুঠীর দেওয়ানী করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সময় হইতেই বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে ইঁহারা পিরোজপুর গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া কাশিমবাজারে স্থায়ি-ভাবে বসবাস করিতে থাকেন। এখনও রাজ-ষ্টেট হইতে পিরোজ-পুরের গৃহদেবতা মদনগোপালের সেবার ব্যয় প্রদত্ত হইয়া থাকে।

জগবন্ধু রায় উদ্যমশীল পুরুষ ছিলেন। হিজলী-কাঁথিতে নূতন নিমক মহাল স্থাপিত হইলে ইনি তাহার দেওয়ান হন। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইঁহাকে মেদিনীপুর কলেক্টরীর দেওয়ান নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। এই সময়ে মেদিনীপুর কলেক্টরীর কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল এবং খাজানা-আদায় ভালরূপ হইতেছিল না। ইনি মেদিনীপুর কলেক্টরীর কর্ত্তা হইয়া কার্য্য সুশৃঙ্খল করিয়া দেন এবং অনেক বাকী খাজনা আদায় করেন; উপরন্তু করসংগ্রহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। এজন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কার্য্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি ময়মনসিংহ কলেক্টারীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জেলার বাকী খাজনা আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত করেন; সেই সময়ে সরাইল পরগণা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সরাইল পরগণার ।/১২ পাঁচ আনা বার গণ্ডা অংশ বাকী খাজনার দায়ে ময়মনসিংহ কলেক্টরীতে নিলামে উঠে। জগবন্ধু রায় সেই সময়ে এখানকার সেরিস্তাদার ছিলেন। তিনি এক জন মোক্তার দ্বারা এই সম্পত্তি ৪০ হাজার টাকায় নিলামে ক্রয় করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সরাইল পরগণা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার কলেক্টর মহাশয় বাকী খাজনার জন্য সরাইল পরগণার ৭ আনা অংশ নিলামে উঠাইয়া দেন। জগবন্ধু রায় মহাশয়ের পুত্র বাবু নৃসিংহপ্রসাদ রায় এই সম্পত্তি ৬০ হাজার টাকায় খরিদ করেন। বাবু নৃসিংহপ্রসাদ ও দেওয়ান ব্রজমোহন রায়ের পুত্র বাবু জয়কৃষ্ণ রায় একযোগে রঙ্গপুরের জমিদারী এবং দেওয়ান সূর্য্যনারায়ণ মজুমদারের মুর্শিদাবাদ জেলার জৌবেরিয়া জমিদারী ৪৫,০০১৲ টাকায় ক্রয় করেন। এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ইহাদিগকে মামলায় পড়িতে হয়। দীর্ঘকাল মামলা চলিবার পর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মামলায় জয়ী হন।

কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী দুইবার দেওয়ানী আদালতে

বাবু নৃসিংহপ্রসাদের বিরুদ্ধে তিন কোটী টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করেন; কিন্তু এই মামলায় বাবু নৃসিংহপ্রসাদ জয়লাভ করেন। ইঁহার পিতৃব্য-কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবী বিপুল পারিবারিক সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করিবার জন্য ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এক মামলা দায়ের করিয়াছিলেন, কিন্তু এই মামলাতেও নৃসিংহপ্রসাদ জয়ী হইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান মনোহর আলির পত্নী তাঁহার স্বামীর সম্পত্তির ১২ আনা অংশ বিক্রয় করিবার জন্য উদ্যত হন। সেই সময়ে নাবালক রাজা আশুতোষনাথ রায় বাহাদুরের পক্ষ হইতে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের কর্তৃপক্ষ এই সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। সুতরাং এক্ষণে সরাইল পরগণার ১৫ আনা ৩ গণ্ডা অংশ রাজষ্টেটভুক্ত হইয়াছে; বাকী ১৭ গণ্ডা অংশ রায় বাহাদুর মোহিনীমোহন বর্দ্ধন ও তাঁহার অংশীদারগণের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে।

বাবু নৃসিংহ রায় পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জগবন্ধু রায়ের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র রায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। এইজন্য জগবন্ধু নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। এই সময়ে এই বংশের কোনও ব্যক্তি গঙ্গাসাগরতীর্থে গমন করেন এবং সেখানে এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে নৃসিংহদেবের প্রস্তর-মূর্ত্তি ক্রয় করেন। ইনি সেই দেবমূর্ত্তি কাশিমবাজারে আনয়ন করিয়া একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ নৃসিংহ-দেবকে মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত করেন। নৃসিংহদেবের নিকটে মানত করায় জগবন্ধুর একটী পুত্রসন্তান হয়। দেবতার অনুগ্রহজাত বলিয়া পুত্রের নাম তিনি নৃসিংহপ্রসাদ রাখেন। নৃসিংহপ্রসাদ রায় তিন পুত্র রাখিয়া যান; নবকৃষ্ণ রায়, রাজকৃষ্ণ রায় এবং গোপালকৃষ্ণ রায়। নবকৃষ্ণ রায় ও রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার প্রথমা পত্নী রুক্মিণীদেবীর

গর্ভে এবং গোপালকৃষ্ণ রায় তাহার দ্বিতীয়া পত্নী গৌরমণি দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই পত্নী ব্যতীত তাঁহার আরও দুইটী পত্নী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই।

নৃসিংহ রায় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম কাশিমবাজারের অধিবাসীদের গৃহে গৃহে এখনও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার পুত্র নবকৃষ্ণ রায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন; রাজকৃষ্ণ রায় একমাত্র পুত্র অন্নদাপ্রসাদ রায়কে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অন্নদাপ্রসাদ তখনও প্রাপ্তবয়স্ক হন নাই বলিয়া বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ-ভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হস্তে ছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদাপ্রসাদ সাবালক হইয়া আপন বিষয়-সম্পত্তির পরিদর্শন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

১৮৭৪।৭৫ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে মুক্তহস্তে সাহায্যদানহেতু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল অন্নদাপ্রসাদ রায়কে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। রায় বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ কলিকাতা সহরে অকালে পরলোকগমন করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের নিমন্ত্রণে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; কমিশনার বাহাদুর তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিবেন,—এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু মহাকাল তাঁহাকে টানিয়া লইলেন।

রায় বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদের একমাত্র পুত্র রাজা আশুতোষনাথ রায়। পিতার মৃত্যুর পর ইনি বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু রাজা আশুতোষনাথ তখন প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না বলিয়া সম্পত্তির পরিচালনভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডস গ্রহণ করিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা আশুতোষনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হন ; উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত কোর্ট অফ ওয়ার্ডস তাঁহার সম্পত্তি পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে হাইকোর্টের পরলোকগত বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রীর (রাণী সরোজিনী দেবী) সহিত রাজা আশুতোষনাথ রায়ের বিবাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানসময়ে আশুতোষনাথ যেরূপ দানশীলতা ও সদনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় লেডী ডফরিণ হাঁসপাতাল-প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি যে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রীত হইয়া তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। উপাধির সনন্দ ও খেলাত প্রেসিডেন্সি বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার অনারেবল মিঃ সি ই বাকলাণ্ড বাহাদুর রাজা আশুতোষনাথ রায়ের কাশিম-বাজার প্রাসাদে প্রকাশ্য দরবার আহ্বান করিয়া রাজাকে দিয়াছিলেন।

রাজা আশুতোষনাথ রায়ের মাতা শ্রীমতী আর্ণাকালী দেবী অতি দানশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি মুক্তহস্তে দীনদরিদ্রকে অর্থসাহায্য করিতেন; সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে তিনি অর্থ দান করিতেন। বহরমপুরের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন ; প্রধানতঃ তাঁহারই প্রদত্ত টাকায় এই চতুষ্পাঠী অদ্যাপি পরিরক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

রাজা আশুতোষনাথ রায় কেবল যে বড় দাতা ছিলেন তাহা নহে ; তিনি ভাল শিকারী ও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন ; গীত-বাদ্য এবং অন্যান্য সুকুমার কলার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার আরও অনেক গুণ ছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্জ্জন তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য লর্ড কর্জ্জন তাঁহাকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজা আশুতোষনাথ রায় গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সম্মানের পাত্র ছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে রাজা আশুতোষনাথ রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার এই অকাল মৃত্যু অতীব শোচনীয়।

রাজা আশুতোষনাথ দুইটী অনূঢ়া কন্যা ও একটী ছয় মাসের পুত্রসন্তান রাখিয়া ৩১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার দুইটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল; কিন্তু জন্মগ্রহণমাত্রই দুইটীই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রাণীমাতার অচলা ভক্তিতে ও মেহেরের কালিকা দেবীর অনুগ্রহে রাজা আশুতোষনাথ রায়ের একমাত্র পুত্র কুমার কমলারঞ্জন রায় এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন এবং রাণী সরোজিনী দেবীই অভিভাবিকাস্বরূপ তাঁহাকে সকল প্রকার সুশিক্ষা দান করিতেছেন। নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে কুমার কমলারঞ্জনের জমিদারী আছে:— মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান, হুগলী, কলিকাতা ও বীরভূম। মুঙ্গের নগরীতে কেল্লার ভিতরে ইহাদের একটী অতি সুন্দর বাটী আছে; ইহার নাম চরণ-চৌরা। এই বাটী রায় বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ রায় ভিজিয়ানাগ্রামের রাজার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন।

রাজা আশুতোষনাথের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত নদীয়ার বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের বিবাহ গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহ-উপলক্ষে প্রায় এক পক্ষ কাল ধরিয়া উৎসব-আমোদ চলিয়াছিল।

কাশিমবাজার ব্রাহ্মণ-রাজবংশ সমাজে অতি উচ্চস্থান অধিকার

করিয়া আছেন। ইঁহাদের কুলমর্য্যাদা, প্রচুর অর্থ, দানশীলতা ও পরোপকারপরায়ণতা এই রাজবংশকে বাঙ্গালার জনসমাজের শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় অর্থ-সম্পদে এই রাজ-বংশকে দ্বিতীয়স্থানীয় বলা যাইতে পারে।

বংশ-তালিকা।
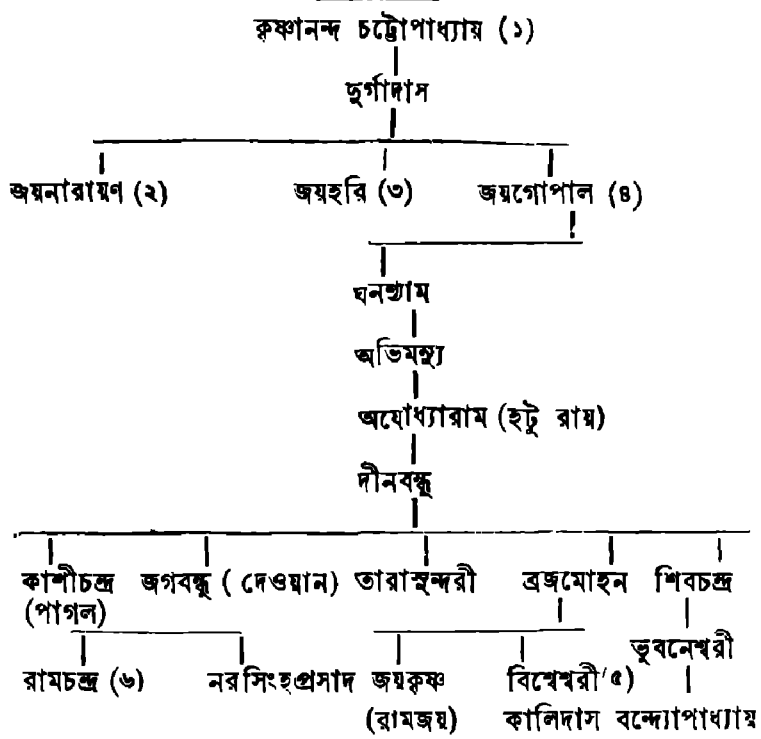
(১) খনিয়া, সুরাই মেল। বাঁকুড়া পাত্রসায়রে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। রাজা আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম দক্ষের অধস্তন ১৭শ পুরুষ।

(২) (৩) (৪) বাঙ্গালার নবাব নাজিম ইঁহাদের তিন ভ্রাতাকে "রায়" উপাধি প্রদান করেন। (৫) ইনি কোলোর প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বিবাহ করেন।

(৬) ইনি ধনবধূকে বিবাহ করেন।
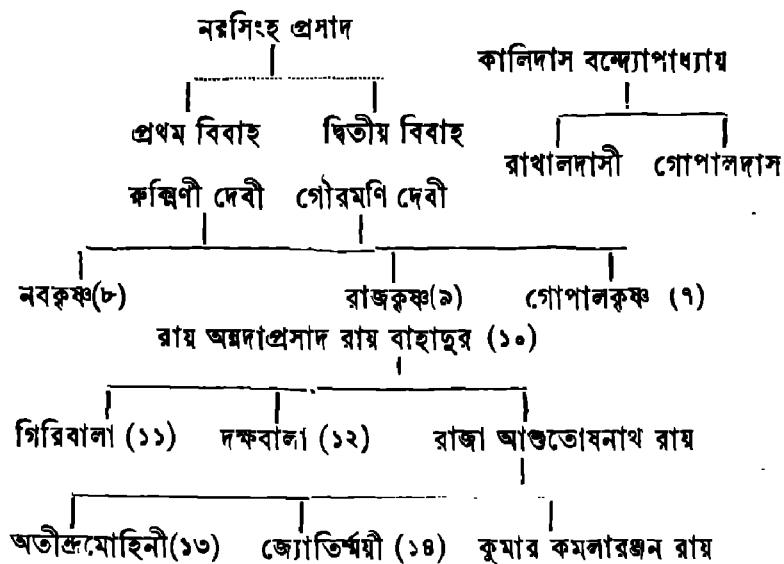
(৭) উগার চাঁদ বাওকে বিবাহ করেন।

(৮) ইঁহার দুই বিবাহ; প্রথমা পত্নী সৈদাপদের কাশীশ্বরী দেবী এবং দ্বিতীয়া পত্নী বেলডাঙ্গার হৃদয়ম'ণ দেবী।

(৯) ইজলামপুরের সুখদা সুন্দরীকে বিবাহ করেন।

(১০) ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং মৃত্যু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী।

(১১) বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

(১২) ৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

(১৩) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর জন্ম হয়। পাণিহাটির চুণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে মৃত্যু হয়।

(১৪) মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নদীয়ার মহারাজ-কুমারকে বিবাহ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লী দরবারের সময়ে মহারাজ-কুমার মহারাজ হন; ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাহাদুর হন।

শিহাড়শোল-রাজবংশ

পঞ্চ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ পঞ্জাব প্রদেশে বাস করেন। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণও সারস্বত ব্রাহ্মণগণের অন্তর্ভূত বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু আচার-ব্যবহারে পঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহারা অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যায়ন শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা সাধারণতঃ পৌরহিত্যে ব্রতী। এইজন্য যে সমস্ত ধনী ক্ষেত্রী বহুদিন যাবৎ বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রায়ই পঞ্জাব হইতে সারস্বত ব্রাহ্মণদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন পূর্ব্বক বাস করাইয়াছেন।

শিহাড়শোলের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিত মহাশয় পঞ্জাবের সারস্বত-ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। কোন সময়ে এবং কি উপলক্ষ্যে গোবিন্দপ্রসাদ অথবা তাঁহার পিতা সদাশিব পণ্ডিত পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন তাহা নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। সদাশিব পণ্ডিতের চারি পুত্র—গোপাললাল, গোবিন্দপ্রসাদ, কানাইলাল এবং পান্নালাল। গোবিন্দপ্রসাদ ঝরিয়ার নিকট গোপীনাথড়ির চুনিলাল পাঁড়ের কন্যা শ্রীমতী দাড়িম্বদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার চারিটী কন্যা—শ্যামাসুন্দরী, হরসুন্দরী, সত্যভামা, এবং উত্তমকুমারী; পুত্রসন্তান হয় নাই। সে সময় রেলপথ বিস্তার হয় নাই, এজন্য তখন পঞ্জাবে যাতায়াত বিশেষ আয়াসসাধ্য ছিল বলিয়া গোবিন্দপ্রসাদ বঙ্গদেশে থাকিয়া কাশ্মীর-নিবাসী কাশ্মীরী সারস্বত ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত বীরবল পণ্ডিতের

গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিত

সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর ; হুগলি জেলার সিঙ্গুর-নিবাসী রসিকলাল মালিয়ার পুত্র মতিলাল মালিয়ার সহিত দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবীর ; বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত সাসারাম-নিবাসী মাণিকলাল মিশ্রের সহিত তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সত্যভামা দেবীর এবং বেনারস-নিবাসী লছমী নারায়ণ মিশ্রের সহিত চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী উত্তমকুমারী দেবীর যথাক্রমে বিবাহ দিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত জামাতৃত্রয় পঞ্জাবী সারস্বত ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদের দ্বিতীয়া কন্যা ভিন্ন অন্য কেহ পুত্রবতী ছিলেন না। দ্বিতীয়া কন্যা হরসুন্দরী দেবীর বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর ও সূর্য্যেশ্বর নামে পাঁচটী পুত্র ও মনোমোহিনী নামে একটী কন্যা হয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বেশ্বর ও সূর্য্যেশ্বর অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং বিশ্বেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পুত্রের সন্তানাদি হয় নাই। বিশ্বেশ্বরের প্রমথনাথ নামে এক পুত্র এবং শরৎকামিনী, কুমুদকামিনী ও অঘোর-কামিনী নামে তিন কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে পুত্র প্রমথনাথ এবং কন্যা শরৎকামিনী এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। প্রমথনাথের এক কন্যা সরযূ-দেবী ও দুই পুত্র পশুপতিনাথ ও ক্ষিতিপতিনাথ।

গোবিন্দপ্রসাদ স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। স্বীয় অধ্যবসায়-বলে এবং চরিত্রগুণে তিনি উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি ২৪ পরগণায় ও শ্রীহট্টে ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। কর্ত্তব্য-ব্যপদেশে নানাস্থানে বাস করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি বঙ্গদেশের বিষয়-সম্পত্তিতে ও ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি জামাতাদিগকে পুত্রস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় তিনি নানা প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া

প্রভূত ভূসম্পত্তি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং হৃদয়ে ধর্ম্মভাবও অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি স্বগৃহে শ্রীশ্রীদামোদরচন্দ্র জিউ নারায়ণশিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। তিনি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি বিলক্ষণ সদ্ব্যয়ী ছিলেন; একটী পয়সাও অপব্যয় করিতেন না। এখনও তাঁহার লিখিত যে সমস্ত পত্রাদি আছে, তৎপাঠে তিনি যে কিরূপ লোকচরিত্রজ্ঞ, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিমিতব্যয়ী ছিলেন তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে বিমুখ হইতেন না। তিনি যে উইল করিয়া যান উহা পাঠ করিলেই তাঁহার সমস্ত সদিচ্ছা বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি যাঁহার দ্বারা কোনও প্রকারে উপকৃত হইয়াছেন তাঁহার প্রত্যুপকারের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করিতেন। পরোপকার তাঁহার ব্রতস্বরূপ ছিল। তিনি সদাব্রত, অতিথিসেবা-ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, জলাশয়-খনন, রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ সাধারণ-হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দপ্রসাদ শৈশবে ভ্রাতৃগণসহ বাঁকুড়া জেলায় বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে তিনি রাণীগঞ্জের নিকট এগারা গ্রামে বাস করেন। এই সময় তিনি বর্দ্ধমানের তেওয়ারি বাবুদের নিকট হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জের দুই মাইল দূরবর্ত্তী শিহাড়শোল, জোমিহারি প্রভৃতি স্থানের জমিদারিস্বত্ব খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। এই শিহাড়শোল প্রভৃতি স্থানের নিম্নে ভূগর্ভস্থিত পাথুরিয়া কয়লার খনি-

সমূহ উত্তরকালে গোবিন্দপ্রসাদের ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের প্রভূত উন্নতির কারণ হইল। অতঃপর তিনি শিহাড়শোলে গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা কানাইলাল শিহাড়শোলের ৫ মাইল দূরবর্ত্তী চলবলপুরে বাস করিতে থাকেন এবং অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ তথায় বাস করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ গোপাল-লালের ও কনিষ্ঠ পান্নালালের বংশ লোপ পাইয়াছে।

১২৬৮ সালের ১৬ই পৌষ তারিখে গোবিন্দপ্রসাদ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় ৬ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ এবং বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকার আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে গোবিন্দপ্রসাদ উইল করিয়া স্বোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি গৃহ-দেবতা শ্রীশ্রী৺ দামোদর জীউর সেবার্থে দেবোত্তর করিয়া দিয়া যান ও ব্যবস্থা করিয়া যান যে, সকল সময়ে বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেবাইত হইয়া গৃহদেবতার সেবার ব্যবস্থা করিবেন ও বংশের অপরাপরকে ভরণপোষণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত উইলের দ্বারা পত্নীকে দত্তকপুত্রগণের অনুমতি প্রদান করিয়া যান। কাশ্মীরী সারস্বত ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত স্বনামধন্য কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত গোবিন্দপ্রসাদের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। কলিকাতার বিখ্যাত প্রাচীন আপকার কোম্পানির প্রসিদ্ধ আলেক্জান্দার আপকার এবং শম্ভুনাথ গোবিন্দপ্রসাদের উইলের একজিকিউটর ছিলেন।

গোবিন্দপ্রসাদের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী শ্রীমতী দাড়িম্ব দেবী উইলের বিধানানুসারে শ্রীশ্রী৺ দামোদরচন্দ্র জিউর সেবাইতরূপে শিহাড়শোল ষ্টেট্ গ্রহণ করেন। তিনি গোবিন্দপ্রসাদ-কৃত উইলের প্রোবেট গ্রহণ করেন নাই এবং দৌহিত্রগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-

দাড়িম্ব দেবী

পরায়ণা ছিলেন বলিয়া দত্তকপুত্রও গ্রহণ করেন নাই। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র বিশ্বেশ্বর এই সময় হইতে বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করেন। গোবিন্দপ্রসাদ জীবিত কালে যে সমস্ত উন্নতির সূচনা করিয়া যান, দাড়িম্ব দেবী বিশ্বেশ্বরের সাহায্যে সেই সূচনা পরিপুষ্ট করিয়া সম্পত্তির চরমোন্নতি সাধন করেন। এই সময় ষ্টেটের বার্ষিক আয় ন্যূনাধিক ৫ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। দাড়িম্ব দেবী স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক বংশের সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ যথাযথরূপে রক্ষা করিয়া যান। অবশেষে তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গলাভ করেন।

২ নং

সিঙ্গুর মালিয়া বংশ

মহারাণী হরসুন্দরী।
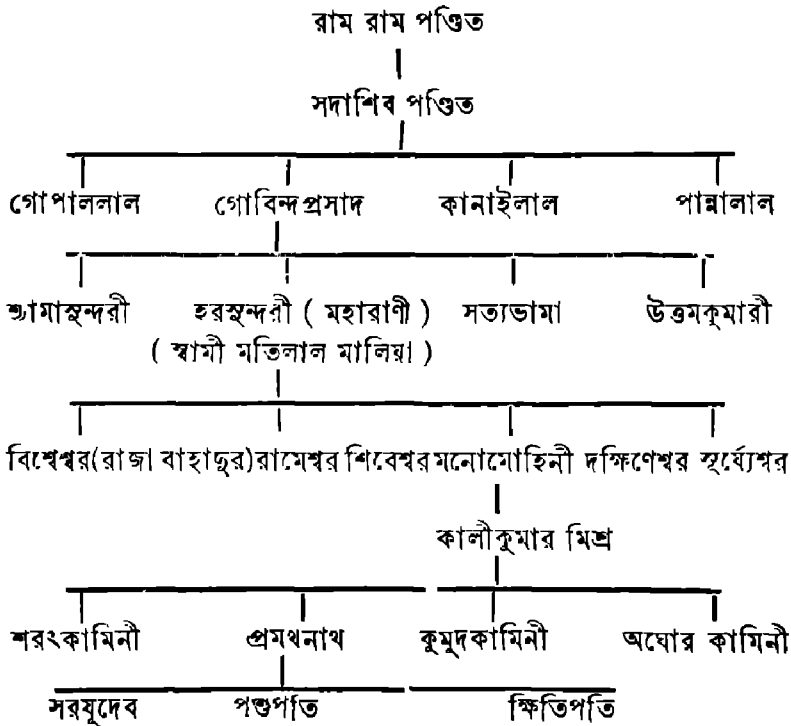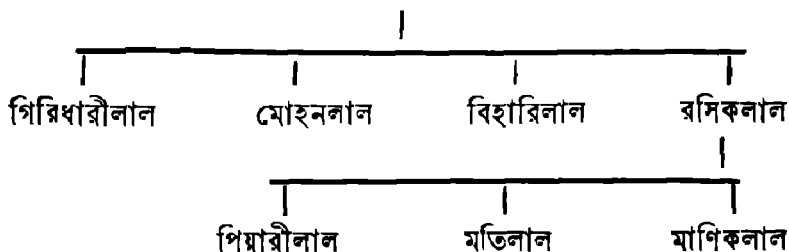
দাড়িম্ব দেবীর মৃত্যুর সময় হরসুন্দরী ও উত্তমকুমারী কন্যাদ্বয় জীবিতা ছিলেন। হরসুন্দরী জ্যেষ্ঠা ও পুত্রবতী বিধায় সমগ্র ষ্টেট সেবাইতরূপে গ্রহণ করেন। হুগলি জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর গ্রাম শিহাড়শোল রাজষ্টেটের বর্ত্তমান মালিক মালিয়াদিগের পৈত্রিক বাসস্থান। তত্রত্য রসিকলাল মালিয়ার মধ্যমপুত্র মতিলাল মালিয়ার সহিত শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবীর পরিণয় হয়। অবগত হওয়া যায় যে, এই মালিয়া মহাশয়েরা স্বনাম-প্রসিদ্ধ সিঙ্গুড়ের শ্রীনাথ বাবু ওরফে নবাব বাবুর বংশীয়গণের পৌর-হিত্য করিতেন। গোবিন্দপ্রসাদের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ১২৬৯ সালে মতিলালের মৃত্যু হয়। বিধবা হইবার পর হরসুন্দরী জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বেশ্বরের সহায়তায় দক্ষতার সহিত সমস্ত বৈষয়িক কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন ও রাজকীয় সম্মান লাভ করেন।

বিশ্বেশ্বর হুগলি জেলার জগদ্বল্লভপুর গ্রাম-নিবাসী সীতানাথ জোসীর কন্যা শ্রীমতী গোলাপকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রজাপুঞ্জের উন্নতিসাধনকল্পে তিনি নানাপ্রকার হিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন

রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়া।

ও সাধারণহিতকর কার্য্যে তিনি প্রাণের সহিত যোগদান করিতেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল এবং জমিদারীপরিচালনকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্যও পরিলক্ষিত হইত। জনসাধারণের নিকটে ও রাজদরবারে বিশ্বেশ্বরের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। রাজ-প্রতিনিধি নর্থব্রুকের সময় বঙ্গদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহার প্রশমনকল্পে মাতা হরসুন্দরী ও পুত্র বিশ্বেশ্বর প্রভূতরূপে নানাবিধ সাহায্য করেন। তাঁহাদের এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণ-মেণ্ট ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হরসুন্দরীকে 'রাণী' এবং বিশ্বেশ্বরকে 'রাজা' উপাধি দান করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যে দিল্লী দরবারে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিটন হরসুন্দরীকে 'মহারাণী' এবং বিশ্বেশ্বরকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই সময় গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল, এবং ইহার অল্পকাল পরেই ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ৩৩ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে রাজা বাহাদুর বিশ্বেশ্বর লোকান্তরিত হইলেন। তিনি মৃত্যু-কালে মাতা, দুই কনিষ্ঠ সহোদর, বিধবা পত্নী, একমাত্র পুত্র প্রমথ-নাথ, এবং শ্রীমতী শরৎকামিনী ও কুমুদকামিনী নাম্নী কন্যাদ্বয় রাখিয়া যান।

বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুর পর রামেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদের ফলে এবং মহারাণী ও পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিবিধ গোলযোগে ষ্টেটের কার্য্য যথাযথকালে সম্পন্ন না হওয়ায় উহার বিশেষ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে এই বিবাদ-নিবৃত্তির জন্য মহারাণী স্বর্গীয় গোবিন্দপ্রসাদ-কৃত উইলের মর্ম্মনির্দ্ধারণ-মানসে এক মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। উহার বিচারফলে

গোবিন্দপ্রসাদ যে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়াছিলেন তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং স্থির হয় যে, ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে সকলে ভোগ করিবেন এবং গৃহদেবতা শ্রীশ্রীদামোদরচন্দ্র জীউর সেবার খরচ মূল সম্পত্তি হইতে হইবে। এইরূপে গোবিন্দপ্রসাদের উইলের মর্ম্ম রূপান্তর গ্রহণ করিল। অতঃপর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৬১ বৎসর বয়সে পুত্রদ্বয় রামেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর, কন্যা মনোমোহিনী এবং রাজাবাহাদুরের পুত্র প্রথমনাথকে রাখিয়া মহারাণী হরসুন্দরী পরলোক গমন করেন।

রামেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর।

মহারাণীর মৃত্যুর পর কুমার রামেশ্বর ও কুমার দক্ষিণেশ্বর উভয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। এই সময় ভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যে পুনরায় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ষ্টেটের নানারূপ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর বর্দ্ধমানের সবজজ আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। যখন এই মোকর্দ্দমা বিচারাধীন ছিল তখন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমথনাথ ও ভাগিনেয় কালীকুমার মিশ্র উভয়ে ষ্টেটের রিসিভার নিযুক্ত হন।

কুমার দক্ষিণেশ্বর সিঙ্গুর-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ জোশীর কন্যা শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। দক্ষিণেশ্বর উদারপ্রকৃতি ছিলেন। দেশের প্রধান প্রধান লোকের নিকট এবং সমাজে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। আশ্রিত লোকদিগের প্রতি তিনি বড়ই সদয় ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও লোকপ্রিয়তায় সকলে মুগ্ধ হইত। তিনি রাণীগঞ্জের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। খনি-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট হইতে যে 'মাইনস্ কমিসন' বসে দক্ষিণেশ্বর উহার একজন সুযোগ্য মেম্বর ছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে মার্চ্চ তারিখে তিনি হাওড়া ৬নং কলেন প্রেস ভবনে পরলোক গমন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী শ্রীমতী ভবসুন্দরী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন।

কুমার রামেশ্বরও পূর্ব্বোক্ত অন্নদাপ্রসাদ জোসী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। রামেশ্বর দক্ষিণেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রাণী ভবসুন্দরীর সহিত আপোষে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলেন এবং অতঃপর শিহাড়শোল রাজষ্টেট বিভক্ত হইয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ের পৃথক অধিকারভুক্ত হইল। রামেশ্বর ভারতের নানাদেশ ও লঙ্কাদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন। প্রাচীন শিল্পকলায় ও উদ্যানকার্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। দেশীয় ও বিদেশীয় সরকারী ও বেসরকারী লোকের মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ২০,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে হাওড়ায় "রামেশ্বর মালিয়া পশুচিকিৎসালয়" স্থাপন করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত পুরীধামের কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি সাধারণহিতকর কার্য্যগুলি তাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ। তিনি হাওড়ার পিপ্‌ল্‌স্‌ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট, হাওড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার এবং বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হাওড়ার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি দুরারোগ্য দুষ্ট ব্রণরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে ৬২ বৎসর বয়সে হাওড়ায় ৭ নং কলেন প্রেস ভবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় রাণী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী তাঁহার সম্পত্তির বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিণী।

রামেশ্বর ও রাণী ভবসুন্দরী।

রাণী ভবসুন্দরী রাণী শ্যামাসুন্দরীর কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। সাধারণ-হিতকরকার্য্যে রাণী অনেক অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। আসান-সোল হাঁসপাতালের উন্নতি-কল্পে ১৬০০০৲ টাকা; হাওড়ার হাঁসপাতালে রোগীদিগের স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত 'ইলেক্ট্রীক্' বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ৫০০০৲ টাকা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া মহা সমারোহে রৌপ্যময় তুলা পুরুষ দান করিয়াছিলেন, এই কার্য্যে তাঁহার লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হয়। অতঃপর তিনি হাওড়ায় শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাওড়ায় ৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও সেবার জন্য ন্যূনাধিক ৪০,০০০৲ টাকা দান করিয়া এক ট্রাষ্ট্ ফণ্ড করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, কুমার প্রমথনাথ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে নভেম্বর তারিখে রাণী ভবসুন্দরী হাওড়ায় ৬নং কলেন প্রেস ভবনে ৺গঙ্গালাভ করেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় কুমার প্রমথনাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন।

রাণী ভবসুন্দরী ও শ্যামাসুন্দরী।

রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তৎকৃত একখানি উইলের প্রোবেট লইবার জন্য রাণী শ্যামাসুন্দরী হুগলির জজের নিকট প্রার্থনা করেন। কুমার প্রমথনাথ তাহাতে আপত্তি করায় উভয়ের মধ্যে মীমাংসা হইয়াছে যে, রাণী শ্যামাসুন্দরী তাঁহার স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হিন্দু বিধবার সম্পত্তিস্বরূপ ভোগ করিবেন, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন। শ্যামাসুন্দরী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে

রাণী শ্যামাসুন্দরী ও কুমার প্রমথনাথ

কুমার প্রমথনাথ মালিয়া

ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীর স্মরণার্থ শালিখায় গঙ্গাতীরে শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি হাওড়ায় কলেজ স্থাপন জন্য ৪০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শিহাড়শোল-রাজবংশের বর্ত্তমান বংশধর অর্দ্ধ রাজষ্টেটের স্বত্বাধিকারী ও অপরার্দ্ধের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার পিতা রাজা বাহাদুর বিশ্বেশ্বরের লোকান্তর হয়, তখন কুমার নবম বৎসর বয়সের বালক মাত্র ছিলেন। মাতা রাণী শ্রীমতী গোলাব সুন্দরী শিহাড়শোল রাজবংশের আদর্শচরিত্রা কুলবধূ ছিলেন। তিনি সন্তানগণের চরিত্রগঠনের জন্য সবিশেষ যত্ন লইতেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, সৎপাত্রে বিশ্বাস ও গুণের মর্য্যাদারক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণের মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি ছিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় পরদুঃখে দুঃখিত হইত এবং তিনি পরদুঃখ-নিবারণকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এই মহীয়সী মহিলার জন্য অদ্যাপি লোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। কুমার প্রমথনাথ এই দেবীপ্রকৃতি জননীর নিকট থাকিয়া শৈশবে শিক্ষালাভ করেন। মহারাণী হরসুন্দরীর জীবিতকালে রাজা বিশ্বেশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় কুমার প্রমথনাথের সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব ছিল না। রাণী ভবসুন্দরীর মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তি পাইতেন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এবং সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে প্রমথনাথকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। তিনি এণ্ট্রান্স ও এফ-এ পাশ করিয়া যখন বি-এ পড়িতেছিলেন তখন স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাকে কলেজ ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ পঞ্জাব প্রদেশের রাউলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত গুজরান খাঁন্-নিবাসী পণ্ডিত দেওয়ানচাঁদ বক্সীর কন্যা শ্রীমতী

রামবক্ষী দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে পত্নীবিয়োগ হইল। অতঃপর প্রায় ১০ বৎসর পরে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের কাংড়া জেলার অন্তর্গত ধামেটা গ্রামের পণ্ডিত শুভকরণ পরাশরের কন্যা শ্রীমতী কৃষণ দেবীকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে কুমার সাহেবের এক কন্যা ও দুই পুত্র। পঞ্জাবের গুজরান্‌ওয়ালা জেলা-নিবাসী পণ্ডিত বালমুকুন্দ সেহজীর পুত্র শ্রীমান্ দোয়ারকা নাথ সেহজীর সহিত কন্যা শ্রীমতী সরযূ দেবীর শুভ পরিণয় হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক শ্রীমান্ পশুপতিনাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র একাদশবর্ষবয়স্ক শ্রীমান্ ক্ষিতিপতিনাথ এক্ষণে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

কুমার প্রমথনাথ অধুনা ষ্টেটের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এতদঞ্চলের অধিকাংশ কয়লাভূমি এই ষ্টেটের অন্তর্গত। ভূসম্পত্তি অপেক্ষা কয়লার খনি হইতে ষ্টেটের অধিক আয় হইয়া থাকে এবং ক্রমেই এই আয় বৃদ্ধি হইতেছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় ইঁহাদের জমিদারী আছে, এবং শিয়াড়শোল ভিন্ন চলবলপুর, হাওড়া, দেওঘর, জসিডি, রাঁচি ও কাশীতে বাড়ী আছে। কুমার বাহাদুর লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে দেওঘরে এক সুদৃশ্য উদ্যানসমন্বিত সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সমগ্র সাঁওতাল পরগণার ভিতর এরূপ মনোরম উদ্যানবাটিকা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অধুনা দেওঘরে এই উদ্যানবাটিকা সাধারণের দর্শনীয় বস্তু হইয়াছে।

রাজবাটীতে শ্রীশ্রীদামোদরচন্দ্র জীউ নারায়ণশিলা প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকেন। গোবিন্দপ্রসাদ শাক্ত ছিলেন, কিন্তু মালিয়া-বংশীয়েরা বল্লভাচার্য্যপন্থী বৈষ্ণব। ইঁহাদের দীক্ষাগুরুগণ গোকুলে ও মথুরায় বাস করেন। রাজবাটীতে দোল, দুর্গোৎসব, রাস, রথযাত্রা, সরস্বতীপূজা
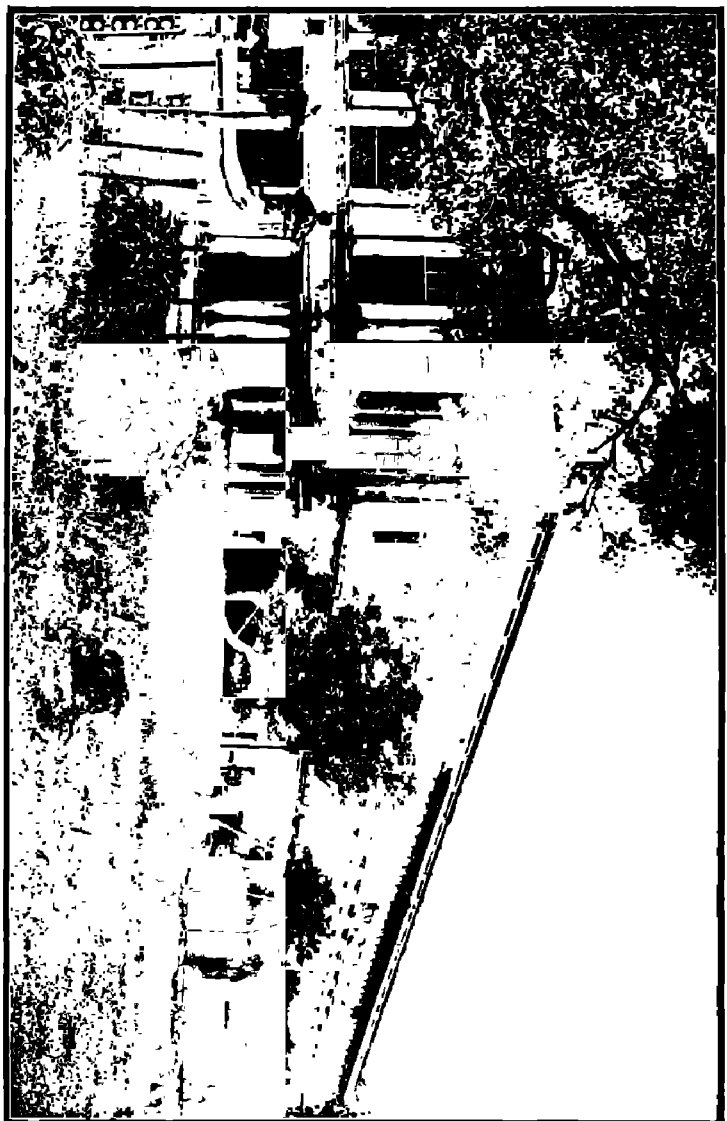
এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। বর্ত্তমান সময়ে কুমার সাহেব গৃহদেবতা শ্রীশ্রীদামোদর চন্দ্র জিউর সেবাইত হইয়াছেন।

হিতকর কার্য্যের বিবরণী ঃ—

(১) সদাব্রত—প্রাতঃকাল লইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমাগত অতিথিগণকে ও তাহাদের সঙ্গী ভারবাহী পশুদিগকে উপযুক্ত আহার্য্য দ্রব্য ও রন্ধনপাত্র বিতরণ করা হয়। ব্রাহ্মণ অতিথিগণ ঠাকুরবাড়ীতে দামোদরচন্দ্র জিউর প্রসাদ পাইয়া থাকেন।

(২) ধর্ম্মশালা—এখানে পথিকগণ বিশ্রাম ও রাত্রিযাপন করিতে পারেন।

(৩) রাজ উচ্চ ইংরেজি স্কুল—এই স্কুল মাইনর স্কুলরূপে স্থাপিত হয়। অধুনা ছাত্রগণ সামান্য বেতন দিয়া ম্যাট্রিকুলেশন্ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করে।

(৪) চতুষ্পাঠী—এখানে ছাত্রদিগকে আহার্য্য ও বাসস্থান দিয়া রাখিয়া উপযুক্ত অধ্যাপক দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হয়।

(৫) রাজা বিশ্বেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়—এখানে প্রত্যহ সমাগত রোগিগণ এসিণ্টাণ্ট্ সার্জ্জনের নিকট ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইয়া থাকে।

(৬) অসহায় পীড়িত সাহায্য ভাণ্ডার—এই ভাণ্ডার হইতে অসহায় পীড়িতদিগকে ঔষধ, পথ্য, এবং চিকিৎসার ব্যয় পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।

কুমার সাহেব প্রথমা পত্নীর স্মরণার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর বেদ ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত যে দুইটী প্রবন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইবে সেই সেই রচয়িতার প্রত্যেককে একটী করিয়া সুবর্ণপদক পুরস্কার

দেওয়া হইবে। সাধারণের হিতকর কার্য্যে কুমার সাহেবের বিশেষ যত্ন আছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে রাণীগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর কমিশনার এবং ডিস্‌পেন্সারি কমিটীর সভ্য ছিলেন; অধুনা দেওঘর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আজ প্রায় ২১ বৎসর কাল কুমার বাহাদুর সাহেব রাণীগঞ্জের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন এবং এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি একাকী বসিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। অধুনা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্যকল্পে তিনি বাঁকুড়া ও দেওঘর 'দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে' বিশেষ সাহায্য এবং সন্ধি-উৎসব উপলক্ষে রাজবাটীতে সমাগত দরিদ্র-দিগকে ন্যূনাধিক ১২০০ খণ্ড নববস্ত্র এবং সহস্রাধিক টাকা নগদ এবং চাউল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিতরণের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।
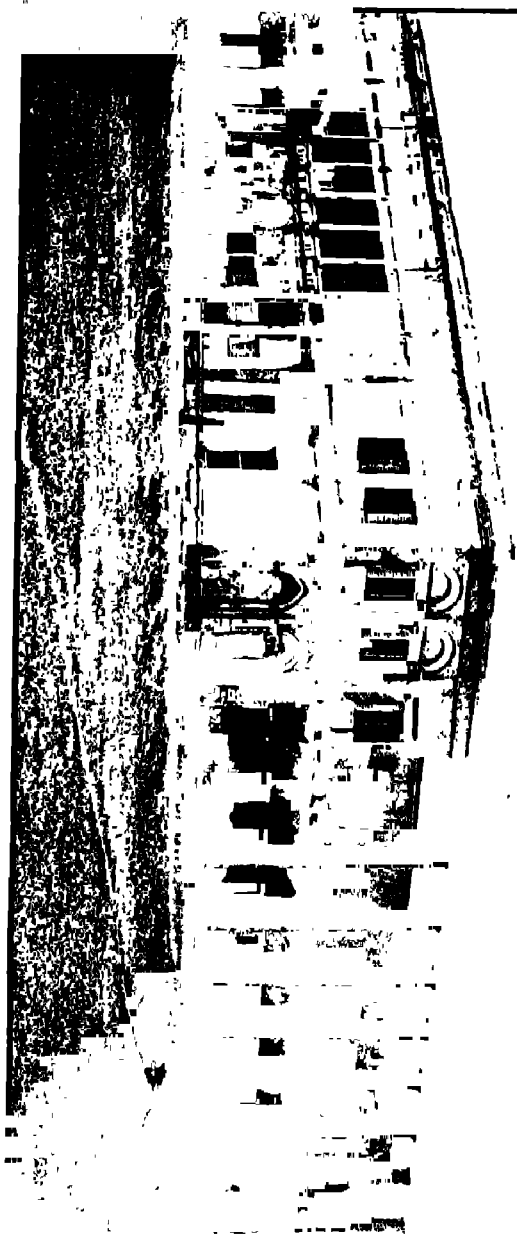
দিঘাপতিয়া-রাজবংশ।

দিঘাপতিয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম দয়ারাম রায়। ইনি স্বাবলম্বী ছিলেন এবং আত্মচেষ্টায় উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে দয়ারামের জনক-জননী পরলোক গমন করেন। কথিত আছে, এই সময়ে ইনি নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা রামজীবন রায়ের নজরে পড়েন। মহারাজা রামজীবনের জমিদারীর নাম ছিল রাজসাহী জমিদারী। তখনকার কালে এই জমিদারী পরিভ্রমণ করিতে ৩৫ দিন লাগিত। ভারতবর্ষ হইতে সেই সময়ে যত রেশম বিদেশে রপ্তানি হইত, তাহার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এই রাজসাহী জমিদারী হইতে উৎপন্ন হইত। মহারাজা রামজীবনের অনুজ রঘুনন্দন নবাব মুরশীদকুলি খাঁর দেওয়ান ছিলেন। এই নবাব মুরশীদকুলি খাঁই নাটোর রাজবংশের উপর অনুগ্রহের পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের মহারাজা রামজীবন রায় তখনকার কালের বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজা রামজীবন দয়ারামের মুরুব্বি ছিলেন; সুতরাং উন্নতির পথ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া যাইতে বিলম্ব ঘটিল না। বিশেষতঃ দয়ারাম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, কার্য্যকুশল, অদম্য-সাহসী, অতীব সৎ ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন; এই সকল গুণের অধিকারী বলিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে নাটোর-রাজের দেওয়ান-পদে উন্নীত হইলেন। অনতিবিলম্বে নবাবের দরবারেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইল; তিনি রাজ্যের রায়-রায়ান হইলেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত মামুদপুর ভূষণার রাজা

প্রতিষ্ঠাতা।

সীতারাম রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। সুবাদারী সেনার অধিনায়ক আবু তোরাব সীতারামকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হন; কিন্তু সীতারাম তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। ইহাতে নবাব বিচলিত হইয়া মহারাজা রাম-জীবনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাজা রামজীবনের আদেশে দয়ারাম সসৈন্যে রাজা সীতারাম রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া নাটোর-রাজবাড়ীতে আনীত হন। এই সঙ্গে দয়ারাম রাজা সীতারামের বিপুল ধন-সম্পত্তিও লুণ্ঠন করিয়া নাটোরের মহারাজের নিকটে আনয়ন করেন। এই লুণ্ঠিত বিপুল সম্পত্তির মধ্যে দয়ারাম কেবল রাজা সীতারামের গৃহবিগ্রহ কৃষ্ণজীর মূর্ত্তিটী গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির সমুদয় মহারাজা রামজীবনকে দেন। তখনকার কালে এরূপ নির্লোভ ব্যক্তি দেখা যাইত না। কাজেই মহারাজা রামজীবন দয়ারামের এই সাধুতা ও নির্লোভতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান দিঘাপতিয়া-রাজবাড়ী যেখানে, সেইখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজীর জন্য একটী মন্দির নির্ম্মিত হইল; মহারাজা রামজীবনই দয়ারামকে দিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ঠাকুরের সেবার জন্য যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করিলেন। এই দেবোত্তর সম্পত্তি এবং দয়ারামের কার্য্যকুশলতার পুরস্কাররূপে মহারাজা রামজীবন কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজসাহী ও যশোহর জেলায় অবস্থিত কয়েকটি তালুকই বর্ত্তমান দিঘাপতিয়া রাজ এষ্টেটের বীজস্বরূপ। এক্ষণে দিঘাপতিয়া রাজ-এষ্টেট বা জমিদারী বাঙ্গালার ১৮টি জেলায় রহিয়াছে। দিঘাপতিয়ার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজীর সেবা অদ্যাপি জাঁক-জমকের সহিত হইয়া থাকে।

রাজা সীতারামের বিরুদ্ধে অভিযান

গৃহদেবতা

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রামজীবনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি দেওয়ান দয়ারামকে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পোষ্য পুত্র রাজা রাধাকান্তের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যান। দয়ারাম রাজা রাধাকান্তেরও দেওয়ান ছিলেন এবং তিনি অকালে পরলোক গমন করিলে দয়ারাম তাঁহার বিধবা পত্নী স্বনামপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর দেওয়ান হন। ইঁহারই সময়ে দয়ারাম বৃদ্ধ বয়সে দেওয়ানের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাণী ভবানী ও দয়ারাম

রাণী ভবানী দয়ারামকে এত বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার অসংখ্য দানপত্রে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে তিনি দয়ারামকে ক্ষমতা দিয়াছিলেন। রাণী ভবানী দানে মুক্তহস্তা ছিলেন। তিনি সকল সদনুষ্ঠানেই অর্থসাহায্য করিতেন। রাণী ভবানী লোকহিতকর কার্য্যে অসঙ্কোচে অর্থ দান করিতেন ; এই দান-ব্যাপারের সহিত দেওয়ান দয়ারামের অবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা ছিল। এই কারণে এবং তাঁহার নিজের বহু দানের জন্য তাঁহার নাম লোকে বিশেষতঃ রাজসাহীর অধিবাসিগণ এখনও পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। দেওয়ান দয়ারাম সকলের সম্মানের পাত্র ছিলেন এবং তখনকার কালে বাঙ্গালার মুখ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে দয়ারাম পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচটী কন্যা ও একমাত্র পুত্র জগন্নাথকে রাখিয়া যান। যে সকল তালুক দয়ারাম তাঁহার বংশধরগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন সেইগুলি সমস্তই মহারাজা রামজীবন বা রাণী ভবানীর দান।

জগন্নাথ পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন বটে, কিন্তু অনতি-বিলম্বেই ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। শুনা যায়, এই

দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালাদেশের সমগ্র অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একদিকে প্রজার মৃত্যু ও অপর দিকে ভূমির করনির্দ্ধারণে কঠোর ব্যবহার—বাঙ্গালার জমীদারদিগের অবস্থা তখন বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িল। দয়ারাম অতি-মাত্রায় ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার তালুকের এক ছটাক জমিও তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বা সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে ক্রীত ছিল না; তাঁহার সমস্ত তালুকই নাটোর-রাজপরিবারের দান। সুতরাং তিনি নগদ টাকা এমন বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহাতে এই সঙ্কটকালে তিনি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে পারেন। কাজেই নৈরাশ্যে তিনি জমিদারী বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নন্দরাণী জমিদারী-রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন,—'খামার' জমির উপস্বত্ব হইতে আমি সংসার চালাইব, আপনি প্রজাদিগের নিকট হইতে যত খাজনা আদায় করিবেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদান করুন। এই উপায়ে নন্দরাণী জমিদারী রক্ষা করিলেন বটে; কিন্তু এইরূপ দুঃখকষ্টভোগে জগন্নাথের পুত্র-কন্যাগণ অনভ্যস্ত ছিল; কাজেই তাঁহার ষোলটি সন্তানের মধ্যে পনেরটী ইহসংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পরলোকগমন করিল এবং একটীমাত্র সন্তান জীবিত রহিল। ইহার নাম প্রাণনাথ রায়।

জগন্নাথ।

প্রাণনাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি নাবালক বলিয়া কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ তাঁহার সম্পত্তির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। প্রাণনাথ মৃগয়া-কুশল ছিলেন। মৃগয়া বা শিকার কার্য্যে তাঁহার প্রভূত অনুরাগ ছিল। এইজন্য তিনি সাজগোজওয়ালা ভাল ভাল হাতী, ঘোড়া, শিকারী কুকুর,

প্রাণনাথ

বাজপাখী প্রভৃতি রাখিতেন। তিনি অত্যন্ত সৌখীন ছিলেন এবং অত্যন্ত খরচ করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধু কাশিম-বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথকে তখন লোকে 'বাবু' আখ্যা দিয়াছিল। সে সময়ে 'বাবু' উপাধি বড় গৌরব ও সম্মানের বস্তু ছিল। প্রাণনাথ নিঃসন্তান ছিলেন এবং প্রসন্ননাথ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রসন্ননাথ

প্রাণনাথের মৃত্যুর পর প্রসন্ননাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ইনি লোকহিতৈষী ও দানশীল ছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি নাটোর হইতে রামপুর বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত একটী রাস্তা তৈয়ারীর জন্য ৩৫ হাজার টাকা দান করেন। দুই বৎসর পরে ইনি দিঘাপতিয়ায় 'প্রসন্ননাথ একাডেমি' নামক একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপিত করেন; এই স্কুলের নাম এক্ষণে 'প্রসন্ননাথ এইচ্, ই, স্কুল' হইয়াছে। এই বৎসরেই (১৮৫২ খৃষ্টাব্দে) নাটোরের দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রসন্ননাথ একাডেমির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং রামপুর বোয়ালিয়ায় একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণ-মেণ্টের হস্তে—১,০৪,৫৬৭৲ টাকা প্রদান করেন। প্রসন্ননাথের এই দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া লর্ড ড্যালহৌসী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে গবর্ণমেণ্ট রাজা প্রসন্ননাথকে রাজসাহীর এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত করেন এবং একজন জমিদার ও ২০জন বরকন্দাজ দ্বারা গঠিত একদল পুলিশ তাঁহার আদেশাধীন করিয়া দেন। রাজা প্রসন্ননাথ প্রমথনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। প্রমথনাথ দয়ারামের এক কন্যার বংশধর। প্রসন্নন থ দিঘাপতিয়ায় 'প্রসন্ন কালীমন্দির' নির্ম্মাণ করেন। যে বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয় সেই বৎসর মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। এই মন্দিরে প্রত্যহ ১০০ লোকের আহারের ব্যবস্থা তিনি করিয়া

গিয়াছেন ; এই ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য তিনি পর্য্যাপ্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি দিঘাপতিয়া রাজষ্টেটের আয় যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান রাজ-বাড়ীর নির্ম্মাতাও তিনি।

রাজা প্রসন্ননাথের সহধর্ম্মিণীর নাম রাণী ভবসুন্দরী। স্বামীর ন্যায় তিনি দানশীলা ছিলেন এবং বহু সদনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিতেন।

রাণী ভবসুন্দরী

তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, সেই সময়ে তিনি দিঘাপতিয়া-রাজবংশের গৌরব ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি বোয়ালিয়ার

প্রমথনাথ

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের (Boalia Charitable Dispensary) জন্য ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহার পিতৃদেব নাটোর-বোয়ালিয়া-রোড নামক যে রাস্তা তৈয়ারী করাইয়া গিয়াছিলেন, উহার সংস্কারের ব্যয়ভারও তিনি বহন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ বোয়ালিয়া সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা-বিদ্যালয়ে ৬৪০০৲ টাকা দান এবং তিনটি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। প্রমথনাথ তাঁহার পিতার ন্যায় লোকহিতৈষী এবং দানশীল, কিন্তু বহু বিষয়ে তিনি উদারনৈতিক ছিলেন। তিনি কার্য্যধুরন্ধর ; প্রণালীবদ্ধভাবে বা সংঘ বা মণ্ডলী গঠন করিয়া কার্য্য করিতে পারদর্শী। নায়কত্ব করিবার গুণ তাঁহার জন্মগত ছিল বলিলেই চলে। দেশের লোকে আত্মচেষ্টা ও স্বাবলম্বনের সাহায্যে আপনাদের কল্যাণ-সাধন করুক—ইহাই তাঁহার কামনা। এই উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিতেন বলিয়াই তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে

স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর।

"রাজসাহী এসোসিয়েসন্" নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা প্রমথনাথ "রাজসাহী এসোসিয়েসনের" নামে এবং উহারই মারফতে রাজসাহী কলেজকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। রোড ও পাবলিক ওয়ার্কস সেস্ বিল পাশ হইবার সময়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রভূত পারদর্শিতা ও পটুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লোক-হিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের কল্পনা জল্পনা করিয়াছিলেন, এবং দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তির নানা উপায় কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু অকাল-মৃত্যুর জন্য সে সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা প্রমথনাথ আদর্শ জমীদার ও আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। এখনও রাজসাহী জেলার লোকে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে। তিনি বাঙ্গালার প্রজা ও জমীদার সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনে তাহার কয়েকটি গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একটী উইল করেন। তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সমস্ত সম্পত্তি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে এবং স্বোপার্জ্জিত বহু সম্পত্তি তাঁহার তিন কনিষ্ঠ পুত্রকে দিয়া যান।

প্রমদানাথ

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রমদানাথ রায় সাবালক হন এবং কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জমিদারী পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ইনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত খাজনার আয় এমনভাবে বৃদ্ধি করেন যে, তাহাতে প্রজাগণের কোনও কষ্ট হয় নাই। তিনি রাজসাহী

ডিস্‌পেন্‌সারী বা দাতব্য-চিকিৎসালয়ের উন্নতি-সাধনের জন্য ২৫ হাজার টাকা, নাটোর ডিস্‌পেন্‌সারীবাড়ী পুনঃ-নির্ম্মাণের জন্য ৭ হাজার টাকা এবং প্রাণনাথ হাইস্কুলের বাড়ীটি পুনঃ-নির্ম্মাণের জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করেন। লেডী ডফারিণ ফণ্ডে তিনি ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। দিঘাপতিয়া স্কুলের পরিচালনাভার সম্পূর্ণভাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা উপাধি লাভ করেন। পরলোকগতা সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলির স্মরণার্থ রাজসাহীতে রেশম-তৈয়ারী-বিদ্যা শিখাইবার জন্য একটী স্কুল (Rajshahi Sericultural School) স্থাপিত হয়, সেই সময়ে এই স্কুলের জন্য তিনি রাজসাহী সহরে ৩৪ বিঘা জমি দান করেন। একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে ৮০ বিঘা জমি প্রদান করেন; এই জমির মূল্য ২০ হাজার টাকা হইবে। রাজসাহী কলেজে তিনি যে জমি দান করিয়াছেন তাহারও আনুমানিক মূল্য ২৫ হাজার টাকা। তিনি বগুড়া জেলার নাওখিলা গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল এবং দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বগুড়া জেলায় দিঘাপতিয়া রাজবংশের বিপুল জমিদারী আছে। এই নাওখিলা গ্রাম ঐ জমিদারীর সদর। তিনি নানা প্রকারে স্বগ্রামের বিবিধ উন্নতি-সাধন এবং তথায় একটি বৃহৎ দাতব্য-চিকিৎসালয় ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে তিনি মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকেন ও দুর্ব্বৎসরে প্রজাগণকে টাকা অগ্রিম দিয়া থাকেন। তিনি আধুনিক-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং বর্ত্তমান যুগের আদর্শ-অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পের পর তাঁহাকে দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হয়; এই সঙ্গে কয়েকটি

নারেবল রাজা প্রমদানাথ রায়।

নূতন ঠাকুরবাড়ী তিনি তৈয়ারী করাইয়া দেন। দিঘাপতিয়া, কলিকাতা এবং দার্জ্জিলিং সহরে তাঁহার যে সুসজ্জিত সুবৃহৎ বাটী এবং সেই সকল বাটীর সংলগ্ন যে উদ্যান ও শষ্পাবৃত অঙ্গন আছে, সেগুলি দেখিলেই রাজা প্রমদানাথের রুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তা স্যর ল্যান্সেলট হেয়ার তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। দিঘাপতিয়ায় প্রথমবার ছোটলাটের আগমন-ব্যাপারকে স্মরণীয় করিবার জন্য স্যর ল্যান্সেলট হেয়ার প্রাসাদের সম্মুখে একটি বটবৃক্ষ রোপণ করিয়া যান। রাজা প্রমদানাথ রাজসাহী এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি। বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে যে ভীষণ সময় উপস্থিত হয় সেই সময়ে তিনি নানা প্রকারে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন। রাজসাহী জেলায় বিপ্লব ও রাজবিদ্রোহ-দমন-ব্যাপারেও তিনি গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়া অচল-রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্প্রসারিত ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বপ্রথম জমিদারগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের জমিদারগণের প্রতিনিধি-স্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, তথাপি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের কর্ত্তব্য অতি উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিয়া ছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-হিসাবে তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহযোগিগণের সহিত দিল্লী দরবারে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আনুগত্য ও রাজভক্তি-জ্ঞাপনের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের সহিত পংক্তিভোজনের সম্মান তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজসাহী কলেজের জন্য একটী নূতন ছাত্রাবাস-নির্ম্মাণকল্পে তিনি সম্প্রতি ১২ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

রাজা প্রমদানাথের তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে পরলোকগত কুমার বসন্তকুমার রায় এম-এ, বি-এল্, মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন।

প্রমদানাথের ভ্রাতৃগণ।

তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল; তদবধি আর তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মপ্রবণ; সকল প্রকার সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও ইনি নিস্পৃহ এবং একরূপ সন্ন্যাসীর ন্যায় সংসারে অবস্থান করিতেন। রাজসাহী কলেজের নূতন ছাত্রাবাস-নির্ম্মাণের জন্য তিনি ১৮ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

কুমার বসন্তকুমার বর্ত্তমান ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি ইংরেজী সাহিত্য, সংস্কৃত, দর্শন এবং ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বদেশের কল্যাণের জন্য প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে আড়াই লক্ষ টাকা রাজসাহী কলেজে, ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা রাজসাহী সহরের বালিকা বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি কল্পে এবং জলের কল নির্ম্মাণে,এবং দয়ারামপুরের মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৩০ টাকা এবং কর্ম্মচারী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকেও অনেক টাকা দিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সম্বন্ধে নাটোরের মহারাজ শ্রীযুত জগদিন্দ্রনাথ রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"রাজসাহী জেলায় স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার বসন্তকুমার রায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে শোক-

সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কুমার বসন্ত-কুমার তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অকাল মৃত্যুর দুঃসহ শোকে যৌবনারম্ভেই সংসারধর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছিলেন, সেই জন্য একান্ত আপনার জন ব্যতীত, সংসার তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণরাশির বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া রাজকুমারেরা চারি ভ্রাতা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাধীনে বাল্য এবং ছাত্রজীবন অতি-বাহিত করিয়াছিলেন;—এই ছাত্রজীবনেই বসন্তকুমার বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও চরিত্রের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় শ্রীমন্ত ঘরের আদরের দুলালগণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য না হইলেও, দুঃসাধ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ এম-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত যতগুলি পরীক্ষা আছে, তাহার সকল গুলিতে তিনি কায়ক্লেশে কেবল মাত্র উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলেন তাহা নহে, কোনও পরীক্ষাতে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানের নিম্নে আর তাঁহাকে যাইতে হয় নাই। বি-এ পরীক্ষায় সাহিত্য এবং দর্শনে 'ডবল অনার্স' লইয়াও অনায়াসে তিনি পার হইয়া গিয়াছেন; সর্ব্বাপেক্ষা নীরস যে ব্যবহারশাস্ত্র, তাহার পরীক্ষাতেও তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বান্ধব-মণ্ডলী এবং আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ট ভাবে জানিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবলমাত্র পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিবার জন্য বসন্তকুমারের একান্ত পক্ষপাতী হন নাই;—যৌবনারম্ভে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান হইয়াও তিনি যে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, ইহা অনেকের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলেও হয়ত বা নিতান্ত অসাধ্য নহে; কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং সুস্থ সুন্দর সবল ও নীরোগ এই রাজনন্দন, দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ক্রম কালে স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সঙ্গসুখ হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হইয়াও, নিজের

চরিত্রের নির্ম্মলতা যেরূপ ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে, কেবল তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণ কেন, আপামর সাধারণ সকলেই একান্তভাবে তাঁহার গুণমুগ্ধ হইতে হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিভব, যৌবন ও প্রভুত্ব—ইহার একটিতেই যে অনর্থ উৎপাদন করে ইহা শাস্ত্র-বচন, এবং সকলগুলি একাধারে বিদ্যমান থাকিলে, উৎসন্নের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় ইহাও মহাজনের পরম সত্য, অভ্রান্ত ও অস্খলিত বাণী। কিন্তু বসন্তকুমারের জীবনে ইহার সকল-গুলির একত্র সম্মিলন অমৃত উৎপাদন করিয়াছিল। বাইশ বৎসরের উন্মুখ যৌবন, মোহময় সংসারের অদম্য প্রলোভন এবং অফুরন্ত কুবের ভাণ্ডার—ইহারা কেহই বসন্তকুমারকে তাঁহার যোগী-জীবনের কণ্টকময় কঠোর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

স্ত্রীবিয়োগের মরণাশৌচের দিন হইতে বসন্তকুমার যে হবিষ্যান্ন আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বদেশে বিদেশে, রোগে স্বাস্থ্যে, কোন স্থানে বা অবস্থাতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি একদিনের জন্যও করেন নাই। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ 'ক্যান্সার' ব্যাধি যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন চিকিৎসকের আদেশেও তাঁহার ভোজ্য-ভোজনাদি যাবতীয় কার্য্যের কোন ব্যতিক্রম তিনি ঘটিতে দেন নাই। ফলতঃ ইন্দ্রিয়-দমন, আচার-নিষ্ঠা, ধর্ম্মে আস্থা, কর্ম্মফল ও অদৃষ্টে বিশ্বাস এবং দয়া দাক্ষিণ্য পর-হিতৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার চরিত্রকে সত্য সত্যই মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বোপরি, তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে সংযম এবং ইন্দ্রিয়-দমনের শক্তি দেখিয়া, তাঁহাকে পুরাণোক্ত ভারতীয় ঋষিগণের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। সময় ও অবস্থাবিশেষে মুনির মনও টলিয়াছে, ঋষি-চিত্তও চঞ্চল হইয়াছে, যোগিজনেও যোগপথভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু ষট্‌চত্বারিংশ-বর্ষব্যাপী বসন্তের জীবনে এক মুহূর্ত্তের

অন্যও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই, বারেকের জন্যও তাঁহার পদস্খলন হইতে পারে নাই।

বসন্ত তাঁহার জীবনবসন্তেই প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনায় একান্ত কাতর হইয়া সংসারধর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও আভিজাত্যের বলে তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা সংসারের অপরাপর কর্ম্মে যে স্থান অধিকার করিয়া যে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হয় নাই। সেই জন্য তাঁহার যোগী-হৃদয়ে দেশপ্রীতি এবং পরহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি যে কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার একান্ত আপনার জন ব্যতীত অপরে জানিতে পারে নাই। এম্-এ, বি-এল পাশ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তিনি সংসার হইতে সুদূরে সরিয়া নিভৃত পল্লী-নিকেতনে নিতান্ত নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্বীয় জীবিকার জন্য অতি সামান্য অর্থেরই প্রয়োজন হইত। তাঁহার বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির উপস্বত্বের অধিকাংশ যাহা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজসাহী কলেজের Chair of Agricultureএর জন্য সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহী কলেজে কুমার বসন্তের পিতা রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের অর্থেই একরূপ স্থাপিত। সেই কলেজের প্রতি বসন্তের অকৃত্রিম প্রীতি কি পরিমাণে ছিল, তাহা এই দান হইতে বুঝিতে পারা যায়। বিপত্নীক নিঃসঙ্গ জীবনের রোগে স্বাস্থ্যে সুসময়ে অসময়ে যাহারা এই রাজকুমারের সেবা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুকালে কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিয়া যান নাই—সকলকেই যথাযোগ্য দান করিয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ পঁচিশ হাজার টাকা পর্য্যন্তও দানরূপে তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে।

এই ইন্দ্রিয়-সংযমী মহাপ্রাণ পুরুষের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে

আজ যে অকৃত্রিম সুহৃৎকে হারাইল, আর কবে কে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করতঃ এই অভাবের বেদনা ভুলাইয়া দিবে তাহা তিনিই বলিতে পারেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে যাহা যায় তাহা শীঘ্র আর ফিরিয়া আইসে না; যেমনটি আমরা হারাই, তেমনটি আর কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই; বিয়োগের বহ্নিজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র আমাদের সম্বল নিভৃত নিশীথের অশ্রুনিষেক। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির নিয়মে বসন্তের অভাবে তাঁহার স্বজনবর্গের যে ক্ষতি আজ হইল, দেশবাসী আমাদের ক্ষতি তদপেক্ষা কম নহে। সহানুভূতিতে যদি কোন সান্ত্বনা হয়, সেই আশায় শোকার্ত্ত রাজপরিবারকে আমরা আমাদের একান্ত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি; এবং শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, বিয়োগ-বেদনাতুর বসন্তের বিরহী হৃদয় যেন প্রিয়-মিলনের নির্ম্মলানন্দে আনন্দ লোকে চিরশান্তি লাভ করে।"

কুমার শরৎকুমার রায় এম্-এ বঙ্গসাহিত্যের বিখ্যাত লেখক, বঙ্গ-সাহিত্যের অকপট সুহৃদ্, সাহিত্যোৎসাহী, সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু। প্রাচীন স্থাপত্যকলায় ইঁহার প্রভূত অনুরাগ। ইনি ইটালি, মিশর ও ভারতের ঐতিহাসিক পুরাকীর্ত্তি ও স্থাপত্যসমূহ এবং ইউরোপের সুবৃহৎ যাদুঘরসকল দেখিয়া আসিয়াছেন। ইনি বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতির প্রতিষ্ঠাতা। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পুরাবস্তুশালা পরিদর্শন করিয়া বাঙ্গালীর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল অতীব প্রীত হইয়াছিলেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির জন্য ইনি অকাতরে সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন; এই অনুষ্ঠানে ইনি একরূপ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুমার শরৎকুমার রাজসাহী জেলার দয়ারামপুরগ্রামে বাস করেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় চিত্রকলার অনুরাগী। ইনি ইউরোপের প্রসিদ্ধ চিত্রশালাগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইনি এক্ষণে রামপুর বোয়ালিয়ায় থাকেন এবং তথাকার লোকের যাহাতে মঙ্গল হয় এমন কার্য্যে ব্রতী হইতে ভালবাসেন।

রাজা প্রমথনাথের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান তাঁহার একমাত্র কন্যা—সুশিক্ষিতা এবং সাহিত্যানুরাগিনী। ইনি দুইখণ্ড বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার স্বামীর নাম শ্রীযুত মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী। ইনি বি-এ উপাধিধারী এবং রাজসাহীর উকীল। ইনি স্থানীয় লোকের হিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া থাকেন।

নলডাঙ্গার রাজবংশ।

নলডাঙ্গা নিম্ন বঙ্গের যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি সুপ্রসিদ্ধ গণ্ড-গ্রাম। আখণ্ডল-বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজগণের বাসভূমি বলিয়া ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই গ্রামখানি ঝিনাইদহ হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ, কালীগঞ্জ থানা হইতে এক ক্রোশ এবং যশোহর হইতে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামখানির উত্তরে খরশুনি, পূর্ব্বে শ্রীমন্তপুর, দুর্গাপুর ও বেগবতী (ব্যাঃ) নদী, দক্ষিণে কাশিগা ও পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভাটপাড়া ও খেদাপাড়া গ্রাম। নলডাঙ্গা গ্রামখানিতে চারিটি ক্ষুদ্র গ্রাম বা পল্লী আছে, যথা খাস নলডাঙ্গা, মঠবাড়ী, কাজীপুর ও গুঞ্জবাড়ী। ইহার অধিবাসিসংখ্যা সাত শত হইবে। মঠবাড়ীতে রাজাদের অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর দেবালয় আছে। গুঞ্জবাড়ীতে, গুঞ্জনাথদেবের সুদর্শন মন্দির ও বিগ্রহ বিদ্যমান। ইহা তৈলকূপি গ্রামে বেগবতী নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। নদীর পশ্চিম তীরেই গুঞ্জ-নগর গ্রাম। এই গ্রামেই বিখ্যাত নলডাঙ্গা রাজগণের প্রাসাদ। গ্রামখানি রাজগণের কীর্ত্তিশালায় বিভূষিত। রাজপ্রাসাদের মধ্যে রাজা বাহাদুরদিগের চণ্ডীমণ্ডপ। ইহা স্থাপত্যশিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন। এইখানে প্রতি বৎসর রাজাদিগের দুর্গোৎসব অত্যন্ত সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজবাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাজার আস্তাবল ও পিলখানা; রাজবাটীটি দেখিতে অতি সুন্দর ও শোভাময়। খাস নলডাঙ্গাতেও রাজগণের অনেক কীর্ত্তি ও সুরম্য হর্ম্ম্য ছিল। তন্মধ্যে রংমহল ও জোড় বাংলাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। নলডাঙ্গা রাজবংশের

স্বর্গীয় রাজা শশিভূষণ দেবরায় রংমহল-প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা বেগবতীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল। দর্শনমাত্রেই ইহা সৌন্দর্য্যে দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিত। রাজা শশিভূষণ দেব রায় ইহা তাঁহার বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ দেবরায় মহোদয় যখন নাবালক ছিলেন, তখন এই প্রাসাদটি বিশেষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছিল। এই সময় রাজগণের গৃহদেবতা ৺ বড় গোপাল ৺ গালিম গোপাল ও ৺ জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ এই রংমহলে স্থাপিত হয়। ঐখানে তখন উঁহার নিত্য পূজা ও সেবা হইত। জোড় বাংলা ও রংমহলের সন্নিহিত একটি সুদর্শন সৌধ ছিল। ইহার ছাদ ইংরেজী M অক্ষরের ন্যায় ছিল। এই সৌধটি রংমহলের সান্নিধ্যে থাকিয়া ইহার শোভা-সম্পদ বর্দ্ধিত করিত। নলডাঙ্গার রাজবংশ গুঞ্জনগরে যাইয়া বাস করিলে এই দুইটি সৌধ ক্রমশঃ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। তখন দেববিগ্রহগুলি রাজগণের নূতন প্রাসাদে নীত হয় এবং পরে সৌধ দুইটি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হয়। নলডাঙ্গার ইতিহাস নলডাঙ্গা রাজ-পরিবারের ইতিহাসের সহিতই বিজড়িত।

কালিকাভক্ত ভৈরবচন্দ্র।

নলডাঙ্গা অঞ্চলে একটি অতি বিস্ময়কর জনশ্রুতি আছে। এই জনশ্রুতির ঘটনা অধিক দিনের পুরাতন নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে অতি অল্পদিন পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন,—দুই একজন এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু ঘটনাটি অতিপ্রাকৃত বলিয়া আমরা ইহাকে জনশ্রুতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এই জনশ্রুতিটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও এই অঞ্চলের সর্ব্বজনবিদিত। ইহাতে এই অঞ্চলের

তান্ত্রিক প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এই স্থানে ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

নলডাঙ্গার দুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে মহারাজপুর গ্রাম। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রামে ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামধেয় জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু সাধারণ শাক্ত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় কঠোর আচারনিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি অনেকটা 'ক্ষ্যাপাটে' ধরণের লোক ছিলেন। পূজা করিতে করিতে তিনি মদ্যপান করিতেন। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া হাত মুখ না ধুইয়া, কাপড় না ছাড়িয়া খাইতেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে অনেকে ভক্তি করিত, তাঁহার অনেক শিষ্যও ছিল। একদিন ভৈরবচন্দ্রের জনৈক শিষ্যের গৃহে কালীপূজা হইতেছিল। ভৈরবচন্দ্র সেই কালীপূজার রাত্রিতে শিষ্যের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন স্বয়ং শিষ্যগৃহে উপস্থিত আছেন, তখন শিষ্য তাঁহাকেই পূজা করিতে আহ্বান করিবেন,—কুলপুরোহিতকে পূজা করিতে বলিবেন না। কিন্তু শিষ্য তাহা করেন নাই। তিনি ভৈরবচন্দ্রের "অনাচার" দেখিয়া মনে মনে কতকটা গুরুর উপর বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন,—সেই জন্য তিনি গুরুকে কোন কথা না বলিয়া পুরোহিতকে পূজা করিতে বলিলেন। ভৈরব চন্দ্র উহাতে আপনাকে অপমানিত মনে করিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। পূজা হইলে যখন বলিদান হয়, তখন বলি 'বাধিয়া' গেল, কর্ম্মকার এক কোপে বলির ছাগ কাটিতে পারিল না। গৃহস্থ ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রমাদ গণিল। তাঁহার মনে হইল যে, ভৈরব চন্দ্রের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে বলির ছাগ 'বাধিয়া' গিয়াছে। দেবী পূজা গ্রহণ করেন নাই। তখন, অমঙ্গল-শঙ্কায় শঙ্কিত শিষ্য ভৈরবচন্দ্রের পদতলে লুটাইয়া

পড়িল, ক্ষমা চাহিল, এবং গুরুকে পুনরায় পূজা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ভৈরব পূজা করিতে সম্মত হইলেন। শিষ্য নূতন করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। কিন্তু যে স্থানে পুরোহিত পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, ভৈরবচন্দ্র সে স্থানে পূজায় বসিলেন না। তিনি প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগে পূজা করিতে বসিলেন। ভৈরব ভট্টাচার্য্য পূজায় বসিয়া দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মাগো পূজা গ্রহণ কর।" সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—প্রতিমা ভৈরব ভট্টাচার্য্যের দিকে ফিরিল। তৎপরে সাধক পূজা শেষ করিলেন। পূজা-সমাপনান্তে তিনি সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা অবিশ্বাসী, এই দেখ দেবী প্রতিমায় আবির্ভূতা হইয়াছেন। তোমরা আরও প্রমাণ দেখিতে চাও?"—এই কথা বলিয়া তিনি কুশির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দ্বারা প্রতিমার দক্ষিণ চরণে আঘাত করিলেন। প্রতিমার চরণ হইতে দর দর ধারায় শোণিত বিগলিত হইতে লাগিল। সমবেত জনতা ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তখন ভৈরবচন্দ্র আসন হইতে উঠিয়া শিষ্যকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন "পাজি! তুমি সবংশে নির্ব্বংশ হইবে!" এই বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি আর কখনও ঐ গ্রামে গমন করেন নাই। এই সাধক ভৈরবচন্দ্র প্রায়ই মঠবাড়ীতে আসিয়া কালিকা দেবীকে পূজা করিতেন। কালিকাতলাদহের পূর্ব্বদিকে কালিকা দেবীর মন্দির ও পঞ্চমুণ্ডী বেদী ছিল। এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়, কোন ব্রাহ্মণ উক্ত বেদীতে বসিয়া সমস্ত রাত্রি দেবীর পূজা করিতে পারিতেন না। অনেক সাধু ব্রাহ্মণ সমস্ত রাত্রি দেবীর পূজা করিতে প্রয়াস পাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ঐ স্থানে পূজক পূজায় বসিলে নিশীথে তাঁহাকে দেবীর যোগিনীগণ কালিকাদহের অপর তীরে নিক্ষেপ করিত। যাহা হউক, ভৈরবচন্দ্র তাঁহার

অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে এক অমানিশীথিনীতে সমস্ত রাত্রি দেবীর পূজা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কালিকাদহ সম্বন্ধেও একটি অদ্ভুত জনশ্রুতি আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত নিশীথে এই দহের গর্ভ হইতে শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দ নির্গত হইত; ধীবরেরা গভীর রাত্রিতে মাছ ধরিতে আসিলে ঐ শব্দ শুনিতে পাইত। লোকে বলিত, দহের অভ্যন্তরস্থিত জল-দেবতাগণ নিশীথে দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বকালে এই দহের জলে "গায়ক মীন" (singing fish) ছিল।

নলডাঙ্গার রাজগণ এই মঠবাড়ীর দেবতাগণের সেবার জন্য তাঁহাদের জমীদারীর কিয়দংশ ঈশ্বর বৃত্তি বা দেবতার সম্পত্তি রূপে দান করিয়াছেন। উহা হইতে মঠবাড়ীর দেবতাদিগের নিত্যপূজা ও সেবা হইয়া থাকে, এবং প্রত্যহ অনাহূত ও রবাহূত অতিথিগণের সেবা হইয়া থাকে। দেবসেবার জন্য অনেক পুরোহিত ও কতকগুলি সেবক আছেন। ইহা ভিন্ন রাজবাড়ীতে অনেকগুলি বিগ্রহ আছে,—রাজগণ তাহারও নিত্যসেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় রাজা অতি সমারোহে দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। সে সময় ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীভোজন, যাত্রা গান প্রভৃতি অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফল কথা, নলডাঙ্গার রাজবংশের দেবসেবা ও অতিথিসেবা চিরপ্রসিদ্ধ।

নলডাঙ্গার রাজবংশ চিরদিনই বদান্যতার জন্য বিখ্যাত। ইহারা নিজব্যয়ে হাইস্কুল ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই স্কুল নলডাঙ্গা ভূষণ হাইস্কুল নামে বিখ্যাত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নলডাঙ্গা-রাজ এই অঞ্চলে একটী মধ্যশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন এদেশে ইংরেজী

বিদ্যা একেবারেই বিস্তার লাভ করে নাই। তাহার পর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ঐ মধ্যশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়টি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়, ইহা ব্যতীত রাজার প্রতিষ্ঠিত টোলে ব্যাকরণ কাব্য স্মৃতি প্রভৃতির বিনা ব্যয়ে অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত এই স্থানে রাজার পাঠশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ে রাজার ব্যয়ে সকলেই ঔষধাদি পাইতে পারেন। প্রতিদিন শত শত রোগী এখানে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন নলডাঙ্গায় একটি সাব পোষ্ট আফিস আছে। নলডাঙ্গা হইতে এক ক্রোশ দূরে কালীগঞ্জে পুলিসের থানা অবস্থিত। নলডাঙ্গা এই কালীগঞ্জ থানারই এলাকাধীন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ অন্যতম। নলডাঙ্গার রাজবংশ এই ভট্টনারায়ণেরই বংশধর। তাঁহাদের বংশতালিকা এইরূপ,—

এই দেবল কৌলিন্য ব্যবস্থার প্রবর্ত্তক রাজা বল্লাল সেনের একজন বিশিষ্ট সভাসদ্ ছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, শাণ্ডিল্য গোত্রের বরাহ বা আদি বরাহই বন্দ্যঘাটী গ্রাম ও বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশের জাম্বূলন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয়জন বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

এখানে প্রথমতঃ একটা কথা বলা আবশ্যক যে, যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, বল্লাল সেন আদিশূরেরই পুত্র,—তাঁহারা বিষম ভ্রম করিয়া থাকেন। কারণ আদিশূরের পর এক পুরুষের মধ্যে ভট্টনারায়ণের সাতপুরুষ গত হইতে পারে না। কেহ কেহ আদিশূরের বংশতালিকা এইরূপ প্রদান করিয়া থাকেন, যথা—
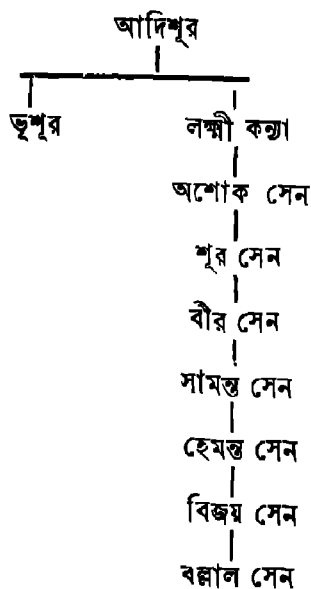
এই হিসাবের সহিত বরং পূর্ব্বলিখিত হিসাবের কতকটা সামঞ্জস্য করা যায়। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবে অপ্রাসঙ্গিক; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, কুলগ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে বল্লাল সেনের সপ্তম বা অষ্টম পুরুষ পূর্ব্বে আদিশূর প্রাতুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক এক্ষণে আমরা নলডাঙ্গা রাজবংশের বংশলতা প্রদান করিব। এই বংশের পূর্ব্বলতিকায় আমরা দেবলের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তৎপরে অন্যান্য ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল। দেবলের পুত্র পণ্ডিত। (মতান্তরে যোগী এবং যোগীর পুত্র পণ্ডিত)।

পণ্ডিত
|
আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য

এই আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য বা হলধর আখণ্ডল ভট্টাচার্য্য কুলপতি আখণ্ডল নামে অভিহিত হইতেন। ইনি এই বংশের প্রধান ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম কুলপতি আখণ্ডল হইয়াছিল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত তেলিহাটী পরগণার এলাকাধীন ভাবরামর গ্রামে বাস করিতেন। আখণ্ডলের তিন পুত্র তপন, প্রিয়ঙ্কর ও সন্তোষ; এই তপনের বংশেই নলডাঙ্গার রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছে। প্রিয়ঙ্করের বংশেই বিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জন্ম হয়। ইনি তর্কে পরাভূত হইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। স্বর্গীয় হলধর আখণ্ডল হইতেই নলডাঙ্গার রাজবংশের নাম আখণ্ডল-বংশ হইয়াছে। এই বংশে অনেক বিখ্যাত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। বিক্রমপুরস্থিত তারার মজুমদার বংশও এই আখণ্ডল

ভট্টাচার্য্য হইতে উদ্ভূত। জেলা যশোহরের অন্তর্গত ঝুঁতি নামক স্থানের 'রায় মহাশয়েরাও আখণ্ডল বংশীয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তপন হইতে নলডাঙ্গা রাজবংশের উৎপত্তি। তপনের প্রপৌত্র মাধবই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। যথা—
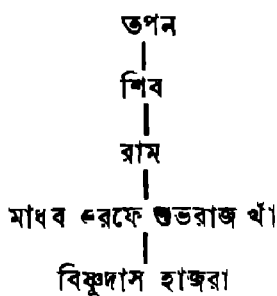
মাধব ভট্টাচার্য্য ওরফে শুভরাজ খাঁ নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। ইঁহা হইতেই শুভরাজ খানি মেলের উৎপত্তি। শুভরাজ খাঁ দেবীবর ঘটকের সমসাময়িক লোক ছিলেন। শুভরাজ খাঁ যখন একটি স্বতন্ত্র মেলের 'প্রকৃতি' ছিলেন,—তখন তিনি যে একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুভরাজ খাঁর পুত্র বিষ্ণু হাজরাই নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রবর্ত্তক।

বিষ্ণুদাস হাজরার অলৌকিক কাহিনী।

শুভরাজ খাঁ ভাবরাসরেই বাস করিতেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র বিষ্ণুদাস হাজরা সংসারে বিরত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং যশোহরের অন্তর্গত কৃষ্ণমুনি নামক স্থানের জঙ্গলে তপশ্চরণ করিতে থাকেন। ঐ স্থানে তখন নিবিড় জঙ্গল ছিল। ইহারই সন্নিহিত নলডাঙ্গায় তখন কেবল নলের বন ছিল। সেই হইতে এই

স্থানের নাম নলডাঙ্গা হইয়াছে। সে সময় ইহার নিকট কোন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঘটনা ক্রমে এক দিন রাজা মানসিংহ নৌকাযোগে এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার লোকজনের রসদাদি ফুরাইয়া যায়। মানসিংহ বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। কারণ তথায় আবশ্যক দ্রব্যাদি মিলিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, তিনি আবশ্যক দ্রব্যাদির সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন।

যে স্থানে সন্ন্যাসী বিষ্ণুদাস ধ্যানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে জনৈক সৈনিক পুরুষ কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের কোলাহলে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সেনানায়ক প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—বাঙ্গালার সুবাদার ঢাকা হইতে রাজমহল যাইতেছেন,—তাঁহার রসদ ফুরাইয়া গিয়াছে, সেই জন্য তিনি আমাদিগকে রসদ-সংগ্রহের জন্য নৌকা হইতে তীরে পাঠাইয়াছেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, ভাল, সুবাদার যদি আমার আতিথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আবশ্যক দ্রব্য সমস্তই দিতে পারি। সেনানায়ক সেই কথা সুবাদারকে জানাইলেন। সুবাদার সন্ন্যাসীর আতিথ্য স্বীকার করিলেন; সন্ন্যাসী সানুচর সুবেদারকে পরিতোষ-রূপে ভোজন করাইলেন এবং যথেষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য সুবাদারকে প্রদান করিলেন। কথিত আছে, বিষ্ণুদাস যোগবলে এই দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মানসিংহ সন্ন্যাসীর এই অসাধারণ তপঃপ্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার বিগ্রহ জালিম গোপালের সেবার জন্য সন্নিহিত পাঁচখানি গ্রাম দান করিলেন। ইহা হইতেই নলডাঙ্গা রাজগণের জমিদারীর পত্তন হইল।

সন্ন্যাসী বিষ্ণু হাজরার বিগ্রহ জালিমগোপাল এখনও নলডাঙ্গার রাজসংসারে সম্পূজিত হইতেছেন।

বিষ্ণুদাসের এক পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহার নাম শ্রীমন্ত দেবরায়। ইনিই উত্তর কালে রণবীর খাঁ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত দীর্ঘাকার, সুদর্শন, চারুবদন, কপাট-বক্ষ ও বীরোচিত গুণযুক্ত ছিলেন। ইনি স্বীয় বীরত্বপ্রভাবে সন্নিহিত বিস্তর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে জনসাধারণ রায় অর্থাৎ রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বিষ্ণুদাস দেবতার অনুগ্রহে এই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; সেই জন্য ইঁহার নামের সহিত দেব এই অভিখ্যা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই শ্রীমন্ত দেব হইতে নলডাঙ্গা রাজবংশের উপাধি হইয়াছে দেবরায়।

শ্রীমন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার বীরোচিত গুণগ্রাম প্রকটিত করিতে লাগিলেন। তিনি স্বদলে বহু সহস্র লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহার দলে বহু সংখ্যক রণকুশল সৈন্য সংগৃহীত হইল। এই সময় বর্ত্তমান কোটচাঁদপুরের সান্নিধ্যে স্বরূপপুর নামক এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। তথায় আফগান জমীদারেরা বাস করিতেন। এই অঞ্চল তাহাদেরই জমিদারী ছিল। শ্রীমন্ত দেবরায় সেই পাঠান জমিদারদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের সমস্ত জমিদারী অধিকার করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, পাঠানগণ শ্রীমন্তের সহিত প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধে বিস্তর পাঠান হতাহত হইয়াছিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা প্রাণ লইয়া ঐ অঞ্চল ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। এই প্রকারে শ্রীমন্ত দেব রায় মহাশয় একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন। সেই সময় তিনি বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবাদার রাজা মানসিংহকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া গমন করেন। মানসিংহ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া ওসমান খাঁ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ওসমান খাঁ উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব পাঠান নবাব কত্‌লু খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ওসমান অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালার কিয়দংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন।

ওসমান একজন গুণগ্রাহী ও উদারপ্রকৃতি বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, মহাবীর শ্রীমন্ত দেবরায় মহাশয় স্বরূপপুরের আফগানদিগকে সমরে পরাভূত করিয়া তাহাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী অধিকৃত করিয়া লইয়াছেন, তখন তিনি উক্ত দেবরায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

ওসমান খাঁ শ্রীমন্ত দেব রায়ের সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিলেন,—তাঁহাকে রণবীর খাঁ এই নাম প্রদান করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমন্তদেব রায় মুর্শিদাবাদে যাইয়া মোগল শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। উক্ত মোগল শাসনকর্ত্তাই তাঁহাকে রণবীর খাঁ এই নাম দিয়াছিলেন। এই কথা মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। কারণ ঐ সময়ে বাঙ্গালায় কোন মোগল শাসনকর্ত্তা ছিলেন না, মুর্শিদাবাদের তখন পত্তন হয় নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেই মুর্শিদাবাদ সহরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ খৃষ্টীয় ১৫৮৯ অব্দ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়াছিলেন। রণবীর যখন উক্ত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তখন রাজা মানসিংহ দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তখন রাজ-মহলই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। ইহার পরে মুর্শিদকুলি খাঁ কর্ত্তৃকই মুর্শিদাবাদ সহর

প্রতিষ্ঠিত ও তথায় রাজধানী নীত হইয়া ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ বা জাফর খাঁ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, পাঠানেরাই সাধারণতঃ খাঁ এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। কোন হিন্দু সুবাদার যে হিন্দু জমিদারকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন, ইহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। ওসমান খাঁ ফারসী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাই জানিতেন। সুতরাং তিনিই সংস্কৃত ভাষা হইতে রণবীর এই নাম এবং পারস্য ভাষা হইতে খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ফলে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীমন্তদেব রায় মহাশয় মোগল শাসনকর্তা অথবা রাজা মান-সিংহের নিকট হইতে রণবীর খাঁ এই খেতাব প্রাপ্ত হন নাই,—তিনি পাঠান সর্দ্দার ওসমান খাঁর নিকট হইতে ঐ খেতাব লাভ করিয়াছিলেন।

আফগানগণ বাঙ্গালার কিয়দংশ জয় করিয়া লইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়াই মানসিংহ ত্বরিত গতিতে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। শেরপুরে আফগানদিগের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ওসমান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় আবার মোগল-দিগের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সময় রণবীর রাজমহলে যাইয়া রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার স্বর্গীয় পিতা বিষ্ণুদাস সন্ন্যাসীর নিকট তিনি যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত সুবাদারকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। উদার-হৃদয় রাজা মানসিংহ শ্রীমন্তদেব রায়কে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে একখানি সনন্দ ও বিস্তীর্ণ জায়গীর দিয়াছিলেন। এই প্রকারে রাজা শ্রীমন্তদেব রায় ওরফে রণবীর খাঁ বিশাল মহম্মদ শাহী পরগণার জায়গীরদার হইয়াছিলেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাজা রণবীর খাঁ নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই বৎসরে ভারতে ইংরেজগণ আগমন করেন বলিয়া ইহা ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দেশে আসিয়াই রণবীর নলডাঙ্গায় আপনার বাসের জন্য সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই নলডাঙ্গা সমৃদ্ধিতে ও সৌন্দর্য্যে এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বর্ত্তমানে যে স্থানে নলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ কালিকাতলার দহ অবস্থিত, তাহার নিকটেই একটি বিশাল বট বৃক্ষ আছে। রণবীরের সময় হইতে এই বটবৃক্ষটি এই স্থানে রহিয়াছে বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ লোক 'অক্ষয় বট' বলিয়া থাকে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে একদা বনবীর শিকার করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তখন এই বটবৃক্ষের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি জঙ্গলে আকীর্ণ ছিল। রণবীর সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়াই আসিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় জঙ্গলের মধ্যে এক যোগী কুশাসনের উপর যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। যোগী যোগমগ্ন। তাঁহার দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থাপিত। দেহ স্থির। মন বিভুচিন্তায় মগ্ন। রণবীরের সঙ্গীরা তখন বহু পশ্চাতে ছিল। তিনি একাকী ছিলেন। এই সময় বৃক্ষতলে তিনি ধ্যানমগ্ন যোগীকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই শুভ অবসরে তিনি সেই মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ধীর পদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে সেই ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর সমীপস্থ হইলেন। এই সময় অশ্বটী হ্রেষারব করিয়া উঠিল। পাছে যোগিবর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন,—এই ভয়ে রণবীরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি দূর হইতে কাতর ও বিনয়-নম্রভাবে সন্ন্যাসীকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কুণ্ঠিত ও বিনীত ভাব দেখিয়া সন্ন্যাসী

সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি হস্তদ্বারা রণবীরকে নিকটে আসিবার জন্য সঙ্কেত করিলেন। রণবীর সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীর সন্নিহিত হইলেন। সন্ন্যাসী রণবীরকে দীক্ষা দিবার সঙ্কল্প জানাইলেন। রণবীর সানন্দে তাহাতে সম্মত হইলেন। সন্ন্যাসী তখন রণবীরকে কহিলেন, বৎস! সন্নিহিত কোন জলাশয়ে স্নান করিয়া আইস। রণবীর ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া নিকটে কোন জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে সেই কথা বলিলে সন্ন্যাসী তাঁহার হস্তে একটি কুশ-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গলের বাহিরে কোন খোলা জায়গায় এই অঙ্গুরীটি নিক্ষেপ কর। রণবীর বন হইতে বাহির হইয়া খোলা মাঠে ঐ কুশাঙ্গুরীটি নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র ভূমি হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইল এবং অকস্মাৎ ঐ স্থান বসিয়া যাইয়া তথায় এক গভীর জলাশয়ের সৃষ্টি করিল। এই দহই বিখ্যাত কালিকাতলার দহ। উহা তখন গভীরতায় দেড় শত ফিট বা আশী হাতের কম ছিল না। এখনও এই দহের মধ্যস্থলে ৪০ হাত জল থাকে।

রণবীর দহে স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন; তৎপরে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! আমার নাম ব্রহ্মানন্দ গিরি। আমি উত্তরকালে দুই একবার তোমার বংশধরদিগকে দেখা দিব।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই রণবীর স্বর্গারোহণ করেন।

রণবীর খাঁর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ গোপীমোহন দেবরায়, কনিষ্ঠ গন্ধর্ব্ব দেবরায়। গন্ধর্ব্ব দেবরায় নিঃসন্তান ছিলেন। গোপীমোহনের তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে রতিনাথ দেবরায় সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইহারই বংশধর অভিলাষচন্দ্র দেবরায় ও কৈলাশচন্দ্র রায় মঠ-বাড়ীর পশ্চিমস্থিত খেদাপাড়া গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। মধ্যম রাঘব দেবরায়ের

কোন সন্তান ছিল না। জ্যেষ্ঠ রামদেব দেবরায়ের তিনটি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম চণ্ডীচরণ দেবরায়। মধ্যম রাধাকান্ত ওরফে রাধাবল্লভ দেব রায়, কনিষ্ঠ লক্ষ্মীকান্ত দেবরায়। লক্ষ্মীকান্ত নলডাঙ্গার ৪ মাইল উত্তর পশ্চিমস্থিত মহারাজপুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। বনমালী রায় প্রভৃতি এই লক্ষ্মীকান্ত দেবরায়েরই বংশধর। রাধাকান্ত দেবরায়ও খেদাপাড়ায় যাইয়া বাস করেন। ইঁহারই বংশে চন্দ্রকান্ত রায় প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ দেবরায়ই নিজের উদ্যমশীলতার ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীচরণ দেবরায় অসাধারণ বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও চরিত্রবান ছিলেন। তিনি নিজের সৌজন্য ও প্রশান্তচিত্ততার প্রভাবে তাঁহার প্রজাবর্গের ভক্তিপ্রীতি আকর্ষণ করিয়া ছিলেন।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজা কেদার রায়ের সহিত চণ্ডীচরণ দেবরায়ের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা কেদারেশ্বর সন্নিহিত এক বিস্তীর্ণ জনপদের ভূস্বামী ছিলেন। তিনি ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই চণ্ডীচরণ দেবরায় মহাশয়কে তাচ্ছিল্য ও অপমানিত করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ সেই উপেক্ষা নীরবে সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অবিলম্বে এক শত নৌকায় তাঁহার সৈন্যগণকে লইয়া রাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণের সৈন্যদলে কতকগুলি ফিরিঙ্গী ছিল। উহারা পর্ত্তুগীজদিগেরই বংশধর। উহারা অত্যন্ত সাহসী ও কঠোরকর্ম্মা লোক ছিল। অবিলম্বে রাজা কেদারেশ্বরের সহিত চণ্ডীচরণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে রাজা কেদারেশ্বর পরাজিত ও নিহত হন। চণ্ডীচরণ রাজা কেদারেশ্বরের রাজ্য ও গৃহদেবতা দখল করিয়া লইলেন। কেদারেশ্বরের গৃহ-দেবতাই বড় গোপাল। এইবার চণ্ডীচরণ সমস্ত মহম্মদসাহী পরগণার অধিকারী হইলেন।

চণ্ডীচরণ দেবরায় এই সময় বাঙ্গালার একজন বড় জমিদার হইয়া উঠিলেন। তিনি এই বিশাল জমিদারী হস্তগত করিয়া ইহার রাজস্বের উন্নতি-সাধনে ও শাসনের সুবন্দোবস্তে মনোযোগ দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি নলডাঙ্গার ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থিত চাকলা নামক গ্রামে তাঁহার সদর কাছারি স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখন চাকলায় ঐ কাছারী বর্ত্তমান আছে। উহা এখন নলডাঙ্গার জমিদার-বাবুদের এলাকাধীন।

এই সময় সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজাই বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার শাসন-সময়ে বাঙ্গালায় শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চণ্ডীচরণের যশের ও গৌরবের কাহিনী তখন রাজমহলে সুবাদারের দরবার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। চণ্ডীচরণ এই সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি রাজমহলে যাইয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস করিয়াছিলেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ দেবরায় রাজমহলে সুবাদার সুলতান সুজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শাহ সুজা একজন গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি চণ্ডীচরণ দেব-রায়কে বিশেষ সম্মানিত এবং 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। নবাবের নিকট হইতে খেলাৎ ও রাজা উপাধি পাইয়া রাজা চণ্ডীচরণ নবাবকে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

কিছুদিন রাজমহলে থাকিয়া রাজা চণ্ডীচরণ নলডাঙ্গায় প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার আগমনে নলডাঙ্গায় কিছুদিন আনন্দ-মহোৎসব চলিয়াছিল। তাহার পর তিনি নলডাঙ্গায় জোড় বাংলা নামক মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বড় গোপাল ও জালিম গোপাল বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার অল্পদিন পরেই রাজা চণ্ডীচরণ

দেবরায় স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ-দেবরায়ই নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রথম রাজা।

রাজা চণ্ডীচরণের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ, দ্বিতীয় জানকী-বল্লভ, তৃতীয় কালীচরণ এবং চতুর্থ বিশ্বেশ্বর। জানকীবল্লভ নলডাঙ্গার এক ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত কামরাইল গ্রামে এবং বিশ্বেশ্বর কালিকা-তলায় যাইয়া বাস করেন। ইঁহারা উভয়েই নিঃসন্তান ছিলেন। কালীচরণ নলডাঙ্গার দেড় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে গোপালপুর গ্রামে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। ঐস্থানে তাঁহার বংশধরগণ এখনও অবস্থিতি করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ চণ্ডীচরণই এই বিশাল জমিদারীর ও রাজা উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মিষ্ঠ লোক ছিলেন এবং সর্ব্বদা সন্ধ্যাহ্নিক ও পূজায় রত থাকিতেন। এক সময় বণবীর সিংহের গুরু ব্রহ্মানন্দগিরি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের বংশের ইষ্টদেবী কালিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ দেবরায় কাশীধাম হইতে উৎকৃষ্ট ভাস্কর আনাইয়া অতি সুন্দর প্রস্তর হইতে কালিকামূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ঐ মূর্ত্তিকে মঠবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার নাম অনুসারে কালীমাতার নাম "ইন্দ্রেশ্বরী" রাখেন। ঐ মূর্ত্তিই এখন নলডাঙ্গার সিদ্ধেশ্বরী নামে অভিহিত হইতেছেন।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি চারিটি পুত্র রাখিয়া যান। ঐ চারিটি পুত্রের নাম যথাক্রমে সূর্য্য-নারায়ণ, রুদ্রনারায়ণ, রামনারায়ণ এবং কৃষ্ণনারায়ণ। ইঁহাদের মধ্যে রামনারায়ণ ও কৃষ্ণনারায়ণের কোন সন্তান হয় নাই। রুদ্রনারায়ণের বংশধরগণ এখনও নলডাঙ্গার পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে সুঁতি নামক গ্রামে

বসবাস করিতেছেন। স্বরনারায়ণ তাঁহার পিতৃস্থানে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি পিতারই ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

একদা নিশীথে রাজা স্বরনারায়ণ ও তাঁহার রাণী শয়ন-প্রকোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় যেন মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত "স্বরনারায়ণ" "স্বরনারায়ণ" "স্বরনারায়ণ" রব তাঁহার কর্ণে পশিল। একবার, দুইবার, তিনবার, সেই রব তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইলে রাজা স্বর-নারায়ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন,—দেখিলেন সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ দেহ, মস্তক হইতে জটাজাল বিস্তৃত, হস্তে ত্রিশূল, অঙ্গে বিভূতি। সেই তিমিরস্তব্ধ নিশীথে সন্ন্যাসী কি প্রকারে প্রহরীদিগের চক্ষু অতিক্রম করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। প্রকোষ্ঠের দ্বারও ভিতর দিক হইতে রুদ্ধ ছিল। তিনি আরও দেখিলেন যে, উহা পূর্ব্বে যেরূপ রুদ্ধ ছিল, এখনও সেইরূপ রুদ্ধ রহিয়াছে। সেই অবস্থায় রুদ্ধ গৃহে সেই সন্ন্যাসীমূর্ত্তি-দর্শনে রাজা স্বরনারায়ণের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাহার পর সাহসে ভর করিয়া তিনি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কে? কি নিমিত্তই বা এই গভীর নিশায় প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন? সন্ন্যাসী একটু অগ্রসর হইলেন এবং রাজা স্বরনারায়ণের মস্তকে হস্ত দিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"বৎস! আমি ব্রহ্মানন্দগিরি। তোমার পূর্ব্বপুরুষ রণবীর খাঁয়ের গুরু। আমি রণবীরের নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলাম তাহা প্রতিপালন করিবার উদ্দেশ্যেই আমার অতি-প্রাকৃত ক্ষমতাতে এইস্থানে আসিয়াছি। নিশা অবসান হইবার

পূর্ব্বেই আমাকে তোমাদের কুলদেবতা ইন্দ্রেশ্বরীকে মঠবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অতএব আমার সহিত উক্ত মঠবাড়ীতে আইস, এবং আমাকে ঐ ধর্ম্ম-কার্য্য-সাধনে সহায়তা কর।"

রাজা স্বরনারায়ণ সসম্মানে ও ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর অনুগমন করিলেন। সন্ন্যাসী সেই বিগ্রহের পবিত্রতা সাধন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া একটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিলেন এবং উহা মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে রক্ষা করিয়া বলিলেন যে, ঐ ঘৃতপ্রদীপটি দিবারাত্রই জ্বলিবে। উহা কখনই নিবিতে দেওয়া হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উক্ত রাজাকে এই কয়টি বিশেষ উপদেশ প্রদান করিলেন।

(১) দিবানিশি এই ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, ইহা ভবিষ্যতে কখনই নির্ব্বাপিত করা হইবে না।

(২) প্রতিদিন একটি করিয়া ছাগ বলি দিয়া এই দেবীর পূজা করিতে হইবে।

(৩) মন্দিরের সান্নিধ্যে প্রত্যহ অত্যন্ত নিষ্ঠা-সহকারে পোলাও রাঁধিয়া শিখাভোগ দিতে হইবে।

(৪) এই দেবমন্দিরের অঙ্গনে প্রতিদিন অনাহূত ও রবাহূত লোকদিগকে ভোজন করাইতে হইবে।

(৫) অতঃপর এই বিগ্রহ ইন্দ্রেশ্বরী নামে অভিহিত না হইয়া সিদ্ধেশ্বরী নামে অভিহিত হইবেন।

(৬) এই মন্দির হইতে এই বিগ্রহটিকে কখন অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হইবে না।

(৭) উক্ত নিয়মগুলির কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে রাজবংশের পতন হইবে।

এই কয়টি কথা কহিয়া সন্ন্যাসী রাজার গ্রীবাদেশে বাইশ বার

মৃদুভাবে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিলেন "তোমার বংশের আদিপুরুষ হইতে গণনা করিয়া দ্বাবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত এই জমিদারী অবিভক্ত বা অক্ষুণ্ণভাবে চলিবে।"

এই সময় নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী রাজাকে সঙ্গে লইয়া কালিকাদহের দিকে দ্রুত যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়া তিনি জলে নামিলেন। রাজা সুরনারায়ণ তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী জলে দেহ নিমজ্জিত করিলেন, আর উঠিলেন না। রাজা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষায় তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী আর উঠিলেন না।

অতঃপর সেই সন্ন্যাসীকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

রাজা প্রাতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং এই শুভ ঘটনার জন্য অনেক ব্রাহ্মণ, অন্যান্য জাতি ও কাঙ্গালী ভোজন করাইলেন। তিনি সিদ্ধেশ্বরীর পূজার জন্য তাঁহার জমিদারীর একাংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জীবনের অবশিষ্টকাল রাজা সুরনারায়ণ অত্যন্ত শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬৮৫ অব্দে রাজা সুরনারায়ণের দেহান্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাসীর উক্তি সম্বন্ধে একটা বড় জটিল সমস্যা আছে। সন্ন্যাসী এই বংশের আদিপুরুষ বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিলেন। ইহা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, রাজা সূর্য্যনারায়ণের অধস্তন বা তৃতীয় পুরুষ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময় পর্য্যন্ত এই জমিদারী অবিভক্ত ছিল। ভট্টনারায়ণ হইতে গণনা করিলে স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণ দেবরায় পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ পুরুষ না হইয়া ত্রয়োবিংশ পুরুষ হয়। সুতরাং দ্বাবিংশ পুরুষের অধিক এই রাজপরিবারের জমিদারী অবিভক্ত ছিল। ইহা হইতে

কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, স্বরনারায়ণের প্রতি তোমার বংশের আদিপুরুষ বলিয়া সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দগিরি, ভট্টনারায়ণকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি নিশ্চিতই ভট্টনারায়ণের পুত্র বরাহকে—যিনি সচরাচর 'আদি বরাহ' বলিয়া খ্যাত, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহা হইতে গণনা করিলেই স্বর্গীয় কৃষ্ণ দেবরায় পর্য্যন্ত বাইশ পুরুষ হয়। বরাহের নামের পূর্ব্বে আদি শব্দ সংযুক্ত আছে, সেই জন্যই কি সিদ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দগিরি তাঁহাকেই বংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন? অনেকে এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যে ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বঙ্গে তাঁহার বংশের বসবাস পত্তন করিয়া গিয়াছেন সন্ন্যাসী তাঁহাকেই স্বরনারায়ণের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না করিয়া বরাহকেই বা আদিপুরুষ কহিলেন কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, বরাহই প্রথমে বাঙ্গালার আকাশে বাঙ্গালার বাতাসে বাঙ্গালার গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন,—ব্রহ্মানন্দগিরি সেই জন্যই তাহাকে এই 'বাঙ্গালী' বংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সন্ন্যাসী ঠিক ঐরূপ কথাই বলেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমার বংশে বাইশ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা এই উপাধি অক্ষুণ্ণভাবে চলিবে। তাহা হইলে এই বংশের আরও বার পুরুষ 'রাজা' বলিয়া সম্মানিত হইবেন। এই বংশে স্বর্গীয় রাজা চণ্ডীচরণ দেবরায় মহাশয়ই প্রথম রাজা অভিখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে নলডাঙ্গার বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুত প্রমথভূষণ দেবরায় দশম পুরুষমাত্র।

রাজা স্বরনারায়ণের উদয়নারায়ণ, রামদেব, ঘনশ্যাম, নারায়ণ, রামকৃষ্ণ ও রাজারাম এই ছয় পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ রাজা উদয়নারায়ণই

পিতার গদিতে অধিষ্ঠিত হন। রামদেব উদয়নারায়ণের সহিত একত্র ছিলেন। ঘনশ্যাম জমিদারীর একটি সামান্য অংশ তরফ কুশবেড়িয়া লইয়া নলডাঙ্গাতেই সামান্য ভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহারা কুশবেড়িয়ার তালুকদার নামে অভিহিত হইতেন। এই বংশে স্বর্গীয় বিষ্ণুচন্দ্র দেবরায় একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। এখন এই বংশের আর কেহই নাই।

নারায়ণ তরফ বেলওয়ারী তালুকরূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরগণ বেলওয়ারীর তালুকদার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নারায়ণের পুত্র স্বর্গীয় রাজকিশোর দেবরায়; রাজকিশোরের পুত্র বিশ্বেশ্বর দেবরায়, বিশ্বেশ্বরের পুত্র অনঙ্গমোহন দেবরায়। অনঙ্গ-মোহন দেবরায় দানে ঔদার্য্যতায় ও অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণে মণ্ডিত ছিলেন বলিয়া ঐ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নলডাঙ্গা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নলডাঙ্গা হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত চাঁদ্‌ড়া গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ঐ গ্রামে বাস করান, রাজ-পথ নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, ইংরেজী স্কুল ও চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা, ঔষধালয় স্থাপন প্রভৃতি এবং তাঁহার কুলাচারসম্মত সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতেন। এই সকল কার্য্যে তিনি এইরূপ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন যে, তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। সেইজন্য তিনি অত্যন্ত ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার বংশধরের বিশেষ কষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র মথুরেশচন্দ্র দেবরায়, পৌত্র সুরেন্দ্রকুমার ওরফে কালিদাস দেবরায় (ইনি সচরাচর খোকা বাবু বলিয়া পরিচিত) প্রপৌত্র হারাণচন্দ্র দেবরায়। ইহার আয় এখন অতি অল্প।

রাজা সূরনারায়ণের পঞ্চম পুত্র স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ দেবরায় সমস্ত

জমিদারী হইতে 'চেঙ্গা' নামক একখানি মাত্র গ্রাম লইয়া ছিলেন। এই বংশীয় ভূস্বামিগণ চেঙ্গার তালুকদার নামে পরিচিত। পূর্ণচন্দ্র রায় এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।

সুরনারায়ণ দেবরায়ের ষষ্ঠ পুত্র, রাজারাম দেবরায় নিঃসন্তান ছিলেন।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজা উদয়নারায়ণ দেবরায় নলডাঙ্গার গদিতে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় জমিদারীতে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। নিজে জমিদারীর কাজকর্ম্ম কিছুই দেখিতেন না। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে নবাবের দরবারে তাহার নিকট অনেক টাকা খাজনা বাকি পড়িয়াছিল। সেই সময় সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব। সায়েস্তা খাঁ রাজা উদয়নারায়ণ দেবরায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সওয়ার (কাপ্তেন) সামসের খাঁকে প্রেরণ করেন। সামসের খাঁ অবিলম্বে রাজাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নলডাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। রাজা উদয়নারায়ণ বুঝিলেন, ব্যাপার বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সামসের খাঁর সহিত বন্ধুত্ব করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। রাজা সামসের খাঁকে অনেক টাকা ও বহুমূল্য উপঢৌকন দিলেন। সামসের খাঁও রাজার সহিত কোনরূপ শত্রুতা না করিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব করিলেন এবং কিছুদিন পরমসুখে উভয়ে নলডাঙ্গায় কাল কাটাইলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজা উদয়নারায়ণ দেবরায়ের দ্বিতীয় ভ্রাতা রামদেব রায় উদয়নারায়ণের সহিত একত্র ছিলেন। কিন্তু রামদেব উদয়নারায়ণকে মনে মনে অত্যন্ত হিংসা করিতেন। তিনি এই সময় উদয়নারায়ণের সহিত সামসের খাঁয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য এক বিরাট ষড়যন্ত্র পাকাইলেন। একদা গভীর রজনীতে তিনি কতকগুলি

গুণ্ডা দ্বারা সামসের খাঁর শিবিরে ইষ্টক প্রস্তর ভাঙ্গা, হাঁড়ি, কলসী, হাড় প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত করাইলেন। তাহার ফলে সামসের ও তাহার লোক-দিগের বড়ই উদ্বেগ ও অসুবিধা জন্মিল। পরদিন প্রভাতে রামদেব স্বয়ং যাইয়া সামশের খাঁয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, উহা রাজা উদয়নারায়ণেরই কাজ। সামশের খাঁ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু রামদেব তাহাকে নানাপ্রকারে উহা বুঝাইয়া দিলেন। সামশেরও সে কথা বিশ্বাস করিলেন। রামদেব সামশেরকে ইহাও বলিলেন যে, উদয়নারায়ণ অন্যায় উপায়ে সামশেরকে হত্যা করিতেও পারেন। ইহা শুনিয়া সামশেরের মনে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে সংবাদ দিয়া রাজবাড়ীতেই উদয়নারায়ণের সহিত দেখা করিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ সানন্দে সামশেরকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন,—এমন সময় সামশের এক গুপ্ত ছুরিকার দ্বারা উদয়নারায়ণকে বিদ্ধ করিলেন। সেই আঘাতেই রাজা উদয়নারায়ণ পঞ্চত্ব পাইলেন। রামদেবের ষড়যন্ত্র সফল হইল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। সামশের রামদেব রায়কে জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রদান করিয়া নলডাঙ্গা পরিত্যাগ করিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ দেবরায়ের পুত্র রামচন্দ্র দেবরায় এই প্রকারে পিতার জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়া তরফ জোড়াদহ নামক সামান্য একটু তালুক পাইলেন। তিনি জোড়াদহের তালুকদার নামে অভিহিত হইতেন। রামচন্দ্রের ভৈরবচন্দ্র, জগন্নাথ ও নীলকণ্ঠ নামে তিন পুত্র জন্মে। ভৈরবচন্দ্র দেবরায় মহেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মে; সেই পুত্রের নাম ফকিরচাঁদ দেবরায়। ফকিরচাঁদ জয়দুর্গা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই,

তিনি যাদবচন্দ্র দেবরায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। যাদবচন্দ্রের দুই বিবাহ; তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম ভুবনমোহিনী দেবী; দ্বিতীয়া পত্নীর নাম হরিবালা দেবী। তাঁহাদের উভয়েরই সন্তানাদি না হওয়াতে যাদবচন্দ্র কেশবচন্দ্র দেবরায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের পত্নীর নাম হেমাঙ্গিনী দেবী। কেশবচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, জিতেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ নামে চারি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল।

রামচন্দ্র দেবরায়ের দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথ দেবরায় কালীকুমার দেবরায় নামক একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। কালীকুমারের পুত্র রাজীবলোচন। রাজীবলোচনের চারি পুত্র; চন্দ্রভূষণ, ভবভূষণ, কুলদাভূষণ ও বিদ্যাভূষণ। ইহার মধ্যে শেষোক্ত তিন ভ্রাতা ভবভূষণ, কুলদাভূষণ এবং বিদ্যাভূষণ নিঃসন্তান ছিলেন। কেবল জ্যেষ্ঠ চন্দ্রভূষণের পুত্র হইয়াছিল। চন্দ্রভূষণের পত্নীর নাম রাখদাসুন্দরী দেবী। তাহাদের পুত্রের নাম গিরিজাভূষণ দেবরায়।

রামচন্দ্র দেবরায়ের তৃতীয় পুত্র নীলকণ্ঠ দেবরায়ের পুত্র তারিণীচরণ দেবরায়, তারিণীচরণের পুত্র হরভূষণ দেবরায়। হরভূষণ প্রভাসচন্দ্র দেবরায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। প্রভাসচন্দ্রের পুত্র কালিদাস দেবরায় হরিমতি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিভূতিভূষণ দেবরায় ইহাদের পুত্র।

রামদেব দেবরায় ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে নলডাঙ্গার জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। তিনি তাঁহার কুলদেবতাদিগকে অনেক জমি দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে, নানা জাতীয় ধার্ম্মিক লোককে ব্রহ্মত্র, বৈদ্যত্র, বৈষ্ণবত্র, মহাত্রাণ, পিরোত্র ও লাখরাজ জমি দান করেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বৈষ্ণব, শূদ্র, পীর ও মুসলমান সকলকেই তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি মঠবাড়ীতে রামেশ্বরী নামে এক বিগ্রহ স্থাপনা করেন। ঐ

বিগ্রহ-স্থাপনাকালে তিনি বিশেষ জাঁকজমক করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের নাম অনুসারেই তিনি ঐ দেবীমূর্ত্তির রামেশ্বরী নাম দিয়াছিলেন। উহার নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। রামদেব দেবরায় দানশৌণ্ড বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

এই সময় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ অত্যন্ত কঠোর হস্তে বাঙ্গালার জমিদারদিগের নিকট হইতে যথাসময়ে কর সংগ্রহ করিতেন। জমিদার-দিগের খাজনা বাকী পড়িলে তিনি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেন। মুর্শিদকুলির নাতিনী-জামাই সৈয়দ রেজা খাঁ উৎপীড়নের এক অভিনব উপায় আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি একটি স্বল্প বিস্তৃত খাত খনন করিয়া উহা বিষ্ঠা প্রভৃতি দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র জিনিষে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন এবং উপহাস করিয়া উহাকে 'বৈকুণ্ঠ' বলিতেন। যে সকল জমিদার খাজনার টাকা দিতে না পারিতেন, তাঁহাদিগকে কোমরে দড়া বাঁধিয়া বিষ্ঠাপূর্ণ হ্রদে ফেলিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। রাজা রামদেব দেবরায়ও কয়েক বৎসর খাজনা দিতে পারেন নাই। নবাব তাঁহার নিকট বার বার হিসাব চাহিলেও তিনি তাহা দাখিল করেন নাই। সেইজন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ রাজা রামদেব রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একজন সেনানায়কের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রাজা রামদেব পূর্ব্বেই এই সংবাদ পাইয়া ছিলেন। সুতরাং সৈন্যগণ নলডাঙ্গায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি নলডাঙ্গা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্নিহিত এক গ্রামে লুকাইয়া রহিলেন। নবাবের সৈন্যদল নলডাঙ্গায় আসিয়া রামদেবের সাক্ষাৎ পাইল না। সেনানায়ক পনর দিন পর্য্যন্ত নলডাঙ্গায় উপস্থিত ছিলেন,—কিন্তু রাজার কোন সন্ধান মিলিল না। তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গেলেন এবং নবাবকে জানাইলেন যে,রাজা রামদেবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

নবাব সৈন্য মুর্শিদাবাদে উপনীত হইবার অল্পকাল পরেই রাজা রামদেব স্বয়ং মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে হাজির হইলেন,—এবং সৈয়দ রেজা খাঁয়ের 'বৈকুণ্ঠে'র ভয়ে ভীত হইয়া জমিদারী ইস্তফা করিতে চাহিলেন। নবাব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাজা রামদেব দেবরায়ও স্বহস্তে নবাবকে একখানি ইস্তফানামা লিখিয়া দিলেন।

যে সময় রাজা রামদেব দেবরায় এই জমিদারী ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার আমমোক্তার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন না। এই সময় রাজধানীতে নবাবের দরবারে প্রত্যেক জমিদারের একজন করিয়া আমমোক্তার থাকিতেন। তাঁহারা জমিদারের প্রতিনিধিস্বরূপ নবাবের সহিত কাজকর্ম্ম করিতেন। নলডাঙ্গা রাজার আমমোক্তার ছিলেন নন্দওয়ালী গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ দাস। যে সময় রাজা ইস্তফানামা লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ দাস মফস্বলে ছিলেন। পরদিন তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া সমস্ত জানিতে পারিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নবাবকে অনেক মিনতি করিয়া সেই ইস্তফাপত্রখানি দেখিতে চাহিলেন। ইস্তফাপত্রখানি তখনও নবাবের নিকট ছিল। তিনি সেখানি আমমোক্তারের হাতে দিলেন। আমমোক্তার শ্রীকৃষ্ণ দাস মনে মনে স্থির করিলেন যে, যদি উহা কোনরূপে নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে ইস্তফাকার্য্য অসিদ্ধ হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কাগজখানি গুটাইয়া মুখের মধ্যে পুরিলেন, এবং উহা গিলিয়া ফেলিলেন। ক্রুদ্ধ নবাব প্রভুভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিবার জন্য প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন। নির্ম্মম প্রহারে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য লোপ পাইল। তখন তাহারা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিল। শ্রীকৃষ্ণের দেহ জাহ্নবীতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিল।

যে সময় এই ব্যাপার ঘটে, সে সময় রাজা রামদেব মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করেন নাই। নিয়তির এমনই বিস্ময়কর বিধান যে, সেই সময় তিনি জাহ্নবী-জীবনে অবগাহন করিয়া স্নান করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে একটি নরদেহ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে ঐ দেহটি তুলিতে বলিলেন। দেহ উত্তোলিত হইল। হরি হরি! এ যে তাঁহারই আমমোক্তার শ্রীকৃষ্ণেরই দেহ। উহার সর্ব্বাংশে দারুণ প্রহার-চিহ্ন। কিন্তু রাজা ও রাজবৈদ্য দেখিলেন যে, জীবন তখনও যায় নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া সযত্ন শুশ্রূষার পর শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য হইল। ক্রমে তিনি সকল কথাই রাজাকে কহিলেন। রাজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নলডাঙ্গায় লইয়া আসিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা তাঁহার প্রভুভক্ত আমমোক্তারের নিকট 'কল্পতরু' হইলেন। অর্থাৎ তিনি এক ঘণ্টাকাল সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিলেন যে, এই সময় আম-মোক্তার শ্রীকৃষ্ণ দাস যাহা চাহিবেন, তিনি তাহাকে তাহাই দিবেন। ধার্ম্মিকপ্রবর আম-মোক্তার মহাশয় অধিক কিছুই চাহিলেন না। রাজা তাঁহার গৃহে একটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দাস সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিগ্রহ স্থাপন এবং তাঁহার সেবার জন্য কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। রাজা সেই প্রভুভক্ত সেবকের ইচ্ছা পূর্ণ মাত্রায় পূর্ণ করিয়াছিলেন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর আকাঙ্ক্ষা কত কম ও প্রভুভক্তি কত প্রবল ছিল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের বংশধরগণ এখনও "ইস্তফা পেলা দাস" বলিয়া সম্মানিত। তাঁহাদের বাসস্থান "মাগুরা" মহকুমার "নন্দ আলি" গ্রাম। সেইজন্য ইঁহারা নন্দ ওয়ালীর ইস্তফা পেলা দাস বলিয়া পরিচিত।

যাহা হউক, ইহার পর রাজা রামদেব দেব রায় বাকী রাজস্ব ক্রমশঃ কিস্তিবন্দী হিসাবে দিতে সম্মত হইলে পর নবাব তাঁহাকে তাঁহার জমিদারী ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার রাজস্ব-আদায়ের কতকটা সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত সুবা বাঙ্গালাকে কতকগুলি চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক চাকলার বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশের রাজস্ব-আদায়ের ভার এক একজন জমিদারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। রাজসাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, নলডাঙ্গা (মামুদসাহি) প্রভৃতি অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার এক একজন হিন্দু রাজা বা জমিদারের উপর অর্পিত হয়। ইহার ফলে ঐ সকল জমিদার বা রাজা ধনাঢ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের এই আদায় তহসিলের কার্য্যও কৌলিক করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে দিনাজপুর, নদীয়া, নলডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানের রাজারা ধনাঢ্য হইয়া উঠেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত রাণী ভবানীর স্বামী রাজা রামকান্ত রাজসাহীর রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। রাজা রামনাথ দিনাজপুর, রাজা রঘুরাম নদীয়া এবং রাজা রামদেব নলডাঙ্গার বা মামুদসাহীর রাজস্ব আদায়ের ভার পাইয়াছিলেন। নবাব হিন্দুদিগের উপরই রাজস্ব-আদায়ের ভার দিতেন। তাহার কারণ হিন্দুরা শান্ত, বশ্যতা-ভাবাপন্ন ও হিসাব দক্ষ।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামদেব দেবরায় দেহত্যাগ করেন। রাজা রামদেবের রঘুদেব রায় ও কৃষ্ণদেব রায় নামক দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রঘুদেব রায়ই জমিদারীর উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইনিও অনেক ব্রাহ্মণ-সজ্জনকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। যে সময় রঘুদেব রায় নলডাঙ্গার জমিদার ছিলেন সেই সময় নবাব সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার মসনদে আসীন ছিলেন। যশোবন্ত সিংহ তাঁহার

মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শাসন-দক্ষতায় বাঙ্গালা সুখ-সমৃদ্ধিতে যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে, নবাব সায়েস্তা খাঁয়ের আমলে (খৃষ্টীয় ১৬৬২-১৬৮৯) বাঙ্গালায় টাকায় আট মণ চাউল বিকাইয়াছিল, কিন্তু নবাব সুজাউদ্দীনের আমলে বাঙ্গালায় টাকায় দশ মণ চাউল বিকাইয়া ছিল। তখন লোক উদরান্নের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইত না। এখন সেদিন নাই।

নবাবের পরোয়ানা অমান্য করার অপরাধে রাজা রঘুদেব দেবরায় তাঁহার জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। নবাব নলডাঙ্গা জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের ভার নাটোরের রাজা রামকান্ত রায়ের উপর অর্পণ করেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে তিনি আবার উহা রাজা রঘুদেব দেবরায়ের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময় বাঙ্গালায় একটি বিষম দৈব-দুর্বিপাক ঘটিয়াছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের (সন ১১৪৪) ১১ই অক্টোবর তারিখে রাত্রিতে দক্ষিণবঙ্গে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। বঙ্গোপসাগরে এই ঝটিকা আরব্ধ হইয়া ভাগীরথীর মোহনা ধরিয়া ইহা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার ফলে বহু সহস্র লোক গৃহশূন্য হয়। নদীগর্ভ হইতে নৌকা বায়ুবেগে একক্রোশ দূরে বৃক্ষোপরি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বৃক্ষাদি প্রবল প্রভঞ্জন-তাড়নায় উৎপাটিত হইয়া অতিদূরে যাইয়া পড়ে। এই ব্যাপারে যে কত লোক মরিয়াছিল,—তাহা বলা যায় না। ইহার পর বৎসর বাঙ্গালায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময় লোকের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। রাজা রঘু দেবরায় এই সময় প্রজাগণের খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন এবং অনেককে অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আবার এক নূতন বিপদ উপস্থিত হয়। নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত ঐ সময়

পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বর্দ্ধমানের সান্নিধ্যে উক্ত মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা অগ্নিপ্রয়োগে বর্দ্ধমান সহরটি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। এই হাঙ্গামা বাঙ্গালায় বর্গির হাঙ্গামা নামে বিখ্যাত। এই বর্গির হাঙ্গামার প্রারম্ভেই বর্দ্ধমানের প্রথম রাজা চিত্র সেন সপরিবারে নলডাঙ্গায় পলাইয়া যান এবং তথায় রাজা রঘুদেব রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রাজা চিত্রসেনের সহিত রাজা রঘুদেব রায়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। রাজা চিত্রসেন তৈলকুপি নামক গ্রামে একটী মন্দির নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ শিবলিঙ্গের নাম গুঞ্জনাথ। ঐ শিবের নাম হইতে গুঞ্জনগর হইয়াছে। ইহা ভিন্ন রাজা চিত্রসেন নিজের বসবাসের জন্য কয়েকটি অতি স্নুন্দর সৌধও নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ঐ সৌধগুলি আর নাই। তবে তাহার চারিদিকের 'গড়' এখনও আছে। ঐ গড় এখন রামধন দত্তের গড় বলিয়া বিখ্যাত। রামধন দত্ত নামক ঐ গ্রামের জনৈক ধনাঢ্য অধিবাসী বহুকাল পরে ঐ গড়গুলি দখল করিয়াছিলেন, সেইজন্য উহা উত্তরকালে তাঁহার নামেই পরিচিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন রাজা চিত্রসেন একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। সেই দীর্ঘিকা এখন নটীপাড়ার দীঘি নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ সেই সময় ঐ স্থানে একটি বাজার ছিল এবং ঐ বাজারে অনেক বেশ্যা থাকিত,—তদনুসারে উহার নাম নটীপাড়ার দীঘি হইয়াছে। এখনও এই দীর্ঘিকা স্থানীয় অধিবাসীদিগকে সুপেয় জল ও টাটকা মৎস সরবরাহ করিয়া থাকে।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভাস্কর পণ্ডিত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহার পরই বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা থামিয়া যায়। এই

সময় বৰ্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেন নিজের গ্রামে ফিরিয়া যান। যাইবার সময় তিনি রাজা রঘুদেব রায়ের হস্তে এই মন্দির সমর্পণ ও বিগ্রহের নিত্যপূজার ভারার্পণ করিয়া যান এবং ইহাও প্রতিশ্রুতি করিয়া যান যে, এতদর্থে তিনি নলডাঙ্গার অধিপতিকে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করিয়া দিবেন। বৰ্দ্ধমানে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই চিত্রসেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার খুল্লতাতপুত্র তিলকচাঁদ তাঁহার পর বৰ্দ্ধমানের গদীতে আরোহণ করেন এবং প্রথমেই মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি এই দেবালয়ের খরচ বাবদ বরাদ্দ অনেক কমাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর ও মহারাজা মহাতবচাঁদ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই দেবসেবার টাকা দিয়া আসিয়াছেন। এখন নলডাঙ্গার রাজাই এই দেবসেবার ব্যয় বহন করিয়া থাকেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রঘু দেবরায়ের মৃত্যু হয়। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ দেবরায়ই নলডাঙ্গার গদীতে আরোহণ করেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের দুই পত্নী ছিলেন। একজনের নাম রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী, আর একজনের নাম রাণী রাজরাজেশ্বরী দেবী। রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর কালিকাপ্রসাদ দেবরায় নামক এক পুত্র জন্মে। তিনি একটি বিধবা রাখিয়া অতি অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। কালিকাপ্রসাদের বিধবা ভার্য্যা দুর্গাপ্রসাদ দেবরায়কে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য 'তরফ সাঙ্গানী' প্রাপ্ত হন। সেইজন্য দুর্গাপ্রসাদ সাঙ্গানীর তালুকদার নামে অভিহিত হন। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র গুহপ্রসাদ, গুহপ্রসাদের পুত্র গোপালচন্দ্র দেব-রায়। ইনি নিস্তারিণী দেবীকে বিবাহ করেন।

কালিকাপ্রসাদ দেবরায়ের মৃত্যুতে রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। সেইজন্য তিনি পুনরায় হরদেব রায়কে

পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। হরদেব রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পালিকা জননীর অবাধ্য হইয়া পড়েন; সেইজন্য তিনি তরফ কুলবেড়িয়া লইয়া রাজপরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হন। তাঁহার বংশধরগণ কুলবেড়িয়ার তালুকদার বলিয়া বিখ্যাত। হরদেব রায়ের পুত্র কমলাকান্ত, কমলাকান্তের পুত্র রামকানাই। রামকানাইয়ের দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠা চণ্ডীমণি, কনিষ্ঠা চন্দ্রমণি। চন্দ্রমণির পুত্র ধীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ইঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মিয়াছে।

রামকানাই দেবরায়ের পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া তিনি অভিলাষচন্দ্র দেবরায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অভিলাষচন্দ্রের তিন পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেবরায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেববায় এবং শ্রীযুক্ত সুকেশচন্দ্র দেবরায়। কন্যা শ্রীমতী বিভাবতী দেবী। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রের একটি কন্যা; কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্যা। কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুকেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেকটর।

রাজা কৃষ্ণ দেবরায়ের আমলে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে ক্লাইভ সিরাজুদ্দৌলাকে পরাভূত করিয়া কার্য্যতঃ বাঙ্গালা অধিকার করেন। ঐ বৎসরেই তাঁহারা কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ও টাকশালের প্রতিষ্ঠা করেন। উহার পরবর্ত্তী ১৮শে আগষ্ট তারিখে ঐ টাকশালেই ইংরাজের মুদ্রা প্রথম প্রস্তুত হয়।

রাজা কৃষ্ণ দেবরায়ের সময়ে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ছিয়াত্তরে মন্বন্তর হইয়াছিল। ঐ দুর্ভিক্ষের পীড়নে বাঙ্গালার তিন ভাগের এক

ভাগ লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। একবেলা খাইবার উপযুক্ত অন্নের বিনিময়ে মাতা দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে, পতি সতী পত্নীকে বিলাইয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালার বহু পল্লী জনপদ শ্মশান হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় ধনীর গৃহের সম্মুখে কাতারে কাতারে কঙ্কালসার লোক আসিয়া অন্ন ভিক্ষা করিয়াছে। রাজা কৃষ্ণ দেবরায় সমাগত লোকদিগকে যথাসাধ্য অন্নবস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগের কষ্ট-লাঘবের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণ দেব-রায় স্বর্গারোহণ করেন।

রাজা কৃষ্ণ দেবরায়ের পোষ্যপুত্র হর দেবরায় রাজসংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী গোবিন্দ দেবরায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ দেবরায়ের দ্বিতীয় পত্নী রাজরাজেশ্বরীর গর্ভে মহেন্দ্রচন্দ্র দেবরায় ও রামশঙ্কর দেবরায় নামক দুই পুত্র জন্মে। রাণী রাজরাজেশ্বরী মঠবাড়ীতে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাজরাজেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

রাজা কৃষ্ণ দেবরায়ের মৃত্যুর পর, হর দেবরায় ভিন্ন তাঁহার আর তিন পুত্র ছিল। প্রথম গোবিন্দ দেবরায় (পোষ্য), দ্বিতীয় মহেন্দ্র দেবরায়, তৃতীয় রামশঙ্কর দেবরায়। ঐ তিন ভ্রাতাই নলডাঙ্গা জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বৎসরেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই সময় বুধাই বিশ্বাস নামক জনৈক মুসলমান নলডাঙ্গা রাজের দেওয়ান বা ম্যানেজার ছিলেন। বুধাই বিশ্বাসের নিবাস নলডাঙ্গার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত পদ্মাবিলা গ্রামে। তিনি মুসলমান ছিলেন; লেখাপড়াও বিশেষ কিছুই জানিতেন না। তখন তিন ভ্রাতাই জমিদারী বিভাগের জন্য বুধাই বিশ্বাসকে মধ্যস্থ মানিয়াছিলেন। গোবিন্দ দেবরায়ের প্রতি বুধাই বিশ্বাসের বিশেষ একটু

টান ছিল। সেইজন্য তিনি জমিদারীটি এমন ভাগে বিভাগ করিয়া দিয়া ছিলেন যে, যদিও গোবিন্দ দেবরায় আয়তনে জমিদারীর এক পঞ্চমাংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আয় প্রত্যেক দুই পঞ্চমাংশ সরীকের আয়ের সমান ছিল। কারণ বুধাই বিশ্বাস তাঁহার জমিদারীর মধ্যে ভাল ভাল হাট, বাজার, গঞ্জ, মৎস্য ধরিবার আড়ং, বাগান প্রভৃতি বসাইয়াছিলেন। গোবিন্দ দেবরায় জমিদারীর তিন আনা চারি গণ্ডা পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'তিন আনীর রাজা' বলিয়া অভিহিত হন। রাজা মহেন্দ্র দেবরায় জমিদারীর পশ্চিম অংশ পাইয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে "গ্রজ পশ্চিমের রাজা বা বড় রাজা" বলা হইত। রাজা রামশঙ্কর দেবরায় জমিদারীর পূর্ব্ব অংশ পাইয়াছিলেন বলিয়া "গ্রজ পূর্ব্বের রাজা বা ছোট রাজা" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বুধাই বিশ্বাস অনেক ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের লাখরাজ জমির ছাড় দিয়াছিলেন। উহা এখন বুধাই বিশ্বাসের ছাড় বলিয়া অভিহিত।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দ দেবরায় তাঁহার জমিদারী স্বতন্ত্র করিয়া লইলে পর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা মহেন্দ্র দেবরায়ের ও রাজা রামশঙ্কর দেবরায়ের জমিদারী একত্র ছিল ও একত্র আদায়-তহসিল হইত। এই সময়ে রাজা মহেন্দ্রনাথ দেবরায় তাঁহার ভ্রাতা রাজা রামশঙ্কর দেবরায়কে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করাতে রাজা রামশঙ্কর নলডাঙ্গা ত্যাগ করিয়া ভট্টপল্লীতে আগমন করেন। ভট্টপল্লীর জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই হইতেই রাজা রামশঙ্করের বংশধরগণ মেত তলার গুরুদিগকে ছাড়িয়া ভট্টপল্লীর গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজা রামশঙ্করের ভট্ট-পল্লীস্থ গুরুদেবই চেষ্টা করিয়া তাঁহার জমিদারী উদ্ধার করিয়া দিয়া-

ছিলেন। কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারে রাজা রামশঙ্কর ঐ জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টও তাহার জমিদারী প্রাপ্তি মঞ্জুর করেন। এই সময়ে তিন ভ্রাতার জমিদারী পৃথক হইয়া যায়।

রাজা গোবিন্দ দেবরায়ের তিন আনা চারি গণ্ডা অংশের রাজস্ব অধিক ধার্য্য হওয়াতে উহার সরকারী রাজস্ব বাকী পড়ে। সেই জন্য সরকার রাজার সম্পত্তি ভ্রমে উহা আর একজনকে পাট্টা দিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তিও সরকারী খাজনা বাকী ফেলে। সেই জন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উহার খাজনা কমাইয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, ১৭৯৭ এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এই জমিদারী দুইবার বিক্রয় হইতে বসে। কিন্তু দুইবারই উহা কোন প্রকারে রক্ষা করা হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উহা আবার বিক্রয় হইতে বসে। এইরূপে উহা বিক্রয় হয়। গরিব উল্লা চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি রাজা গোবিন্দ দেবরায়ের নিকট হইতে একখানি তালুক খরিদ করেন। তিনি যখন ঐ তালুক খারিজ করিয়া লইতে চাহেন, তখন রাজা গোবিন্দ দেবরায় উহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, উহা তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি বারাণসী ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট উহার বহুপূর্ব্বে বন্দক রাখিয়াছিলেন। রাজা গোবিন্দ দেবরায় বহুদিন পূর্ব্ব হইতে রূপনারায়ণ ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির অনেক টাকা ধারিতেন। তিনি রূপ নারায়ণের পিতা বারাণসী ঘোষের নামে ঐ জমিদারী বন্ধক দিয়াছেন বলিয়া একখানি কবলা করিয়া দেন এবং উহার তারিখ ৮ বৎসর পিছাইয়া দেন। রাজা গোবিন্দ দেব রূপনারায়ণের নিকট হইতে পূর্ব্বে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা গোবিন্দ দেবরায় ইহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, তিনি যখন বারাণসী ঘোষের নিকট তাঁহার সম্পত্তি পূর্ব্বেই

বন্ধক দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ঐ তালুক গরিব উল্লার নিকট বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল না। রাজা রূপনারায়ণের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক খত করিয়া লইয়াছিলেন যে, তিনি রাজার নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ঐরূপ সর্ত্ত সত্ত্বেও রূপনারায়ণ ঘোষ ঐ সম্পত্তি তাঁহার জনৈক কুটুম্ব পীতাম্বর বসুর নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। পীতাম্বর বসু উহা আবার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। ঐ তালুক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কৃষ্ণমোহনের দখলে ছিল, তৎপরে উহা নড়াইলের বাবুরা খরিদ করিয়া লইয়াছেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গরিব উল্লার তালুক রক্ষিত ও তাহা স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হয়।

এই প্রকারে রাজা গোবিন্দ দেবরায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। তাঁহার বৃত্তির জমি ও দেবোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই আর রহিল না। এই সময় সরকার ইহাদিগকে রাজা উপাধি হইতে বঞ্চিত করেন। রাজা গোবিন্দ দেবরায়ের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবরায় পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। রাজেন্দ্র দেবরায় একটি পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার নাম মহেন্দ্রচন্দ্র দেবরায়। মহেন্দ্রচন্দ্রের কাশীশ্বরী ও ব্রজেশ্বরী নামে দুই কন্যা জন্মে। তিনি উপেন্দ্র দেবরায়কে প্রথম পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; উপেন্দ্রের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়; সেইজন্য তিনি অমরেশচন্দ্র দেবরায়কে পুনরায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অমরেশ দেবরায়ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

অমরেশ রাজা সৌরীশচন্দ্র দেবরায়কে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন। সৌরীশচন্দ্র দেবরায় কুমার অদ্রীশচন্দ্র দেবরায় নামক এক পুত্র ও রাণী তরঙ্গিণী দেবীকে বিধবা রাখিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছিলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রামশঙ্কর দেবরায় রাজা মহেন্দ্রচন্দ্র দেবরায়ের সম্পত্তি হইতে নিজের অংশ পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্র দেবরায় অত্যন্ত খোস-খেয়ালের বশবর্ত্তী ছিলেন। তিনি নানাবিধ উৎসবে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মুগুরমোগুা' উৎসব প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মৃত্তিকায় একটি বড গর্ত্ত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হইত এবং সেই অগ্নিকুণ্ডের সান্নিধ্যে একটা প্রকাণ্ড মুদ্গর সোজাভাবে বসান হইত। ঐ মুগুরকে দেবতার ন্যায় পুজা করা হইত। উহার সম্মুখে ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলি দেওয়া হইত। শাল প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র সমস্ত ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত ও ভস্মীভূত করা হইত। ব্রাহ্মণাদিকে ঐ সময় ভূরিভোজন করান হইয়াছিল। সাত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ উৎসব চলে। শেষে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র দেবরায়ের জমিদারীর অংশ বিক্রয় হইয়া যায়। ঐ জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইবার কারণ এইরূপ—রাজা কৃষ্ণ দেবরায়ের মৃত্যুর পর সমস্ত জমিদারীর একটা বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। মিঃ লেন নামক জনৈক ইংরেজ সরেজমিনে আসিয়া তদন্ত দ্বারা ইহার রাজস্ব ধার্য্য করিয়া যান। পর বৎসর এই জমিদারী নামতঃ তিন ভাগে (যথা গোবিন্দ দেবরায়ের পাঁচভাগের এক ভাগ, মহেন্দ্র দেবরায়ের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এবং রামশঙ্কর দেবরায়ের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ), কিন্তু কার্য্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয় (যথা গোবিন্দ দেবরায়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং মহেন্দ্র ও রামশঙ্কর দেবরায়ের পাঁচভাগের চারিভাগ)। অর্থাৎ রাজা মহেন্দ্র ও রামশঙ্করের অংশ অবিভক্ত ছিল। এই বাটোয়ারার পর

রাজা মহেন্দ্র দেবরায় উভয় ভ্রাতার জমিদারীই পরিদর্শন করিতেন। তিনি খোস-খেয়ালের বশবর্ত্তী ছিলেন, এজন্য জমিদারী পরিদর্শনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। সেইজন্য সরকার বাহাদুর প্রাণ বসু নামক জনৈক ব্যক্তির উপর উহার পরিচালনভার ন্যস্ত করেন। প্রাণ বসু ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা নিজ নামে এবং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা তাঁহার পুত্রের নামে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, জলপ্লাবন, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তরাদিতে ভূমি দান অধিক থাকাতে সরকারী রাজস্ব বাকি পড়ে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ঝিনাইদহ হইতে কালেকটারের আফিস যশোহরে নীত হয়। যশোহরের কালেকটার বোর্ড অব রেভেনিউয়ের আদেশমতে এই জমিদারীর পরিচালনভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। কালেকটারের বন্দোবস্তেও সুফল ফলে নাই, সেইজন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন উহার সরকারী রাজস্ব অনেক হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রামশঙ্কর দেবরায় তাঁহার জমিদারী বাটোয়ারা করিয়া লইলে পর রাজা মহেন্দ্র দেবরায়ের সম্পত্তি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইয়া যায়। শালিখা-নিবাসী বাবু রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উহা খরিদ করেন। রাজা মহেন্দ্র দেবরায়ের দুই পুত্র ছিল। প্রথম আনন্দচন্দ্র, দ্বিতীয় বাণীচন্দ্র। মহেন্দ্র দেবরায়ের মৃত্যুর পর এই পুত্রদ্বয় রাধামোহন বাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। শেষে এই মামলার একটা রফা বন্দোবস্ত হয়। তাহার ফলে আনন্দচন্দ্র ও বাণীচন্দ্র উহার সাত আনা অংশ পুনঃপ্রাপ্ত হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সরকারী রাজস্ব বাকী পড়াতে ঐ সাত আনা অংশ নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। নড়ালের বাবুরা উহা খরিদ করেন। পরে নড়ালের জমিদারগণ অবশিষ্ট নয় আনা, যাহা বাবু রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাখিয়াছিলেন, তাহাও

খরিদ করিয়া লইয়াছেন। সেই বড় রাজার বংশধরগণ রাজা এই উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তবে ঐ বংশের লোকগণ এখনও সাধারণ ব্যবহারে 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই প্রকারে সমস্ত মামুদসাহী পরগণার নয় আনা বার গণ্ডা অংশ (তিন আনী রাজার তিন আনা চারিগণ্ডা এবং বড় রাজার ছয় আনা আট গণ্ডা) এক্ষণে নড়ালের বিখ্যাত জমিদার বাবু রামরতন রায়ের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

রাজা আনন্দচন্দ্রের উমেশচন্দ্র, তারেশচন্দ্র ও ভূমীশচন্দ্র নামে তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে তারেশচন্দ্র ও ভূমীশচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজা উমেশচন্দ্র দেবরায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কমলেশচন্দ্র দেবরায় ও ব্যোমকেশচন্দ্র দেবরায় নামক দুই পুত্র। রাজা কমলেশচন্দ্র দেবরায়ের তিন কন্যা ও রাজা ব্যোমকেশচন্দ্রের তিন পুত্র।

তিন আনী রাজা ও বড় রাজার বংশধরগণ নলডাঙ্গার জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইলে ছোট রাজার বংশধরগণ নলডাঙ্গার রাজা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। রাজা রামশঙ্কর দেবরায় ও তাঁহার বংশ-ধরগণই নলডাঙ্গার রাজা নামে সরকারের নিকট সম্মানিত। রাজা রামশঙ্করের বংশধরগণ যে কেবল মামুদসাহী পরগণার ছয় আনা আট গণ্ডা অংশের অধিকারী তাহা নহেন, পরন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সম্পত্তি আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

রাজা রামশঙ্কর দেবরায়ের মোহনচাঁদ দেবরায় নামক এক পুত্র ছিল। ইনি পিতার জীবদ্দশাতেই ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর তারিখে দেহত্যাগ করেন। মোহনচাঁদ দেবরায়ের পত্নী রাণী তারামণি দেবী তখন অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। পতির মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই রাণী

তারামণি দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। এই পুত্রসন্তানই নলডাঙ্গার বিখ্যাত রাজা শশিভূষণ দেবরায়।

রাজা রামশঙ্কর দেবরায় একটি কন্যাকে পালিতা কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কন্যার সহিত তিনি বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের পুত্র দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের পুত্র গঙ্গাচরণ, গঙ্গাচরণের পুত্র শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

রাজা রামশঙ্কর দেবরায়ের জননী রাণী ব্রজেশ্বরী দেবী ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে দেহত্যাগ করেন। ইহার প্রায় এক মাস পরে ৯ই নবেম্বর তারিখে রাজা রামশঙ্কর দেব দেহত্যাগ করেন। রাজা রামশঙ্কর দেবরায় দেহত্যাগ করিলে তাঁহার সাধ্বী পত্নী রাণী রাধামণি দেবী পতির অনুগামিনী হইয়া 'সতী' হইয়াছিলেন। যে সময় রাজা রামশঙ্করের প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময় রাণী রাধামণি শোকসূচক কোনও প্রকার ধ্বনি করেন নাই। তিনি চিত্রার্পিত মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন,—"আমার স্বামী ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন,—আমি তাঁহারই সঙ্গে পরলোকে যাইব।" তখন লর্ড মিণ্টোর সময়। অনেকে রাণীকে বুঝাইলেন। "সতী" হইয়া পতির চিতায় দেহ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেকে রাণীকে কত কথাই কহিলেন। কিন্তু রাণীর সঙ্কল্প অটল। অনেকে রাণীকে অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়া মরিবার বিভীষিকাও দেখাইলেন। তখন রাণী একটি প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার শিখায় তাঁহার তর্জ্জনী ধরিলেন। অগ্নিশিখায় অঙ্গুলি চটপট শব্দে পুড়িতে লাগিল। কিন্তু রাণীর মুখে কোন প্রকার বিকৃতি-লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, বরং আনন্দ-চিহ্নই প্রকটিত হইতে লাগিল! অঙ্গুলিটী ভস্মীভূত হইয়া গেল; তথাপি সাধ্বী সতীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যাহারা

তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিস্ময় মানিলেন। সকলেই জয় সতীলক্ষ্মীর জয় রবে দশদিক পূর্ণ করিল। সকলে রাণীকে লইয়া কালিকাতলার দহের তীরবর্ত্তী শ্মশানে গেলেন।

শ্মশানে চন্দনকাষ্ঠে একটি বৃহৎ চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। সেই চিতার উপর রাজা রামশঙ্করের পার্থিব দেহ শায়িত হইল। এদিকে রাণী রাধামণি তাঁহার যাবতীয় সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিলেন, মস্তকে সিন্দূর লেপন করিলেন, তথায় সমবেত লোকদিগকে টাকা, পয়সা ও চাউল মুক্তহস্তে বিতরণ করিলেন এবং শেষে দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে প্রফুল্লবদনে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন সেই শ্মশানে ও তাহার সান্নিধ্যে সমবেত সহস্র সহস্র লোকের কণ্ঠ হইতে উলু উলু হরিবোল হরিবোল ধ্বনিতে ঐ স্থানের গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। দূরস্থিত বৃক্ষে চত্বরে দেবালয়ে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন আকাশবাণীর সৃষ্টি করিল,—উলু উলু হরিবোল হরিবোল।

রাণী একবার রাজার মুখের দিকে চাহিলেন, আর হাস্যমুখে রাজার পার্শ্বেই সেই চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন। শয়নমাত্রই তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। সকলে আসিয়া দেখিল,—দেহে প্রাণ নাই; রাজার প্রাণের সহিত রাণীর মহাপ্রাণ অনন্তে উড়িয়া গিয়াছে। তখন সহস্র ঢক্কা-ধ্বনিতে শ্মশানভূমি পূর্ণ হইল। চিতায় অগ্নি সংযুক্ত হইল। কলসে কলসে ঘৃত, ভারে ভারে ধূপ ধূনা সেই জলচ্চিতার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চিতানল সহস্র শীর্ষ তুলিয়া সেই রাজ-দম্পতীর দেহ অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ভস্মরাশিতে পরিণত করিল। ইহলোকে ক্ষণিক বিচ্ছেদের পর সতীশিরোমণি রাণী রাধামণি চিরতরে সতীলোকে পতির সহিত সম্মিলিত হইলেন।

রাণী রাধামণি দেবীর বানীয়ানবৃত্তি বা অন্দরবৃত্তি নামক এক সম্পত্তি

ছিল; তিনি তাহা তাঁহার পুত্রবধূ রাণী তারামণি দেবীকে দিয়া যান। রাণী তারামণি বহুদিন ধরিয়া উহার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আদায় তহশীল করিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দশায় তিনি তাঁহার প্রপৌত্রবধূ রাজা শ্রীযুত প্রমথভূষণ দেবরায়ের মহিষী রাণী শ্রীমতী পতিতপাবনী দেবীর হস্তে প্রদান করেন। তারামণি দেবীর মৃত্যুর পর রাজা প্রথমভূষণ দেবরায় উহা তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা রামশঙ্কর দেবরায় যে সময় সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার পুত্রবধূ রাণী তারামণি ও তাঁহার শিশু পুত্র শশিভূষণ মহেশপুরে তাঁহার পিত্রালয়ে ছিলেন। পীড়ার সংবাদ পাইয়া রাণী তারামণি নলডাঙ্গায় আসিলেন, কিন্তু তিনি নলডাঙ্গায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশুর ও শাশুড়ী একই চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছেন শুনিলেন। শুনিয়া তিনি গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পডিলেন। তখন রাজা শশিভূষণের বয়স দশ মাস মাত্র। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে গেল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসে'র আদেশক্রমে সম্পত্তি ঐ শিশু রাজা শশিভূষণকে অর্পিত এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত হইল।

রাণী তারামণি মঠবাড়ীতে একটি শিবমন্দির ও তন্মধ্যে তারানাথ নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাজা শশিভূষণ দেবরায় যখন নাবালক, তখন নলডাঙ্গায় একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। নলডাঙ্গা মঠবাড়ীর সান্নিধ্যে খেদাপাড়া নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে এক বারোয়ারী পূজা হইয়াছিল। তাহাতে সাধারণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য নানাপ্রকার মাটীর পুতুলের সং প্রস্তুত হয়; যথা

ভিস্তি, ধীবর, সেলাইবুরুশ ইত্যাদি। উহার মধ্যে এইরূপ একটি মূর্ত্তি ছিল যে, একটি বালক ভেদ ও বমি করিতেছে, আর তাহার জননী তাহার নিকট একমাত্রা ঔষধ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একটি নারী বারোয়ারী দেখিতে আসে। তাহার ক্রোড়ে একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি এই সং দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। জননীসহ বালকটি বাড়ী আসিলে পর তাহারও ভেদ এবং বমি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে কেহ এই অঞ্চলে ঐরূপ রোগ দেখিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটি মারা পড়ে। তাহার পর সেই দুরন্ত ব্যাধি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে থাকে। সংক্রামকতার ভীষণত্বে এ ব্যাধির তুলনা নাই। ইহা ক্রমে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইয়ুরোপে ইহার নাম হয় এসিয়াটিক কলেরা।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ আর ডবলিউ ম্যাক্সওয়েল তদানীন্তন বোর্ড অব রেভিনিউকে যশোহরের তিনটি বড় বড় জমিদারের অবস্থার আলোচনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রে নলডাঙ্গা রাজ-পরিবারের অভিজাত্যের ও রাজভক্তির কথা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত আছে। উহাতে প্রকাশ যে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর রাজা শশিভূষণ দেবরায় বাহাদুরকে মামুদ-সাহী রাজবংশের বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মুসলমান রাজত্বকালে ইহারা কার্য্যতঃ স্বাধীন নরপালই ছিলেন। ইহারা সেই সময় ভারতের মুসলমান বাদশাহদিগকে নামমাত্র কর দিতেন। ভারতে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভূষণা, মামুদসাহী ও যশোহরের নৃপতিগণ সানন্দে ইংরেজদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে এবং বৃটিশ সরকারকে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য কর দিতে সম্মত হইয়াছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা শশিভূষণ দেবরায় বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জমিদারীকার্য্যের পরিচালনে তিনি সরকারের ও প্রজাবর্গের নিকট বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সাবালক হইবার পর তিনি চারি বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একজন দক্ষ জমিদার বলিয়া পরিচিত হন। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ এবং সাঁচি প্রতাপপুর, কণোজপুর ও কুশবেড়িয়ার আট আনা অংশ এবং সাসাবতসাহীর সাড়ে চারি আনা অংশ খরিদ করেন। তাহার পত্নী রাণী জয়দুর্গা দেবী খেদাপাড়ায় তাঁহার নামানুসারে জয়দুর্গা নামে এক দুর্গা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শশিভূষণের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাহার পত্নী জয়দুর্গাদেবী জমিদারীর পরিচালন করেন এবং তাঁহার ভর্ত্তার আদেশ অনুসারে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাণী জয়দুর্গা দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাজা শশিভূষণ দেব-রায়ের জননী তারামণি দেবী তখনও জীবিতা ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে একশত বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়। কিন্তু এই বয়সেও তাঁহার একটিও দন্ত পড়ে নাই। কেবলমাত্র তাঁহার চক্ষুর জ্যোতি ও কর্ণের শ্রবণশক্তি হ্রাস পাইয়া ছিল। তাঁহাকে দেখিলে দেব-মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হইত। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রপৌত্র রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় তাঁহাকে বারাণসীধামে পাঠাইয়া দেন। সেই বৎসরেই তিনি কাশী লাভ করেন। নলডাঙ্গার লোক তাঁহাকে "কর্ত্তা মা" বলিত। এখনও ঐ অঞ্চলের লোক তাঁহাকে সম্মান ও তাঁহার জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজা শশিভূষণ দেবরায়ের আদেশে

রাণী জয়দুর্গা দেবী এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দত্তক পুত্রের নাম রাজা ইন্দ্রভূষণ দেবরায়। রাজা ইন্দ্রভূষণের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিল। তাঁহার নাম মানদাসুন্দরী দেবী। ইহার সহিত বাবু পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ইহার তিন পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ হরভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় যোগেন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, তৃতীয় সুরেন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। মধ্যম যোগেন্দ্রভূষণ অল্প বয়সে একটি বিধবা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ হরভূষণের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। ঐ পাঁচ পুত্রের নাম বিজয়চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অখিলচন্দ্র, অনিলচন্দ্র ও অমলচন্দ্র। কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রভূষণ সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া সন্ন্যাসী হই-য়াছেন। তাঁহার শ্রীযুত সমরজিৎভূষণ, উমাভূষণ ও ব্রজেন্দ্রনাথ নামক তিন পুত্র ও সুশীলাবালা নাম্নী এক কন্যা আছে।

রাজা ইন্দ্রভূষণ যখন নাবালক, তখন সম্পত্তি 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসে'র তত্ত্বাবধানেই ছিল। 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' কুষ্টিয়ার মিঃ টি আই কেনেডিকে উহা ইজারা দেন। রাজা গার্জ্জেন টিউটারের তত্ত্বাবধানে যশোহর জেলা স্কুলেই পড়িতেন। এই সময় তাঁহার পিতামহী তারামণি দেবী নলডাঙ্গা হইতে জগন্নাথপুরে রাজবাটী লইয়া যান এবং গঞ্জনাথ শিবের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম গঞ্জনগর রাখেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজা ইন্দ্রভূষণ সাবালক হইয়া জমিদারীর তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করেন। ইনি ইঁহার ভগ্নীর ভরণ-পোষণের জন্য জমিদারীর কিয়দংশ দান করেন। ইনি দানশীল ছিলেন। প্রত্যহ দরিদ্রদিগকে ইনি তণ্ডুল, কাপড় দিতেন ও ব্রাহ্মণ খাওয়াইতেন। অনেক আত্মীয়-স্বজনকে মাসিক বৃত্তিও দিতেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদিগকে বার্ষিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সরকার সাধারণের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া সৎকার্য্যে ও জনহিতকর-ব্যাপারে যাহা দান করিতেন,

রাজা ইন্দ্রভূষণ সেই সকল সৎকার্য্যে সরকারের ও সাধারণের হাত দিয়া প্রচুর অর্থদান করিতেন। তিনি কামরাইল তালুক খরিদ করেন, এবং দশ বার হাজার বিঘা নিষ্কর ভূমি খরিদ করিয়া তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। ইনি অনেক হাট-বাজার স্থাপন, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, রাজপথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বেগবতী নদী মরিয়া যাইতেছিল, সেইজন্য ইহার মূলদেশ-খননে ইনি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইনি সরকারকে কতকগুলি হাতী দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই সময় সবেদঘাটে মিঃ ম্যাকেঞ্জির এক নীল কুঠী ছিল। মিঃ অর্ণ ঐ কুঠীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গহেরপুরের হাট দখল লইয়া রাজা ইন্দ্রভূষণের লোকের সহিত কুঠিয়ালদিগের মনান্তর ঘটে। রাজা ইন্দ্রভূষণ ঐ বিবাদ মীমাংসার জন্য তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীকে মিঃ অর্ণের নিকট পাঠাইয়া দেন। কথায় কথায় মিঃ অর্ণের সহিত রাজার কর্ম্মচারীর বিবাদ বাধে। রাজার কর্ম্মচারী ক্রোধের বশে তাঁহার সমভিব্যাহারস্থ লোকদিগকে মিঃ অর্ণকে মারিতে হুকুম দেন। তাহারা সেই হুকুম তামিল করে। যশোহরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট রাজাকে শাস্তি দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু রাজার পক্ষীয় ব্যারিষ্টার মিঃ মেলোনী ও মিঃ ডয়েন রাজা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা প্রতিপন্ন করেন, সুতরাং রাজা অব্যাহতি পান। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন রাজার জমিদারী কাড়িয়া লইবার ও তাঁহার রাজা এই উপাধি রহিত করিবার জন্য সরকারকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সরকার অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় আব্দার রক্ষা করেন নাই। রাজা চণ্ডীচরণ দেবরায় বাঙ্গালার

নবাবের নিকট হইতে যে সনন্দ পাইয়াছিলেন,—কেবল তাহাই চাহিয়াছিলেন। রাজা উপাধি যে তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত তাহা সপ্রমাণের জন্য সরকার ঐ সনন্দ চাহেন। রাজার নিকট ঐ সনন্দ ছিল না। কাজেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজার রাজা উপাধি স্থগিত রাখা হয়। তাহার পর রাজা ইন্দুভূষণ মুর্শিদাবাদের নবাবের তোষাখানায় উহার অনুসন্ধান করেন। বহুদিন অনুসন্ধানের পর নবাবের খলিফা দপ্তরখানায় উহা পাওয়া যায়। রাজার ব্যারিষ্টার মিঃ মণি উহা সরকারের গোচর করেন। সরকার ঐ প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়া বিভাগীয় কমিশনার মারফতে রাজাকে পুনরায় ঐ উপাধি প্রদান করেন। এই উপলক্ষে রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় বাহাদুর বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন।

রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় বুদ্ধিমান, সাধু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার মোটামুটি বেশ জ্ঞান ছিল। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার সঙ্গীতে অনুরাগ এবং দক্ষতা এই অঞ্চলে সর্ব্বজনবিদিত। তিনি শারঙ্গ, এস্‌রাজ, পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্র অতি সুন্দরভাবে বাজাইতে পারিতেন। তিনি অনেক বিখ্যাত কালোয়াৎ ও সঙ্গীতজ্ঞকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। সাবালক হইয়া জমিদারীর ভার লইবার কিছুকাল পরেই তিনি তাঁহার জমিদারীর অধিকাংশ পত্তনি বিলি করিয়া অবশিষ্ট অংশ খাসে রাখিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ইন্দুভূষণ গয়া, বারাণসী ও বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা করেন। তীর্থযাত্রা করিবার পর দেশে ফিরিয়া তিনি নলডাঙ্গার বাবু অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়, কুমড়াবেড়িয়ার বাবু গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সুতির বাবু মদনমোহন রায় এই তিন ব্যক্তির হস্তে জমিদারী-পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। ঐ ক্ষমতা-দানের দলিল রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল।

রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়বাহাদুর

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজা ইন্দুভূষণ তাঁহার দুই ভার্য্যা রাণী মধুমতী দেবী এবং রাণী সুখদাময়ী দেবীর এবং নাবালক পুত্র শ্রীযুত প্রমথভূষণ দেবরায়ের সহিত ত্রিবেণীতে গঙ্গাতীরে যাইয়া বাস করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাণী সুখদাময়ীর গঙ্গালাভ হয়। আড়াই বৎসরকাল ত্রিবেণীতে বাস করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মহাশয় প্রথমে কাশী ও পরে পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করেন। তথা হইতে ত্রিবেণীতে প্রত্যাগমন করিলে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। ঐ পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। চিকিৎসার জন্য রাজা মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট গমন করেন। কিন্তু নিয়তির নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করা সহজ নহে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দরিদ্রের বন্ধু, অসহায়ের সহায়, রাজা ইন্দুভূষণ দেব-রায় ৩৬ বৎসর মাত্র বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রাজা প্রমথভূষণ দেবরায়।

নলডাঙ্গার ভূষণ রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় বাহাদুর ১৮৫৮ খ্রীষ্টা-ব্দের ২২শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স সাড়ে এগার বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ইহার পরই যশোহরের কালেক্টার বাহাদুর রাজসম্পত্তির পরিচালনভার গ্রহণ করেন এবং নাবালক রাজা বাহাদুরকে মাণিকতলার ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউ-সনে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ডাক্তার (ইনি পরে রাজা হইয়াছিলেন) রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তখন তাঁহাদের অভিভাবক ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় মহাশয়ের জননী রাণী মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই সময় রাজা প্রমথভূষণের প্রপিতামহী রাণী তারামণি দেবী জীবিতা ছিলেন। তিনি যশোহরের কালেক্টার বাহাদুরের নিকট নাবালক রাজাবাহাদুরের পরিণয় প্রস্তাব করিয়া

পাঠান। কালেক্টার সে প্রস্তাবে সম্মত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজা প্রমথভূষণের পরিণয় হয়। তখন রাজার বয়স সাড়ে চৌদ্দ বৎসর মাত্র। রাজবধূ রাণী পতিতপাবনী দেবী কলিকাতায় ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসনের সান্নিধ্যেই আত্মীয়-স্বজন ও পরিচারকাদি লইয়া অবস্থিতি করিতেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাতেই রাজাবাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী স্বরশৈবলিনী দেবী ভূমিষ্ঠ হন। ইহার পর রাণী পতিতপাবনী অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়েন। বিশেষ দক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসায় রাণী ক্রমে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জমিদারীর কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পর বৎসর গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রাজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পুণ্যাহ উৎসব করিয়াছিলেন।

ইহার পর রাজাবাহাদুরের দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটি কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এখন রাজাবাহাদুরের দুই কন্যা ও দুই পুত্র বর্ত্তমান। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী স্বরশৈবলিনীর সহিত স্বর্ণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের বিবাহ হয়। গিরীন্দ্র বাবু এখন কৃষ্ণনগরের উকীল। রাজকুমারী শ্রীমতী স্বরশৈবলিনীর ক্ষিতীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ নামে চারি পুত্র, বাসন্তীবালা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছে। কনিষ্ঠা রাজকুমারী শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর সহিত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু স্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

রাজকুমারদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুত পন্নগভূষণ দেবরায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বীরভূম হেতমপুরের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছেন।

কনিষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কভূষণ দেবরায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টার রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

রাজা শ্রীযুত প্রমথভূষণ দেবরায় বাহাদুর ভারতের ও সিংহলের নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। শিকারে, সন্তরণে ও অশ্বারোহণে তাঁহার তুল্য অতি অল্প লোকই আছে। তিনি স্বহস্তে অনেক ব্যাঘ্র, হরিণ, বন্যশূকর শিকার করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবার তাঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে। সৌজন্যে ও মনস্বিতায় রাজাবাহাদুর সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। চরিত্রবলে ও সাহসিকতায় ধনাঢ্যের সংসারে তাঁহার ন্যায় লোক অতি বিরল। তিনি তাঁহার বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হন না। তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী এবং উচ্চ বর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎসাহদাতা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখে মঠবাড়ীর শ্রীশ্রীসিদ্ধিশ্বরী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই সভায় ঐ অঞ্চলের সমস্ত ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। রাজ-পুরোহিত দেবীর পূজা করিয়া লোকজন সঙ্গে এক খণ্ড নির্দ্দিষ্ট জমির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃষিকর্ম্মের জন্য তথায় রক্ষিত একখানা লাঙ্গল ও একজোড়া বলীবর্দ্দকে মন্ত্রপূত করিলেন। তৎপরে পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং শাস্ত্রীয় বচন, প্রমাণ দ্বারা উচ্চ বর্ণের পক্ষে কৃষির করণীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া এক বক্তৃতা করেন, এবং স্বয়ং লাঙ্গল ধরিয়া একটু জমি চাষ করেন। তৎপরে রাজ-পরিবারের অনেকে ও অন্যান্য বহু ভদ্রলোক হলচালনা করেন। যখন রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার স্বহস্তে হলচালনা করিলেন,

তখন হরিবোল হরিবোল ও আল্লা আল্লা রবে দশদিক কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পশুপালনেও রাজা বাহাদুরের জ্ঞান অসাধারণ। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের যশোহর-প্রদর্শনীতে তাঁহার প্রতিপালিত যে সমস্ত পশু প্রদর্শিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যায়, পশুচিকিৎসায় ও যান্ত্রিক বিদ্যায় রাজা বাহাদুরের তুল্য লোক অতি বিরল। অনেক বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অধিক, তাঁহার তত্ত্বাবধানে তাঁহার মোটরকার প্রভৃতি সংস্কৃত হইয়া থাকে। চিত্রবিদ্যাতেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য।

রাজা বাহাদুর একজন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। ইনি সাধারণের শিক্ষার জন্য নলডাঙ্গায় নিজ ব্যয়ে একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইনি ইঁহার পিতা রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায়ের নামে যশোহর জেলা স্কুলে বার্ষিক এক শত টাকার একটী বৃত্তি এবং ইঁহার মাতা রাণী মধুমতীর নামে বারাণসীতে সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার্থীদিগের জন্য মাসিক দশ টাকা হিসাবে একটী বৃত্তি দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষার্থ যশোহর জেলা স্কুলের মুসলমান বোর্ডিংয়ে ইনি হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন। ইঁহার দান অনেক।

ইনি পিতার নামে নলডাঙ্গার ইন্দুভূষণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন এবং নোহাটায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রায় সমস্ত ব্যয়ভারই বহন করিয়া থাকেন। তিনি যশোহরের জেলা বোর্ডে কেবল মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। রাজপথ-নির্ম্মাণ, সেতু-গঠন, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সকল দেশ-হিতকর সৎকার্য্যের জন্য সরকার অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতে ইনি মুক্তহস্তে অর্থ দান করেন। গোপন ভাবেও ইনি অনেক গরীব দুঃখীকে অর্থ দান করেন।

সাধারণের ও অনুজীবিবর্গের উপর রাজা প্রমথভূষণ দেব বাহাদুরের ব্যবহার অত্যন্ত সন্তোষজনক। সকলেই তাঁহাকে দয়ার অবতার বলিয়া জানে। তিনি প্রজাবর্গের মা বাপ। এক কথায় তিনি বাঙ্গালার একজন আদর্শ জমিদার।

রাজা বাহাদুরের পারিবারিক জীবনও সুখময়। ভগবান্ তাঁহাকে ধর্ম্মশীলা পত্নী ও পিতৃবৎসল পুত্র দিয়াছেন। তিনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা ও আদর্শ বন্ধুরূপেই নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়িলে তিনি এই বিলাস-কোলাহলময়ী কলিকাতা নগরীতে অবস্থিতি করেন না।

জমিদারী কার্য্যেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এখনকার অনেক জমিদার তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিয়া থাকেন। ইনি নিজের সম্পত্তির আয় অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

তাহিরপুর-রাজবংশ।

তাহিরপুরের জমিদারী রাজসাহী জেলার অন্যতম প্রাচীন জমিদারী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুলীন রাজবংশ বলিয়া উত্তরবঙ্গে ইহা গৌরবান্বিত। এই সকল কারণে উত্তরবঙ্গে প্রভূত অর্থশালী বহু প্রাচীন ও আধুনিক রাজন্যবর্গের নিবাস হইলেও, সাধারণের নিকট এই রাজবংশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

এই রাজবংশের পাঁচশত বৎসর ঊর্দ্ধকালব্যাপী ক্রিয়া-কলাপাদির বিস্তৃত বিবরণ বা ঐতিহাসিক আলোচনার স্থান ইহা নহে; কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রধান ঘটনাগুলিই নিম্নে লিখিত হইল।

শাণ্ডিল্যবংশীয় দ্বিজবর ভট্টনারায়ণ গৌড়াধিপতি মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে আনীত হয়েন; তাঁহার অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ মৌনভট্ট গৌড়াধিপ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রোত্রিয় গণ্য হয়েন। মৌনভট্টের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ কন্দর্পসুত বামদেব ভট্ট (১৪২০ খৃঃ অঃ) তাহিরপুর রাজবংশের স্থাপয়িতা। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কুল্লুক-ভট্ট, পুরুষোত্তম বেদান্তী প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণের বংশধর হইলেও কামদেব বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বংশগত বিদ্যাচর্চ্চা শাস্ত্রাধ্যয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অমনোযোগী ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি তীর, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রচালনায় অতিশয় দক্ষতা লাভ করেন এবং ক্রমে তাঁহার অনুগত লোকজনসহ একটী সৈন্যদল গঠিত করিয়া স্বয়ং তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সৈন্যদল এরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছিল যে, কথিত আছে,

একদা একদল লুণ্ঠনরত বিদ্রোহী পাঠান-সৈন্য তাঁহার বাটী আক্রমণ করিলে তিনি বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুলাচার্য্যদিগের নিকট শুনা যায় যে, মুসলমানগণের ব্যবহৃত অস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করায় কামদেবের বংশে কুলবিষয়ক "ভট্টাপবাদ আঘাত" হইয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্গদেশের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তার সহিত লোদীবংশীয় সম্রাটগণের বিশেষ যুদ্ধবিগ্রহাদি হইতেছিল এবং দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যবলে বলীয়ান, শক্তিশালী বীরপুরুষ কামদেব এই সুযোগে একটি রাজ্যস্থাপনে ব্রতী হয়েন।

বর্ত্তমান তাহিরপুরের নিকটবর্ত্তী বারাহী নদীতীরে যে গ্রাম এক্ষণে রামরামা নামে খ্যাত, তথায় তিনি একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী করেন এবং প্রথমেই তাহির খাঁ নামক জনৈক পাঠান সর্দ্দারের জায়গীর তাহিরপুর পরগণা অধিকার করেন এবং অন্যান্য অধিকৃত স্থানসমূহ লইয়া অনতিবিলম্বেই একটী সুবৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাই তাহিরপুর রাজ্যের সৃষ্টির ইতিহাস।

কামদেবের পুত্র বিজয় লস্করও সুবিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বিদ্রোহ-দমন-ব্যাপারে দিল্লীশ্বরের সবিশেষ সহায়তা করেন; সম্রাট বিজয়ের বীরত্বে সন্তোষ লাভ করিয়া তাঁহাকে "লস্কর" (সৈনানায়ক) উপাধিতে বিভূষিত করেন এবং একটী পরগণাও জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। ইহাই পরে লস্করপুর পরগণা নামে পরিচিত হয়। বিজয়ের তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ ভূপনারায়ণ দিল্লী সিংহাসনের বিভিন্ন প্রার্থী-গণের একজনের পক্ষ অবলম্বন করেন, কিন্তু সেই পক্ষ পরাজিত হইলে

তিনি রাজ্যচ্যুত হয়েন এবং তাঁহার অনুজ হৃদয়নারায়ণ রাজ্যাধিকার লাভ করেন।

পুষ্করাক্ষ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন, তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় প্রীত হইয়া হৃদয়নারায়ণ তাঁহাকে লস্করপুর পরগণার কিয়দংশ দান করেন, এই দান হইতেই তাহিরপুরের অনতি-দূরেই পুঠিয়া নামক আর একটি প্রাচীন জমিদার-বংশের অভ্যুত্থান হইয়াছে। হৃদয়নারায়ণের লোকান্তর হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিনারায়ণ রাজ্য লাভ করেন। হরিনারায়ণেরই পুত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা কংশনারায়ণ।

রাজা কংশনারায়ণ ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন; বহু শতাব্দী গত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাম উত্তরবঙ্গে তথা সমগ্র বারেন্দ্র সমাজে এখনও সুপরিচিত। তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে পূর্ব্ববঙ্গে মগ দস্যুদিগের বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ হয়; এই সময়ে বঙ্গদেশে যথেষ্ট মুসলমান সৈন্য না থাকায় রাজা কংশনারায়ণের প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আদেশ হয় এবং তিনিও বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মগ-দিগকে বিতাড়িত করেন।

মহারাজ কংশনারায়ণ মুসলমান নবাবদিগের অনুকরণে রাজধানীর নানা উৎকর্ষ সাধন করেন এবং তাঁহাকে "গৌড়" নামে অভিহিত করিয়া স্বয়ং "গৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করেন। তৎকালে অতিশয় ক্ষমতাশালী নৃপতি না হইলে কেহ ঈদৃশ সম্মান-সূচক উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

রামায়ণের অনুবাদক সুপণ্ডিত কৃত্তিবাস ইহার সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাহিরপুর রাজ-সভাতেই বিরচিত হয়। রামায়ণের উপক্রমণিকায় কৃত্তিবাস রাজ-সভার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"নয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥

*　　　*　　　*

*　　　*　　　*

রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাঁড়াইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্য গীত সর্ব্ব লোক হাসে।
চারিদিকে ধাওয়া ধাই রাজার আওয়াসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাধুরী।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুরী॥
পাটের চান্দোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরচ পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥"

কথিত আছে যে, পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শারদীয় দুর্গোৎসব হইত না, রাজা কংশনারায়ণ তাঁহার পুরোহিত রমেশ শাস্ত্রীর উপদেশে এবং কবিকুল-চূড়ামণি কৃত্তিবাসের আগ্রহে এই পূজার সূচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে শারদীয়া পূজার অবতারণার সহিত এই বিষয়ের যে কিছু সম্বন্ধ নাই, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। শাস্ত্রানুযায়ী এই পূজা চৈত্র মাসে হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এক্ষণে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই আশ্বিন মাসে এই পূজা হইয়া থাকে।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজেও রাজা কংশনারায়ণ প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নিম্নোক্ত সামাজিক নিয়মগুলি তাঁহারই কীর্ত্তি এইরূপ কুলাচার্য্যগণের নিকট জানা যায়:—

১। কাপ ও কুলীনেরা বিশুদ্ধ কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের মধ্যবর্ত্তী হইবেন।

২। কাপ ও কুলীনের মধ্যে, পুত্র কন্যার বিবাহে, কুশবারি দ্বারা মর্য্যাদা পরিবর্ত্তন করিলে বা কাপে দত্তক দিলে কুলীন কাপে গণ্য হইবেন।

৩। সিদ্ধ শ্রোত্রীয়গণ কাপে কন্যা না দিয়া পটি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

৪। সাধ্য বা কষ্ট শ্রোত্রীয়গণ কুলীনে কন্যা দান করিতে পারিবেন।

৫। কুলীনও কাপ শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রীয়ে কন্যা দান করিলে কুলভঙ্গ হইবে।

৬। কুলীন বা কাপ, বন্ধুহীনা কুলীন বা কাপের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না।

৭। শ্রোত্রীয়ের বিবাহে করণ করিতে হইবে না।

এই সময়ের কুল-গ্রন্থাদিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের দিক্‌পাল বলিয়া বারেন্দ্র ভূমির পূর্ব্বপ্রান্তে সুসঙ্গ রাজবংশ "উদয়াচল" এবং পশ্চিম প্রান্তে তাহিরপুর-রাজবংশ "অস্তাচল" নামে উক্ত হইয়াছে।

রাজা কংশনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা উদয়নারায়ণ এবং তাঁহার অভাবে তদীয় পুত্র রাজা ইন্দ্রজিৎ রাজ্য লাভ করেন।

রাজা ইন্দ্রজিৎ অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং দীর্ঘকাল সুখ ও শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় রাজা টোডরমল্লের সহকারীরূপে রাজা ইন্দ্রজিৎ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বন্দোবস্তের সময় তাঁহার অধিকৃত ৫২ পরগণার কোনও করাবধারণ হয় নাই; কিন্তু

তাঁহাকে সাত হাজার পদাতিক সৈন্য এবং ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য সরবরাহ করার জন্য অঙ্গীকৃত হইতে হয় এবং তিনি স্বয়ং এই সৈন্য-দলের মনসবদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা সূর্য্যনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সূর্য্যনারায়ণের রাজত্বের মধ্যভাগে সাহজাদা সুজা বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। সাহজাদা ঘোর লম্পট ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষ ছিলেন। কত রমণী, কত কত জমিদার বধূ ও কন্যা যে তাঁহার অত্যাচারে সতীত্ব ও প্রাণ হারাই-য়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না; ইঁহার গুপ্তচর চতুর্দ্দিকে সুন্দরী কন্যার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত; সূর্য্যনারায়ণের রূপসী কন্যা হংসেশ্বরী দেবীর কথাও ক্রমে সুজার কর্ণগোচর হইল এবং রাজার নিকট তিনি এই কন্যা চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজা ইহা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই কন্যাকে স্বীয় পুত্র ও জামাতাসহ ঢাকার শাসনকর্ত্তার আশ্রয়ে প্রেরণ করিলেন। সুজা এই সংবাদে ঘোর রোষান্বিত হইয়া গৌড় আক্রমণ করেন ও গৌড়েশ্বর কংশনারায়ণের সাধের রাজধানী গৌর ধূলিসাৎ করিয়া ফেলেন এবং বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া তৎসহ রাজা সূর্য্যনারায়ণকে বিদ্রোহী বলিয়া আগ্রায় প্রেরণ করেন। সূর্য্যনারায়ণ সম্রাট সাজাহানের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থলোলুপ সাজাহান অগাধ ধনরত্নের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তবে রাজাকে বধ না করিয়া সম্মানের সহিত দিল্লীর দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন, এইরূপে বিস্তৃত জায়গীর সরকার তারকুবাদ, লস্করপুর প্রভৃতি মোগল সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। সূর্য্যনারায়ণ বন্দী অবস্থাতে দিল্লীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সেই সময় আবার সূর্য্যনারায়ণের বংশধরগণের ও রাজকন্যা হংসেশ্বরীর খোঁজ হয় এবং ঢাকার শাসনকর্ত্তার প্রতি তাঁহাদিগকে

দিল্লী পাঠাইবার আদেশ হয়; নিতান্ত নিরুপায় হইয়া হতভাগিনী হংসেশ্বরী আত্মহত্যা করেন। অবশেষে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় নরেন্দ্রনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ ঢাকার নবীন শাসনকর্ত্তা মিরজুমলার নিকট উপস্থিত হইলেন। মিরজুমলা তাঁহাদিগের কষ্টকাহিনী শুনিয়া বিশেষ করুণান্বিত হয়েন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট সুপারিশ করিয়া কেবল মাত্র তাহিরপুর পরগণা ইহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন এবং তাহার কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই হইতে তাহিরপুর স্বাধীন রাজ্যের বিলোপ হইয়া জমিদারীতে পরিণত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব লক্ষ্মীনারায়ণকে রাজো-পাধি ও এই জমীদারী প্রদান করিয়া স্বীয় পাঞ্জা ও মোহর-অঙ্কিত যে এক সনন্দ প্রদান করেন, তাহা অদ্যাপি রক্ষিত হইয়াছে। সাহসুজা কর্ত্তৃক গৌড়ের ধ্বংশ এরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে, তথায় বাস করিবার আর উপায় ছিল না; এই গৌড় এক্ষণে রামরামা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ অগত্যা পুনরায় বারাহী নদী পার হইয়া সাবরুল গ্রামে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এই সাবরুল গ্রামই এক্ষণে তাহিরপুর নামে জনসাধারণের সুপরিচিত।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বহুকাল জীবিত ছিলেন এবং বহু কষ্ট ও শোক তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে; তাঁহার জীবিতকালে সদর রাজস্ব বাকী পড়ায় তাঁহার পুত্র কন্দর্পনারায়ণ গ্রেপ্তার হইয়া ঢাকায় নীত হয়েন। বৃদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ শেষাবস্থায় তাঁহার চারি পুত্রকে জমিদারী তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কন্দর্পের এইরূপ অকাল মৃত্যুর পর তাঁহার অংশের অর্দ্ধেক প্রথমা পত্নীর দ্বিতীয় পুত্রকে দেন ও অপরার্দ্ধ দ্বিতীয়া পত্নীর দুই পুত্রকে তুল্যাংশ করিয়া দেন।

পরলোকগত লক্ষ্মীনারায়ণের দ্বিতীয় পত্নীর কনিষ্ঠ পুত্র রূপেন্দ্রনারায়ণ অতিশয় বুদ্ধিমান ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন; এই সময় নাটোর রাজ্যের

প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের বিশেষ সমুন্নত অবস্থা (১৭০৪ খৃঃ অঃ)। রূপেন্দ্র-নারায়ণ ইঁহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বিশেষ আত্মীয়তা করিয়া লইলেন। সহোদর রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রাণী সাবিত্রীর অংশ রূপেন্দ্রনারায়ণ, রঘুনন্দনের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে দখল করিয়া লইলেন। এই হইতেই তাহিরপুরের জমীদারীতে রূপেন্দ্র-নারায়ণের ॥৵০ আনা অংশ ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনারায়ণের ছয় আনা অংশ হইয়া দশ আনী ও ছয় আনী তরফের সৃষ্টি হয়। রাজা রূপেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘকাল জমিদারী করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন বড় বড় দীর্ঘিকা ও মণ্ডপ আদি এখনও তাহিরপুরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। নাটোরের রাজা রঘুনন্দন এই সময়ে নবাবের অনুগ্রহে বঙ্গের বহু জমিদারী হস্তগত করিয়াছিলেন, কিন্তু রূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত মিত্রতা থাকায় তাহিরপুরের জমীদারী রক্ষা পাইয়া যায়।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রাজা রণেন্দ্রনারায়ণ বহুদিবস সুখে রাজত্ব ভোগ করিয়া দুইটি শিশু কন্যা,—উমাসুন্দরী ও দুর্গাসুন্দরী এবং পত্নী রাণী শঙ্করীকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

কাশ্যপগোত্রীয় সুসেন বংশধর, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, কুলীনশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সন্তান মৈনমগ্রাম-নিবাসী সুবিজ্ঞ হরগোবিন্দ রায় রাজা রণেন্দ্রনারায়ণের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, মৃত্যুকালে রাজা তাঁহার দুই পুত্রসহ স্বীয় দুই কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা ও পত্নীর অভিভাবক নিযুক্ত করেন।

রাণী শঙ্করী অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন এবং হরগোবিন্দ রায়ের নিঃস্বার্থ কার্য্যতৎপরতায় দশ আনী তরফের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। কিছু দিবস পর তাঁহার পুত্রদ্বয় আনন্দরাম রায় ও বিনোদরাম রায়ের সহিত দুই রাজকন্যার বিবাহ হয়। রাজকুমারী উমাসুন্দরী

নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। রাজকুমারী দুর্গাসুন্দরীর একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর এবং তিনিই উত্তরাধিকারসূত্রে তাহিরপুর জমিদারীর দশ আনী তরফের মালিক হইলেন। এই সময় বঙ্গে জমিদারী-সমূহের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, কিন্তু বীরেশ্বর রায়ের নাবালক অবস্থা থাকায় এই বন্দোবস্ত তাঁহার পিতা ও অভিভাবক বিনোদরাম রায় সহ হয়। তিনি পুত্রের জমিদারীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

ছয় আনী তরফের নানা কারণে ক্রমশঃই অবনতি আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে এই তরফের জমিদারী কতক দশ আনী তরফের ও অবশিষ্ট অন্যান্য জমিদারগণের হস্তগত হইয়াছে। এই তরফের শেষ বংশধর দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন!

বিনোদরামের মৃত্যুর পর রাজা বীরেশ্বর স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অতি ধীর ও নিরীহপ্রকৃতি জমিদার ছিলেন; জমীদারীর বন্দোবস্ত করিতে ইঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়, ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর রায় বিশেষ শৌর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন; ইঁহারই হুকুমে ১৮৩৫ খৃঃ অঃ বিখ্যাত তাম্বুলী লুট হয়; তাম্বুলীরা কুশীদজীবী ধনবান মহাজন ছিল, তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজারা বিশেষ জ্বালাতন হইয়া রাজা বীরেশ্বরের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। রাজা সেই সময় পূজা করিতেছিলেন; তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয় বীর্য্যশালী পুত্র কুমার চন্দ্রশেখর প্রজাদিগের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "দুই ঘর মহাজনে তোদের সর্ব্বনাশ করে তোরা কিছু করিতে পারিস্ না।" প্রজারা বলিল, "হুকুম পাইলে তাহাদিগকে এক রাত্রে সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারি।" কুমার আদেশ করিলেন, "আমি হুকুম দিলাম।"

তেজঃপ্রদীপ্ত কুমারের কথা তাহারা শিরোধার্য্য করিয়া লইল, সেই

রজনীতেই তাম্বুলীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুট হইয়া যায়। পিতা বর্ত্তমানেই রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর তাঁহার জমিদারী কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন, জমিদারী কার্য্যে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞতা তৎকালে অল্প লোকেরই ছিল। তাহিরপুরের স্থানীয় উন্নতি ইঁহার সময় যথেষ্ট হইয়াছিল। তাহিরপুরের সুপ্রসিদ্ধ দোলমঞ্চ, গুঞ্জাবাড়ি, নূতন দালান, হর বাগান, চৌকি প্রভৃতি ইঁহারই কীর্ত্তি; ইংরাজী স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতিও ইনি স্থাপনা করেন। ইঁহারই যত্নে তাহিরপুরের রথ রাজসাহী জেলার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইঁহার দানও অসাধারণ ছিল। বোয়ালিয়ায় ইঁহার স্থাপিত ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের কথা হাণ্টার সাহেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গেজেটিয়ারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কত কুলীন ব্রাহ্মণ যে ইঁহার সাহায্যে কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না, এই জন্য কুলীন-সমাজে রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বরের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ইঁহার পিতৃদেব রাজা বীরেশ্বর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হয়েন, তাঁহার মৃত্যুর পর এই জমিদারীর অর্দ্ধাংশ রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর ও অপরার্দ্ধ তদীয় অনুজ রাজা মহেশ্বর প্রাপ্ত হয়েন; মহেশ্বর রায় সদাশিব-প্রকৃতি লোক ছিলেন। রামকল্প জ্যেষ্ঠের প্রতি তিনি সমুদয় বিষয়কার্য্য ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ লইয়া থাকিতেন, জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠকে এবং তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; রাজা মহেশ্বরের মাতৃহীন পুত্রদ্বয় কুমার জগদীশ্বর ও তারকেশ্বরকে তিনি স্নেহবশতঃ একটি অতি মূল্যবান পরগণার নিজাংশ দান করিয়াছিলেন। রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বরের প্রথম দুই পত্নীর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার সহিত ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পাবনা জেলান্তর্গত দশপাইকাগ্রাম-নিবাসী ভুবনমোহন ভৌমিকের কন্যা রাণী সৌদামিনী দেবীর বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে

তাহিরপুরের বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর শশিশেখরেশ্বর ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারের অতি শৈশবাবস্থায়, বালিকা বধূ রাখিয়া, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর অকালে মানব-লীলা সংবরণ করেন।

রাজা মহেশ্বর রায়ের চারি পুত্রের মধ্যে কুমার জগদীশ্বরের পিতার বর্ত্তমানে মৃত্যু হয়, অপর তিনজন রাজা তারকেশ্বর, রাজা বিশ্বেশ্বর ও রাজা কাশীশ্বর তুল্যাংশে তাঁহার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহাদের কেহই এক্ষণে জীবিত নাই। নানা কারণে ইঁহাদের অধিকাংশ সম্পত্তিই হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহা প্রায় সমুদয়ই রাজা শশিশেখরেশ্বর খরিদ করিয়াছেন। কাশীশ্বর ও বিশ্বেশ্বরের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়; তারকেশ্বরের একমাত্র পৌত্র কুমার শৈলেশ্বর এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন।

রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়ের পিতৃবিয়োগের পর ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, শিশু পুত্র ও অসহায়া বালিকা বিধবা দেখিয়া অর্থ-লোলুপ আত্মীয়বর্গ ও অমাত্যগণ যথারীতি লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। রাণী সৌদামিনী পুত্রসহ একরূপ নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। চতুর্দ্দিকে দুস্তর বিপদসমুদ্র দেখিয়া তিনি নিজহস্তে পত্র লিখিয়া রাজসাহীর কালেক্টরের নিকট পিত্রালয়ের দাসীটীকে গোপনে প্রেরণ করেন, দাসী অতি কষ্টে কালেক্টরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পত্র প্রদান করে, সদাশয় কালেক্টর সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহিরপুরে আইসেন ও নাবালকের বিষয় ও শরীর রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। স্বামীর উইল অনুসারে স্বহস্তে সম্পত্তি পরিচালন করিবার ও নাবালককে নিজের নিকট রাখিবার ক্ষমতা রাণীর থাকিলেও রাণী বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা বিষয় সংরক্ষণ সম্ভবপর হইবে না বা পুত্রকে নিজের নিকট রাখিলে তাহার শিক্ষাদি কিছুই হইবে না; কর্ত্তৃত্ব

করিবার প্রলোভন নারীর পক্ষে বিষম প্রলোভন এবং সন্তানবাৎসল্য পতিহারা জননীর কিরূপ প্রগাঢ় হইয়া থাকে তাহা লিখাই বাহুল্য; কিন্তু দূরদর্শী ও বুদ্ধিমতী রাণী স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করিয়া সম্পত্তি কোর্ট-অব ওয়ার্ডসে দেন ও কুমারকে ওয়ার্ডস ইনষ্টিট্যুশনে প্রেরণ করেন।

আর্ত্তের বন্ধু সদাশয় গবর্ণমেণ্টের কৃপায় সম্পত্তির সুন্দর বন্দোবস্ত হইল এবং বিদ্যাগারে বুধশ্রেষ্ঠ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে পুত্র সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতে লাগিল; পুণ্যময়ী জননীর চরিত্র-প্রভাবে বিদ্যাগারের এবং তৎকালীন কলিকাতা সমাজের অসৎসঙ্গের মালিন্য কুমারকে কিছুমাত্র কলুষিত করিতে পারে নাই ইহাও জননীর কম গৌরবের বিষয় নহে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কুমার শশিশেখরেশ্বর সাবালক হইয়া সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলে প্রথমেই প্রজাপুঞ্জের হীনাবস্থা কুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিপুল ব্যয়সাধ্য শিল্প, কৃষি কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া, নানারূপে পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়া ও নানাদেশ হইতে যন্ত্র ও বীজাদি আনাইয়া কৃষকসম্প্রদায়ের, কুমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। রেশম সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কুমার প্রণয়ন করিয়াছিলেন আজিও তাহা এ সম্বন্ধে চরম গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত। এ সময় গোধন-রক্ষা-কল্পে তিনি যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কোন পুস্তকই এত অধিক ভাষায় অনুদিত হয় নাই। ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কুমার যে সকল কবিতা-গ্রন্থ ও উচ্চাঙ্গের সন্দর্ভাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ও লেখক বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। এই সময়ে সহবাস-সম্মতি-

আইনের আন্দোলনে কুমার বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন এবং সাধারণে সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

কৃষক-সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে ইহার যত্ন ও অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হইয়া গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহাকে রাজোপাধি প্রদান করেন। এ উপাধিতে ভূষিত করিবার সময় তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সার ষ্টুয়ার্ট বেলি বলিয়াছিলেন :—

"The representative of an old and distinguished family, you have added to the distinction conferred by high birth, the nobler distinction which comes from intelligent and well-directed efforts for the benefit of the community. Your labours to improve and diffuse agricultural knowledge and so advance the welfare of your countrymen in this direction have attracted the attention of the government and in recognition of them His Excellency has been pleased to confer on you the title of Raja on which I desire sincerely to congratulate you."

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর রাজকীয় গাঁজা কমিশনের সদস্য স্বরূপে বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাচিত হয়েন; কৃষি-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে রাজা-বাহাদুরের গভীর অভিজ্ঞতাই তাঁহার এই উচ্চ সম্মানের কারণ। এইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইলে অনেকেই হয়ত কৃতজ্ঞতাবশতঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না; কিন্তু দেশহিতৈষী রাজা বাহাদুর নির্ভীকচিত্তে গাঁজার অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের মাতব্বরিতে গাঁজা ব্যবহারের ও বিস্তারের ঘোর প্রতিবাদ করেন। এই কমিশনের সংশ্রবে রাজার কার্য্যে ও পরিশ্রমে বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে

"রাজাবাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন ; স্যার এলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি সাহেব এই উপাধিপ্রদানকালে বলিয়াছিলেন :—

"You are an Ex-ward of Government and the Court of Wards has reason to be proud of its pupil. On taking personal charge of your estates you devoted yourself to the enlightened promotion of agriculture, and specially to the revival of silk industry. If all landed proprietors followed your example, Bengal would as a province, be greatly benefitted. In recognition of your services to the country at large and of your intelligent discharge of your duties as a landlord, you were in 1889 created Raja. To-day's advancement in dignity recognises your continued good work and specially the services rendered by you to Government as a member of the Hemp Drugs Commission."

রাজসাহীর কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে সি প্রাইস সরকারী রিপোর্টে রাজা বাহাদুরের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"In the course of my stay in the district, I got to be intimately acquainted with the heads of all the old noble families who had their ancestral homes within the sphere of my charge. First of all these was the Tahirpur Raj family which claims to be the most ancient not only in the Rajshahi District but I may say in the entire province of Bengal. Certainly I found the present head of the family, Raja Shashi Shekhareswar Ray one of the most enlightened noblemen that I have ever had the good fortune to know and become familiar with. The Raja is a throughly educated man, perfectly conversant with

English and entertains the most broad and liberal views regarding all matters which come under the purview of his enquiry and study. This is more than can be said of any nobleman that I am acquainted with.

There was no nobleman in Rajshahi who during my stay there commanded my sympathy and respect in a greater degree than Raja Shashi Shekhareswar Ray. The Raja comes of a very old family, one of his ancestors was a great social and religious reformer.

The family enjoys a higher prestige and is more respected than any of the representatives of the other noble families of central or northern Bengal."

রাজা বাহাদুর ১৮৯৮ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। লোকচরিত্রের নির্ভীক সমালোচক, ভারতবিখ্যাত "অমৃতবাজার পত্রিকা" রাজা বাহাদুরের এই সভ্যপদ সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"We must not forget to mention here the name of Raja Shashi Shekhareswar Ray Bahadur of Tahirpur, coming from one of the noblest families in Bengal; he is a worthy member of a worthy family. He is a patriot, nay, a philanthropist. He has done more than most men to serve his country. He led the Hindu Religious Congress; it was he who first tried to organise a Peoples' Association; it was he who established the Zamindary Panchayet. He has very few equals in India and scarcely any superior. His only drawback is that he is too modest and retiring."

রাজা বাহাদুর রাজসাহী ধর্ম্ম-সভার সভাপতি, রাজসাহী এসোসিয়েশনের সভাপতি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর, তীর্থ-যাত্রীর ক্লেশনিবারিণী সভার সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সদস্য, রাজকীয় গাঁজা কমিশনের সভ্য, ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সভাপতি, জমিদারী পঞ্চায়তের সভাপতি, মহামণ্ডল প্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর সভাপতি প্রভৃতি বহুলোক ও দেশহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন। রাজদ্রোহিতা বা কপটতা যেখানে তিনি দেখিয়াছেন সেখানে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন ও যেখানে তাহা দূর করিতে পারেন নাই, সেখানে তাহাদের সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন।

আজিকালি সকল ব্যাপারেই পাশ্চাত্য ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহার সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মপ্রাণ রাজা বাহাদুর তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই; ইদানীং দেশের আর্থিক উন্নতিই নেতৃগণের চরম লক্ষ্য হইয়াছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষপাতী রাজা বাহাদুর অগত্যা স্বেচ্ছায় সে নেতৃত্বপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

এই সকল কারণে হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া রাজা বাহাদুর অকালে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন। রাজনৈতিক সভা-সমিতির সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তিনি এক্ষণে পুণ্যতীর্থ কাশীধামের অনতিদূরে গঙ্গাতীরস্থ নাগেয়া গ্রামে তাঁহার শান্তিময় আশ্রমে বাস করিতেছেন। চিরকাল পরদুঃখকাতর রাজা বাহাদুর জনসাধারণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াও পরের ক্লেশে বা দুর্ব্বলের উৎপীড়নে স্থির থাকিতে পারেন না এবং ধর্ম্ম ও সমাজের সেবাতেও তাঁহার বিরাম নাই। তাই এখনও তাঁহার যশোগান মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রের সহায়তায় আমাদের কর্ণগোচর হয়।

দুর্ব্বল তুর্কীস্থান যখন অত্যাচারী রাজন্যবর্গের সমবেত চেষ্টায় বিপন্ন

হইয়া পড়িল, তখন রাজা বাহাদুরই সর্ব্বপ্রথমে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়া তুর্কীস্থানে সেবক-সম্প্রদায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

তাহিরপুর-রাজবংশের ধর্ম্মপ্রাণতা দেশপ্রসিদ্ধ। এই বংশের সকলেই ব্রাহ্মণোচিত ত্রিসন্ধ্যা, জপ, পূজা, হোমাদি করিয়া থাকেন এবং আহার ও বিহারে অতি সদাচারী ব্রাহ্মণের নিয়মাবলী পালন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অকৃত্রিম সৌজন্যে পরম সন্তোষলাভ করিতে হয়।

রাজসাহী পাকুড়ীয়া গ্রাম-নিবাসী সিদ্ধপুরুষ-বংশীয় ভবানীদাস ঠাকুরের কন্যা রাণী শরৎকামিনী দেবীর সহিত ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুরের বিবাহ হয়।

রাজা বাহাদুরের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। রাজা বাহাদুর তাঁহার পুত্র-ত্রয়কে বাল্যে বেদাধ্যয়নে নিয়োজিত করিয়াছিলেন ও পরে উপযুক্ত শিক্ষ-কের হস্তে তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত করিয়াছেন এবং নিজেরই আদর্শে তাঁহাদের চরিত্র গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শিবশেখরেশ্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর জন্ম-গ্রহণ করেন; কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বি-এ উপাধি গ্রহণ করিয়া জমিদারী কার্য্যে যোগদান করেন। জমিদারী পরিচালনে কুমার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী বিভাগের জমিদার-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সভাতেও কুমার তাঁহার স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীক আচরণের জন্য বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদকরূপে এবং অসবর্ণ বিবাহ-বিলের আন্দোলন-ব্যপদেশে কুমার বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুর-নিবাসী রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাহাদুরের কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে এবং এক্ষণে ইঁহার একটি মাত্র কন্যা সন্তান আছে।

দ্বিতীয় কুমার শান্তিশেখরেশ্বরের ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়। কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইনি শিক্ষা-লাভ করেন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এম-এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহের কন্যা কুলদা সুন্দরীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইঁহার এক্ষণে চারি পুত্র ও দুই কন্যা। স্বর্গীয়া জননীর সেবার জন্য তিনি পুরীধামে গিয়াছিলেন; এখনও সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তথায় মুানিসিপাল কমিশনার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি জনসাধারণের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি পুরীধামের সংবাদপত্র 'রত্নাকরে'র সম্পাদকীয় কার্য্যও করিতেছেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কুমার পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পুরীর "যক্ষ্মানিবাস"ও ইঁহারই চেষ্টা ও আনুকূল্যে স্থাপিত হইয়া দরিদ্র রোগি-গণের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে।

কনিষ্ঠ রাজকুমার শক্তিশেখরেশ্বর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ ক্লাশে অধ্যয়ন করিতেছেন।

নাড়াজোল-রাজবংশ।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান জমীদারদিগের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ইঁহাদিগের অনেকেই অল্পকাল পূর্ব্বে অর্থলাভ করিয়া প্রাচীন জমীদারদিগের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। ইঁহারা ইংরাজের আমলের জমীদার—লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমিসম্পত্তিতে অর্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভূস্বামী হইয়াছেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালার (বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার) সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পার্থক্য পরিস্ফুট। বাঙ্গালাতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদারগণ ভূমির উন্নতিলব্ধ বর্দ্ধিত কর-লাভের অধিকারী। তাঁহারা হাজা, শুকা ফৌতী, ফেরারী—কোন অজুহাতে রাজস্ব মাপ পাইতে পারেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে যে হারেই খাজনা আদায় করুন না কেন, সরকার তাহাতে অংশ পাইতে পারেন না। এই বন্দোবস্তের সময় সরকার স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদারগণ আপনাদের কৃতকর্ম্মের লাভ উপভোগ করিবেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই জমীদারীর উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইবেন।

বর্ত্তমানে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহু ইংরাজ রাজনীতিকের অপ্রিয়। তাঁহারা বলেন, সরকারই ভূমির অধিকারী—জমীদার আদায়কারী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিহেতু ভূমির মূল্য বর্দ্ধিত হইলে—অর্থাৎ খাজনার হার বর্দ্ধিত হইলে বর্দ্ধিত রাজস্বে সরকারেরই অধিকার—জমীদারের নহে। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালায় শাসন-ব্যয় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে—বর্দ্ধিত হওয়া অনিবার্য্য।

কিন্তু সরকার ভূমিকর বাড়াইতে পারিতেছেন না। ফলে সরকারকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে ; এই অজুহাতে তাঁহারা বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিতে বলেন; কিন্তু সরকার প্রতিজ্ঞা ও প্রতি-শ্রুতি ভঙ্গ করিয়া সে কার্য্য করেন নাই—করিবেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণও নাই। তবে সরকারও যে পূর্ব্বোক্ত মত একবারে পরিহার করিতে পারেন নাই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সকল লোকহিতকর প্রথারই অপব্যবহার হইতে পারে, স্থানে স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও অপব্যবহার হইয়াছে। স্থানে স্থানে জমীদারগণ নানারূপ "বাজে আদায়ে" প্রজাদিগকে বিব্রত করিয়াছেন। সেইরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই আইনে জমীদারের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছে এবং প্রজার অধিকার সুরক্ষিত—স্থানে স্থানে অতিরক্ষিত হইয়াছে—প্রজা অনেক বিষয়ে ভূমির স্বত্বাধিকারীর অধিকার পাইয়াছে। প্রচলিত প্রথা-অনুসারে আজও স্থানে স্থানে প্রজা জমী হস্তান্তর করিতে পারে না; কিন্তু প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনে ও পরবর্ত্তী নজীরে অনেক স্থানেই প্রজা প্রকারান্তরে সে অধিকারও পাইয়াছে। অথচ এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অশিক্ষিত, অমিতব্যয়ী প্রজার হস্তে এ অধিকারের অপব্যবহারের সম্ভাবনা সর্ব্বত্রই সপ্রকাশ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সরকারের পক্ষে ক্ষতিজনক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থার বিশেষত্ব বিচার করিলে এ ব্যবস্থা দেশোপ-যোগী বলিয়াই বোধ হইবে। কারণ, এই প্রথায় বর্দ্ধিত রাজস্ব—অর্থাৎ অনেক টাকা দেশের লোকের হাতেই থাকিয়া যায়—দেশের মধ্যেই ঘুরিতে থাকে, সঞ্চিত হইলে—একত্রিত হইলে দেশে ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তারের উপায় হয়। মূলধনের অভাবে এ দেশে বড় ব্যবসা পত্তন

করিতে হইলে বিদেশ হইতে মূলধন আনিতে হয়। এ অবস্থায় এ দেশের লোকের হাতে টাকা থাকা বিশেষরূপে অভিপ্রেত সন্দেহ নাই।

আর লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করেন, তখন দেশের অবস্থা শোচনীয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে ব্যবসা চালাইয়া অর্থলাভ করিতে আসিয়াছিলেন; দেশে রাজ্য-সংস্থাপনের স্বপ্ন তাঁহাদিগের অজ্ঞাত ছিল। তাঁহারা দেশের প্রজা-সাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়া অর্থ-অর্জ্জনেই ব্যাপৃত থাকিতেন। আবার তখন ভারতে মুসলমান শাসনের অন্তিমকাল উপস্থিত। আরঙ্গ-জেবের রাজত্বকালের শেষভাগেই মোগলপ্রতাপ ক্ষুণ্ণ হয়—তখনই বিদেশী বণিকগণ মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিয়াছিলেন। পশ্চিমে ইংরাজ-বাহিনী সুরাট হইতে তীর্থ-যাত্রীদিগের নৌকাগুলির গতিরোধ করিলে মহারাষ্ট্রশক্তি কর্ত্তৃক উত্যক্ত আরঙ্গজেব ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। শেষে বঙ্গদেশে আলিবর্দ্দী খাঁয়ের শাসন-সময়ে দিল্লীর শাসনদণ্ড আর বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পৌঁছিত না। বাঙ্গালাও তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে উৎপীড়িত। তখন গৃহ গ্রাম শূন্য করিয়া লোক বর্গীর ভয়ে পলায়িত। তাহার উপর আবার সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে লোক সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। শেষে পলাসী-ক্ষেত্রে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর হইতে বাঙ্গালার শাসনকার্য্য আরও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। তখন দেশ অরাজক। হেষ্টিংস বলিয়াছেন—দেশে তখন সর্ব্বত্র প্রজার দুর্দ্দশা। দস্যুদল লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ রাখিত না—তাহারা নির্ভয়ে সর্ব্বত্র লুণ্ঠনকার্য্য করিত। তাহাদিগকে বাধা দিবার ক্ষমতা কেবল জমীদারদিগের ছিল। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ বহু লাঠিয়াল রাখিতেন। দস্যুদল সর্ব্বপ্রযত্নে জমীদারদিগকে তুষ্ট

রাখিত—আবার জমীঁদারদিগের লাঠিয়ালেরাই অনেক স্থলে দস্যু হইয়া দাঁড়াইত। লোকের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। রাজস্বের জন্য অনেক পুরাতন জমীদারী বিকাইয়া গেল—ঠিকাদারী প্রথায় জমীদারী বিলি হইতে লাগিল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় লর্ড কর্ণওয়ালিস যে বাঙ্গালার জমীদারদিগকে অভয় দিয়া—দেশ শান্ত করিবার জন্য বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা তাঁহার শাসনবিষয়ে অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। আর এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রজা ও জমীদার উভয়কেই স্বত্ববিষয়ে নিশ্চিন্ত করিয়া বাঙ্গালার সমৃদ্ধিবৃদ্ধির উপায় করিয়া দিয়াছে।

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ও সময়ে বাঙ্গালার জমীদারদিগের ক্ষমতার অভাব ছিল না। তাঁহারা দেশের দস্যুতস্করের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা ত করিতেনই—প্রজারক্ষাও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্য ছিল এবং অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা সে কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের অনেকেরই ধনবল ও সকলেরই জনবল ছিল।

বর্ত্তমানে দেশে সেই প্রাচীন জমিদারদিগের বংশধরগণ প্রায়ই হীনাবস্থ হইয়াছেন—জমীদারী অন্য লোকের হস্তগত হইয়াছে। যে কয়টি প্রাচীন জমীদারবংশের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় নাই, পরন্তু প্রাচীন জমীদারদিগের বংশধরগণের হস্তেই থাকিয়া প্রাচীনের সহিত নবীনের—পুরাতনের সহিত নূতনের সংযোগ রক্ষা করিতেছে, নাড়াজোল-রাজবংশ তাহাদিগের অন্যতম। বাস্তবিক এই প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস অতীতের অন্ধকারে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সকল ঘটনার—ধারাবাহিক ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন সহজসাধ্য নহে। তাহার কারণও একাধিক। এ দেশের লোকের ইতিহাস-বিমুখতার অপবাদ বিদেশীয়দিগের মুখে বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছে; শেষে আমরাও বিশ্বাস

করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, মায়াবাদহেতু জীবন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী—পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দুর মত—এই বিশ্বাসবশে আমরা ইতিহাসরক্ষার চেষ্টা করি না। বঙ্কিমচন্দ্রও এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়-প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এ জন্য শুভের নাম 'দৈব,' অশুভের নাম 'দুর্দ্দৈব'। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতারাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা বিবেচনা করেন। এ জন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেব-কীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন; যেখানে মনুষ্য-কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে মনুষ্যগণ, হয়, দেবতার আংশিক অবতার, নয়, দেবানুগৃহীত, সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে; মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তি-বর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব, ও দেবভক্তি অন্ধ-জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্ব্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগেরই কীর্ত্তি; আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্ত্তব্য; অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এইজন্য গর্ব্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এই জন্য আমাদের

ইতিহাস নাই। অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি, বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই এক জন হত-ভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। এই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছিলেন যে, কোন প্রাচীন জাতিই পুস্তকের পৃষ্ঠায় আপনাদের রাজনীতিক বা সামাজিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই। কোন সভ্যতাই বায়ুহিল্লোলের মত চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলীন হয় না। সকল সভ্যতাই—সকল উল্লেখযোগ্য সভ্যতাই—শিল্পে ও সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্ম্মে আপনাদের স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়। সেইরূপ উপাদান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া—উপাদান আহরণ করিয়া—বিশ্লেষণ ও বর্জ্জন, সংগ্রহ ও সংযোগ করিয়া ইতিহাস রচিত হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে যে হেটিট জাতির অস্তিত্বকথাও ঐতিহাসিক-গণের বিশ্বাস্য বোধ হইত না—এইরূপ চেষ্টায় আজ সে জাতির ইতি-হাসও লিখিত হইয়াছে। ভারতের সাহিত্য বিপুল—বাস্তবিক অত্যন্ত আধুনিক বিষয় ব্যতীত আর সকল বিষয়ই ভারতীয় সাহিত্যে আলো-চিত হইয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, নাটক—সকল বিষয়ক রচনাই ভারতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছে। ভারতীয় শিল্প স্বাতন্ত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে আজ বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে। আজ আর এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গ্রীক আলেকজাণ্ডারের ভারতে আগমনের বহু পূর্ব্বেই ভারতে প্রস্তরস্থাপত্য প্রচলিত ছিল। তাহার বর্ত্তমান শিল্পীরা যেমন বিস্মৃত শিল্পীর শিল্প-কীর্ত্তি লেওকুনের ভগ্নাংশ পুনর্গঠিত

করিতে পারেন নাই, বর্ত্তমান কালের এঞ্জিনিয়ারগণও তেমনই অনেক স্থানে ভগ্ন ভারতীয় স্থপতিকীর্ত্তির সংস্কার করিতে পারেন নাই। উড়িষ্যার মন্দিরের উপাদান—বৃহৎ শিলাখণ্ডগুলি কিরূপে উচ্চে উন্নীত হইয়াছিল, তাহা আমরা আজও স্থির করিতে পারি নাই। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নৈপুণ্যও যে অসাধারণ ছিল—সে নৈপুণ্য যে বহু শতাব্দীর আলোচনার ফল, সে বিষয়েও আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ভারতীয় চিত্রশিল্পের উন্নতির প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। বিশেষ যে শিল্পাদর্শ ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে—ভারতীয় সভ্যতার প্রবাহে ভাসিয়া চীনে ও চীন হইতে জাপানে ও কোরিয়ায় নীত হইয়াছিল, সে শিল্পাদর্শ আজও চীনে, জাপানে ও কোরিয়ায় বর্ত্তমান। ভারতীয় সভ্যতা সমগ্র এসিয়ার সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত ও সংস্কৃত করিয়াছে। সে সভ্যতা শত দিকে শত রূপে আপনার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আবার যে জাতি অল্পকালস্থায়ী কাগজে বা বল্কলে ইতিহাস লিপিবদ্ধ না করিয়া প্রস্তরে সে ইতিহাস রাখিয়া যায়, ইতিহাসের হিসাবে সে জাতি অতি ভাগ্যবান। সে হিসাবে ভারতবাসীরা বিশেষ ভাগ্যবান। কারণ ভারতবাসীরা কালজয়ী পাষাণে আপনাদের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছে। এখন সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে—পাষাণের ভাষা বুঝিতে হইবে। আবার আমাদিগকে কিম্বদন্তীর ফেনপুঞ্জতলে সত্যের শীর্ণ ধারা আবিষ্কৃত করিতে হইবে। আমাদের এই আলোচ্য রাজবংশের প্রাচীন-কীর্ত্তি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত। সে সকল ইতিহাসের উপাদান—কেবল নাড়াজোল-রাজবংশের নহে, পরন্তু সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাসের—গৌরবের ইতিহাসের উপাদান। সে সকল গড়ের পরিচয় আজও গ্রামের নামে পাওয়া যায়—সে সকল দুর্গের চিহ্ন আজও বিলুপ্ত হয় নাই—সে সকল পরিখার খাত আজও

মুছিয়া যায় নাই—সে সকলের মৌন কাহিনী ইতিহাসের উপকরণ। এই সকল দুর্গে কতবার জেতার উল্লাস-ধ্বনি, জিতের আর্ত্তনাদ, অস্ত্র-ঝনৎকারে মিশিয়া রজনীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়াছে; এই সকল স্থানের ভূমি কত বার কত বীরের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে! সে সকল কথা কি বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করা অসম্ভব? কত দেবালয়ে, জলাশয়ে, রাজপথে, সেতুতে, তীর্থে, প্রাসাদে আজও কত স্মৃতি বিজড়িত। এই যে রাজবংশ এদেশে ইংরাজশাসনের বহুপূর্ব্ব হইতে বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রজাপালন করিয়া আসিয়াছেন—লোকরক্ষা ও লোকহিত কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন—ইঁহাদিগের ইতিহাসের উদ্ধার হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের নূতন উপাদান সঞ্চিত হইবে। যখন ইঁহারা ক্ষমতাগৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন, তখন জমীদারদিগের ইতিহাস অনেক স্থলে দেশের ইতিহাস। এই সকল জমীদারের সাহায্য ব্যতীত তখন শাসকদিগের পক্ষে দেশশাসন অসম্ভব হইত। জলপথবহুল, অরণ্যাবৃত, রাজপথবিরল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রাজধানীর শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা তখন অসম্ভব ছিল। তাই তখন বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই জমীদারেরা বহু পরিমাণে স্বাধীনই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীনতা ঘোষণাও করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে পরাভূত করাও মুসলমান রাজশক্তির পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই।

মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর প্রদেশ অল্পদিনের নহে। পূর্ব্বকালে এই জিলার পূর্ব্ব-ভাগ মৎস্যজীবী ও নাবিকগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। এই ভূভাগ সমুদ্র অপেক্ষা অধিক উচ্চ নহে এবং সমুদ্রের ও হুগলীর মোহনার সন্নিকটে অবস্থিত। এরূপ স্থানে মৎস্যজীবী ও নাবিকদিগের ব্যবসায়ের সুবিধা,

সন্দেহ নাই। যে সময় হইতে ইতিহাস পাওয়া যায় সেই সময় হইতেই তাম্রলিপ্তি বন্দরের প্রসিদ্ধি। ইহার সন্নিকটে কৈবর্ত্তগণ বাস করিত। নৌচালন ও মৎস্যবিক্রয়ই তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় ছিল। অশোকের অনুশাসনে ইহারা কেবট (কেওট) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদেও কৈবর্ত্তদিগের উল্লেখ আছে। পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তখনও বর্ত্তমান সময়ের মত বনাবৃত ছিল। এই প্রদেশে যে সকল যাযাবর জাতির বাস ছিল, তাহারা বনজাত আহার্য্যে ও শিকারলব্ধ মাংসে উদরপূর্ত্তি করিত। তাহাদের মধ্যে অনেক জাতি গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অরণ্যমধ্যে বাস করিত। ইহাদিগের মধ্যে শবরদিগের নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি সবর ও লোধ (লুব্ধক) নামে পরিচিত। গোপী-বল্লভপুর থানার এলাকায় যে সকল স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যায়, সে সকল সম্ভবতঃ এই সময়ের। বনদেশ ও সমুদ্রতীর এতদুভয়ের মধ্য দিয়া যে পথ ছিল সেই পথেই লোক মগধ ও সুহ্ম হইতে কলিঙ্গে গতায়াত করিত। এই প্রত্যন্ত প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যমধ্যস্থ ছিল কি না, নিশ্চয় জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ এই প্রদেশও তাঁহার অধিকারাধীন হইয়াছিল—কারণ, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দ নৃপতির নিকট হইতে বঙ্গের রাজত্বভার গ্রহণ করেন এবং তাম্রলিপ্তি বন্দর তখনও বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহা হইলে তিনি যে তাম্রলিপ্তির মত প্রসিদ্ধ বন্দর রাজ্যভুক্ত করেন নাই, এমন মনে হয় না। নদীমাতৃক বাঙ্গালার বাণিজ্য তখন জলপথেই প্রবাহিত হইত। এ অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের মত প্রতাপশালী রাজার পক্ষে বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বন্দর অধিকৃত করিবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। তাম্রলিপ্তি বন্দর

হইতে বাঙ্গালার পণ্য প্রাচীর নানাদিকে প্রেরিত হইত। এই পথে বাঙ্গালী সিংহলবিজয় ও যবাদিদ্বীপে উপনিবেশসংস্থাপনে যাত্রা করিয়াছিল—সাফল্য লাভও করিয়াছিল। এই পথে বৌদ্ধমতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা চীনে, কোরিয়ায় ও জাপানে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সভ্যতাই আজও প্রাচীর সভ্যতা, সেই সভ্যতার চিহ্ন আজও চীনের ও জাপানের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে ও চিত্রশিল্পে সপ্রকাশ।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাম্রলিপ্তি যদি তাঁহার রাজ্যভুক্ত নাও থাকিয়া থাকে, তদীয় ভাগ্যবান পৌত্র অশোক যখন (২৬১ খৃঃ পূঃ) কলিঙ্গবিজয় করেন, তখন যে এই প্রদেশ মৌর্য্যসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন তাম্রলিপ্তি বঙ্গোপসাগরে সর্ব্বপ্রধান বন্দর। বৌদ্ধগ্রন্থ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বন্দরেই লঙ্কা ও চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ নৌকা হইতে অবতরণ করিতেন এবং এই বন্দর হইতেই তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষ তখন চীনদেশীয়দিগের নিকট তীর্থস্থান। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য ও এই পুণ্যভূমি দর্শনার্থ চীনদেশ হইতে পর্য্যটকগণ ভারতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এ দেশের যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের উপাদানে পূর্ণ—ঐতিহাসিকের অবলম্বন। লঙ্কাধিপতির দূত যখন অশোকের দর্শনপ্রার্থী হয়েন, তখন তিনি এই বন্দরেই নৌকা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন; আবার তাঁহারা যখন বোধিদ্রুমশাখা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখনও তাঁহারা এই বন্দরে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অশোক এই তাম্রলিপ্তিতে একটি স্তূপ সংগঠিত করাইয়াছিলেন।

যখন মৌর্য্যসম্রাট বৃহদ্রথ তাঁহার সেনাপতি কর্ত্তৃক নিহত হয়েন

(১৮০ খৃঃ পূঃ), তখন মৌর্য্যসাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হয়। উদয়গিরির হস্তীগুম্ফায় উৎকীর্ণ লিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, কলিঙ্গের রাজা খারবেল মগধ আক্রমণ করেন এবং মগধের রাজা পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ এই সময় কলিঙ্গের নৃপতিরা আবার মেদিনীপুর জয় করেন। মহাভারতে দেখা যায়, কলিঙ্গ তখন গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। তবে তখনও যে বর্ত্তমান মেদিনীপুর তাম্রলিপ্তি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাভারতে এই তাম্রলিপ্তি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লিখিত আছে। কেবল তখন তাম্রলিপ্তি কলিঙ্গের অধীন ছিল কি না, প্রমাণের অভাবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। তখন সকল নৃপতিই যে এই বন্দর অধিকারে সচেষ্ট হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই বন্দর-পথেই বাণিজ্যের স্রোতে রাজ্যে অর্থাগম হইত।

ইহার পর তাম্রলিপ্তি গুপ্তরাজাদিগের করতলগত হয়। খৃষ্টীয় ৪০৫ হইতে ৪১১ অব্দের মধ্যে চীনদেশীয় পর্য্যটক ফা-হিয়ান যখন তাম্রলিপ্তিতে আগমন করেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি বলিয়াছেন, তাম্রলিপ্তি রাজ্য সমুদ্রকূলে অবস্থিত এবং ইহাতে ২৪টি বৌদ্ধবিহার বর্ত্তমান; বিহারে পুরোহিতগণ (শ্রমণ ?) বাস করেন; রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম সমাদৃত। ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তিতেই দুই বৎসর বাস করেন। এই সময়ে তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ নকল করিয়া লয়েন ও বহু মূর্ত্তি-চিত্র অঙ্কিত করেন। তাহার পর এই তাম্রলিপ্তি হইতেই তিনি সওদাগরী জাহাজে গঙ্গার পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার বিবরণ-পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তখনও তাম্রলিপ্তি সমৃদ্ধি-শালী বন্দর ছিল। টলেমীও (১৫০ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার ভূগোলে তাম্র-

লিপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গঙ্গাতীরে যে "টামালাইটস"এর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই এই সমৃদ্ধ তাম্রলিপ্তিরাজ্য।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, দেবরক্ষিত কোশল, ওড্র, তাম্রলিপ্তি ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর রক্ষা করিতেন।

গুপ্তবংশের অধঃপতনের পর তাম্রলিপ্তি দেবরক্ষিতের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গীয় নৃপতি শশাঙ্ক ও তৎপরে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন তাম্রলিপ্তিরাজ্য জয় করেন। তাঁহাদের উভয়েরই রাজ্য বর্ত্তমান গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে (৬৪০ খৃষ্টাব্দ) চীনদেশীয় পর্য্যটক হিউয়েন্থসাং তাম্রলিপ্তিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, এই দেশের বিস্তৃতি ১৪০০ বা ১৫০০ লী (২৫০ মাইল)। সমুদ্র ইহার সীমা। এদেশের ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বর—নিয়মিতরূপে কর্ষিত হয়। এই ভূমিতে প্রচুর ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়। দেশটি উষ্ণপ্রধান। এ দেশের লোকের ব্যবহার ব্যস্ততা ও অস্থিরতা-ব্যঞ্জক। তাহারা কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে। এই স্থানে প্রায় ১০টি সঙ্ঘারাম আছে—পুরোহিতের সংখ্যা প্রায় এক সহস্র। দেবমন্দিরের সংখ্যা ৫০—সেগুলিতে নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্র বাস করে। এদেশে বহু বহুমূল্য দ্রব্য ও মণি বহুলপরিমাণে পাওয়া যায়। সেই জন্য দেশের লোক ধনবান। সহরের পার্শ্বে অশোকনির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান। তাহার পার্শ্বে চারিজন পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের উপবেশন ও ভ্রমণের চিহ্ন আছে। এই স্থান হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৭০০ লী দূরে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত।

ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তিতে ২৪টি বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন—হিউয়েন্থসাং ১০টি মাত্র সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই সময় বঙ্গে বৌদ্ধমতের নির্জ্জীবতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইত।

হিউয়েন্থসাং তাম্রলিপ্তি হইতে জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, মনস্থ করেন। কিন্তু ঘূর্ণাবর্ত্তের জন্য অনেকে তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বলেন এবং শেষে তিনি স্থলপথেই স্বদেশে গমন করেন।

অন্যান্য চীনদেশীয় পর্য্যটকও এই বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। ৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইটসিং এই বন্দরে অবতরণ করেন। কোরিয়াদেশবাসী হুরলুন বলিয়াছেন—এই স্থান সমুদ্র-সন্নিকটস্থ। পূর্ব্ব-ভারত হইতে এই স্থানে আসিয়া জলপথে চীনযাত্রা করিতে

ইহার পরও কিছুকাল তাম্রলিপ্তি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুন্ন ছিল। শেষে ইহা পশ্চিম-বঙ্গের (রাঢ়) অন্তর্ভুক্ত হয়। ১০২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজেন্দ্রচোল দেব রণাশূরের শাসনাধীন উত্তর রাঢ় আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাতে তিনি বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। ইহার এক শতাব্দী পরে উত্তর রাঢ়ের অধিপতি মন্দার চোড়গঙ্গা দেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে মেদিনীপুরসহ সমগ্র উত্তর রাঢ় তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময় হইতে তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধিনাশ আরব্ধ হয়। তখন তাম্রলিপ্তি গঙ্গাবংশীয় নৃপতিদিগের রাজ্যের সীমান্ত নগরমাত্রে পর্য্যবসিত হয় ও বহুবার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হয়।

তাম্রলিপ্তির দুর্দ্দশার আর একটি কারণ ছিল। তাম্রলিপ্তি পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কিন্তু কোরিয়াদেশবাসী হুরলুনই বলিয়াছেন—ইহা সমুদ্র-সন্নিকটস্থ। পূর্ব্বে এই বন্দরেই বাঙ্গালার সওদাগরী জাহাজ ভিড়িত। ক্রমে সমুদ্র সরিয়া গেল—বন্দর নষ্ট হইয়া গেল—বাণিজ্য অন্য পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন যে তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধিনাশের জন্য রাজনীতিক কারণ অপেক্ষাও দায়ী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে কারণে কনার্ক তীর্থে আর যাত্রীর সমাগম নাই সেই কারণেই তাম্রলিপ্তির গৌরবহানি হইয়াছিল; সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে

বাণিজ্যপ্রবাহও সরিয়া গিয়াছিল; তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্যসূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়াছিল।

তাহার পর বাঙ্গালীর রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে নূতন নাটকের অভিনয় আরব্ধ হইল। নূতন অভিনেতারা নূতন ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া বাঙ্গালায় দেখা দিলেন। মুসলমানদিগের আক্রমণে বাঙ্গালা দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। 'সপ্তদশ অশ্বারোহী'র ভয়ে বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি রাজ্যত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, আর মুসলমান বিনাযুদ্ধে বাঙ্গালাবিজয় করিয়াছিলেন—এ কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। মুসলমান বহুদিনের চেষ্টায় বহু অর্থ ও জীবন ব্যয় করিয়া বঙ্গে রাজ্যাধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন।

মুসলমানগণ উড়িয়াদিগকে ক্রমে দক্ষিণদিকে বিতাড়িত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুদিন দামোদরনদ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তখন মেদিনীপুর ও বর্ত্তমান হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমা উড়িষ্যার প্রান্তদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। হুশেন সাহার শাসনকালে (১৪৯৩—১৫১৮ খৃঃ) আরামবাগ কিছু-দিনের জন্য উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অধিকারচ্যুত হয়। কিন্তু শের সাহের বংশধরদিগের সময় মুসলমানদিগের অন্তর্বিপ্লবের সুযোগে উড়িয়া রাজা মুকুন্দ হরিচন্দন হুগলী জিলার ত্রিবেণী পর্য্যন্ত স্বাধিকারভুক্ত করেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আফগান নৃপতি সুলেমান তদীয় পুত্র বৈয়াজিদকে সেনাপতিত্বে বৃত করিয়া উড়িষ্যা-জয়ার্থ প্রেরণ করেন। বৈয়াজিদ ঝাড়খণ্ড পার হইয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। উড়িয়া রাজা পরাজিত হয়েন ও পরে স্থানীয় বিদ্রোহদমনকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপে মেদিনীপুর ও চিল্কা-হ্রদ পর্য্যন্ত উড়িষ্যাখণ্ড আফগানদিগের হস্তগত হয়।

উড়িয়া নৃপতিদিগের রাজত্ব সার্দ্ধচারিশতাব্দীকালব্যাপী হয়। এই সময় প্রত্যন্ত প্রদেশ বলিয়া মেদিনীপুরে অশান্তির অন্ত ছিল না। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মেদিনীপুর জিলার মধ্য দিয়া পুরীতে গমন করেন। তাঁহার চরিতকথায় তৎকালে এই প্রদেশের বিবরণ জানিতে পারা যায়। তখন দেশ অরাজক—স্থানে স্থানে হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—গ্রামসংখ্যা অল্প—লোক যবনের ভয়ে অস্থির—কৃষিকার্য্যেও লোকের আর তেমন উৎসাহ নাই। এইরূপ অবস্থায় সমৃদ্ধ তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হয়।

আফগানদিগের শাসনেও মেদিনীপুরের অবস্থার উন্নতি হয় নাই। সুলেমানের জীবনের শেষ কয় বৎসর উড়িষ্যায় বিদ্রোহদমনেই ব্যয়িত হয়। তদীয় পুত্র দায়ূদ খাঁ সম্রাট আকবরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রায় ৩০ বৎসরকাল মেদিনীপুরে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার প্রভুত্ব লইয়া মোগলদিগের সহিত আফগানদিগের যুদ্ধ হয়। এ অবস্থায় লোকের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। 'চণ্ডী' কাব্যে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" অংশে কবিকঙ্কন এই সময়ে প্রজার দুর্দ্দশার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বাধ্য হইয়া দামুন্যা ছাড়িয়া আরড়ায় গমন করেন।

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ ;
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
হৈল রাজা দায়ুদ সরিপ ॥
উজীর হলো রায়জাদা, ব্যাপারিরা ভাবে সদা ;
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হলো অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনের কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি ॥

সরকার হৈল কাল, খিল ভূমি লিখে মাল ;
বিনা উপকারে খায় ক্ষতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ ;
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
প্রজারা ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গরু নিত্য ;
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা॥

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে দায়ুদ খাঁয়ের বিদ্রোহ হইতেই দেশের এই দুর্দ্দশা আরব্ধ হয়। মোগলদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া এবং পাটনা ও রাজধানী তাঁড়া হারাইয়া দায়ুদ খাঁ তাঁহার বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন সেনা-দল একত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে সপ্তগ্রাম হইতে দিনকশারীতে গমন করেন। দিনকশারী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কেশীয়ারী। টোডরমল্ল দায়ুদ খাঁয়ের অনুসরণ করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া উত্তরমল্ল রাজপ্রতিনিধি মুনিম খাঁয়ের নিকট আরও সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। মুনিম তদনুসারে মহম্মদ কুলী খাঁয়ের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ করিলেন। সম্মিলিত মোগলবাহিনী দিনকশারীর দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোয়াল-পাড়ায় (পরগণা কাশীজোড়া ও সাহপুর) গমন করিল। দায়ুদ ধারপুরে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দায়ুদের

ভ্রাতা জুনাইদ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন জানিতে পারিয়া টোডরমল্ল তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইলে টোডরমল্ল স্বয়ং সসৈন্যে তাহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। আফগানগণ তাঁহার সহিত সংগ্রামে পরাজয়হেতু বনে পলায়ন করিল। দায়ূদ পশ্চাদ্দিকে গমন করিলেন। টোডরমল্ল মেদিনীপুরে শিবিরসংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কয়দিনের পীড়ায় মহম্মদ কুলী খাঁয়ের জীবনান্ত হইল। এই সময় মোগল সেনানায়কদিগের মধ্যে মনোমালিন্য সপ্রকাশ হইল। মুসলমান আমীর ওমরাহদিগের উপর স্বীয় প্রভুত্বে সন্দিহান হইয়া টোডরমল্ল মদারণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় কোন কোন আমীর তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি এই সব সংবাদ মুনিম খাঁয়ের গোচর করিলে মুনিম তাঁহার সাহায্যার্থ আর কয়জন আমীরকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন টোডরমল্ল বর্ত্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চিতোয়ায় গমন করিলেন। তথায় মুনিম আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এদিকে দায়ূদ খাঁ আবার সেনা সংগ্রহ করিয়া শত্রুদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন ও উড়িষ্যায় যাইবার পথ বন্ধ করিয়া হরিপুরে পরিখা খনন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মুনিম খাঁ তাঁহার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিলে তিনি প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন।

দুই পক্ষে সৈন্যসংখ্যা প্রায় সমান ছিল। তবে আফগানদিগের দুই শত হস্তী ছিল। আফগানগণ মনে করিয়াছিল, তাহারা হস্তী দিয়া মোগলদিগের সেনাদল ভগ্ন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যাইয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে। কিন্তু মোগলদিগের কামান ছিল। সেই কামানের গোলায় অস্থির হইয়া হস্তীগুলি পলাইল।

তথাপি আফগান অশ্বারোহীরা মোগল বাহিনীর মধ্যভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া বিখ্যাত সেনানায়ক খান-ই-আলমকে নিহত করিল। মুনিম খাঁ আহত হইলেন এবং তাঁহার অশ্ব আরোহীকে লইয়া পলাইয়া গেল। মোগল সেনাদল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল—তাহাদের পরাজয় আসন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। টোডরমল্ল তখন দক্ষিণ দিকে সৈন্যচালনা করিতে-ছিলেন। মোগল সেনার দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সবেগে আফগানদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং বলিলেন, খান-ই-আলমের মৃত্যুতে কি আইসে যায়? মুনিম খাঁয়ের পলায়নে ভয় কি? আমরাই এ সাম্রাজ্যের অধিকারী। টোডরমল্লের আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, আফগান বাহিনী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। দায়ূদ খাঁ দেখিলেন, তাঁহার পক্ষে বহু নায়ক নিহত হইয়াছেন, তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। তিনি ভগ্নোদ্যম হইয়া কটকে পলাইলেন। কটক হইতে তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে সম্রাট তাঁহাকে উড়িষ্যা হস্তগত রাখিবার অনুমতি প্রদান করেন।

বাঙ্গালায় মোগল ও আফগানে যে সব যুদ্ধ হয়, তাহার মধ্যে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখের এই যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৬ মাইল দীর্ঘ স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহা মোগলমারীর যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। বাদশাহী সড়ক হইতে অদূরে অবস্থিত মোগলমারী গ্রামের নামে এই বিষম সংগ্রামের স্মৃতি সংরক্ষিত রহিয়াছে।

ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে গৌড়ে জ্বরে মুনিম খাঁয়ের মৃত্যু হইলে দায়ূদ খাঁ আবার বিদ্রোহবৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া মোগলের প্রাধান্য অস্বীকার করিলেন। তিনি পুনরায় বাঙ্গালা অধিকৃত করেন বটে;—কিন্তু তাঁহার সাফল্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। পরবৎসর জুলাই মাসে তিনি রাজমহলে পরাজিত ও ধৃত হইলে তাঁহার প্রাণদণ্ড প্রদত্ত হয়।

তাঁহার মৃত্যুতে ভগ্নোৎসাহ আফগানগণ আবার মোগলের অধীনতা স্বীকার করিল এবং আবার বিদ্রোহবিজ্ঞাপনের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আফগানগণ যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, অল্পকাল মধ্যেই সেই সুযোগ পাইল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহের সেনাদলে বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই সুযোগে কৎলু খাঁয়ের অধীনে উড়িষ্যার আফগানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ করতলগত করিল। আকবরের সেনানায়কগণ তিন বৎসর কাল চেষ্টার ফলে বিদ্রোহী মোগলদিগকে পরাভূত করিয়া সমগ্র বিহার ও বাঙ্গালার অধিকাংশ পুনরায় অধিকৃত করিলেন। তখন দামোদর নদ পর্য্যন্ত ভূভাগ আফগানগণের অধিকৃত। শেষে বাদশাহের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে মোগলবাহিনী আফগানদিগকে পরাভূত করিতে অগ্রসর হইল। কৎলু খাঁ বাধ্য হইয়া উড়িষ্যায় ফি'রলেন। পর বৎসর আফগানেরা আবার যুদ্ধোদ্যোগ করিল; কিন্তু মোগলদিগের আক্রমণে পলায়নপর হইয়া তারকুয়া পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়া ধরমপুরের বনে আশ্রয় লইল। ইহার পর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কৎলু খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন—কৎলু খাঁ মোগলপ্রাধান্য স্বীকার করিয়া অধীনস্থ নৃপতিরূপে উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর শাসন করিতে লাগিলেন।

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিহারের শাসনকর্ত্তা মানসিংহ আফগান-অধিকৃত এই প্রদেশ দখল করিবার চেষ্টা করেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে পথে বর্ষাকালের আগমনহেতু বর্ত্তমান হুগলী জিলার আরামবাগে (তৎকালে জাহানাবাদ নামে পরিচিত) শিবির সংস্থাপন করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি পুরোভাগে স্বীয় পুত্র জগৎসিংহের নেতৃত্বে যে সেনাদল পাঠাইয়াছিলেন তাহারা আফগান কর্ত্তৃক পরাভূত হয়।

কিন্তু ধরমপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পর তথায় কৎলু খাঁর মৃত্যু হইলে আফগানগণ আবার সন্ধি করে। এ সন্ধিও অল্প দিন পরেই ভঙ্গ হয়। আফগানেরা জগন্নাথ দেবের মন্দির ও বিষ্ণুপুরের রাজার রাজ্য দখল করিলে মানসিংহ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। আফগানগণ মেদিনীপুরের জঙ্গলে আশ্রয় লয় ও স্থবর্ণরেখা নদীর তীরে দুইদলে প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আফগানগণ পরাভূত হয় ও মানসিংহ জলেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

দেশে শান্তি-সংস্থাপনোদ্দেশ্যে মানসিংহ কতকগুলি আফগানকে খলিকাতাবাদ জায়গীরে প্রেরণ করেন। এই খলিকাতাবাদ বর্ত্তমান যশোহর জিলার দক্ষিণে ও খুলনা জিলায় অবস্থিত। কিন্তু মানসিংহের এ কৌশল সফল হয় নাই। একবার তিনি কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া যাইলেই উড়িষ্যার আফগানগণ ওসমান স্থজাওয়ালের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং আবার উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ অধিকৃত করে। এই সংবাদ পাইয়া মানসিংহ দ্রুত আজমীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও বর্ত্তমান বীরভূম জিলার অন্তর্গত শেরপুর আতাই নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করেন (১৬০১ খৃঃ)। ওসমান উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও দশ বৎসর পরে আবার যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয়েন। সেবার তিনি বিংশ সহস্র সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। স্থবর্ণরেখা নদীর কূলে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েন। ইহার পর আফগানগণ আর মোগলদিগকে বিব্রত করিতে পারে নাই।

আফগান-প্রাধান্যকালে এই জিলা জলেশ্বর সরকার ও মদারণ সরকার এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। চিত্না, মণ্ডলঘাট ও হিজলী—অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব ভাগ প্রথম সরকারের এবং অবশিষ্ট অংশ

দ্বিতীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন রাজস্বের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার অধিকই ছিল।

তৎকালে সমুদ্রকূলে লবণ প্রস্তুত হইত। কিন্তু লবণে ও কাষ্ঠাদি বনজাত দ্রব্যে কত রাজস্ব আদায় হইত, তাহা জানা যায় না। বাদশাহী শড়কই প্রধান রাজপথ ছিল—এই পথেই সেনাদল গতায়াত করিত। বর্দ্ধমান ও সপ্তগ্রাম হইতে দুইটী রাস্তা আসিয়া জাহানাবাদে এই শড়কের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এই পথ দ্বারকেশ্বর নদীর ধার দিয়া গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই স্থান হইতে ইহা পূর্ব্বমুখে মেদিনীপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। জলেশ্বরে সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত যে সুখগম্য পথ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুসলমান সম্রাটগণ ও শাসনকর্ত্তারা শাসন-সৌকর্য্যার্থ দেশ মধ্যে বহু রাজপথ নির্ম্মিত করাইয়া-ছিলেন। অদ্যাপি অনেক স্থলে সেই সকল রাজপথই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশ মোগলের অধিকৃত হইবার পরও মেদিনীপুর সুবা উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন-সময়ে রাজধানী দিল্লী হইতে উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা বহাল হইতেন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তখন উড়িষ্যা তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীন করা হয়। তিনি যখন দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন (১৬৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত), তখন বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার নূতন বন্দোবস্ত হয় এবং জলেশ্বর সরকার উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গের অঙ্গীভূত করা হয়। তখন ইহা ছয় সরকারে বিভক্ত হয়, তাহার তিনটির অধিকাংশই বর্ত্তমান বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত। তটভূমি পর্টুগীজ ও আরাকানী বোম্বেটিয়াদিগের আক্রমণ হইতে

সুরক্ষিত করিবার জন্যই এই বন্দোবস্ত করা হয়। তখন নবাবের নৌবহর (নওয়ারা) চাকরা থাকিত। সুতরাং বঙ্গের অঙ্গীভূত প্রদেশে জলদস্যুদিগকে শাসন করাই সহজ ছিল।

এই সময়ে মেদিনীপুরে বাণিজ্য উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তখন তমলুক পূর্ব্ব সমৃদ্ধি হারাইয়াছে বটে, কিন্তু হিজলী বিরাট বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রালফ ফিচ লিখিয়াছিলেন—"এই এঙ্গেলী বন্দরে প্রতি বৎসর ভারত (?) নাগাপট্টম, সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি বিবিধ স্থান হইতে বহু তরী সমাগত হইত এবং তথা হইতে চাউল, কার্পাস, সুতার কাপড়, পশম, চিনি, মরিচ, মাখন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইত।" হিজলীতে পর্টুগীজদিগের একটা কুঠী ছিল। কিন্তু মোগলেরা ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডাচ্‌গণ তথায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবসায় প্রতিদ্বান্দ্বরূপে ইংরেজ দেখা দেন। হুগলী (গঙ্গা) নদীতে জাহাজ চালান বিপজ্জনক বলিয়া বড় বড় ইংরাজ জাহাজ হিজলীতে বোঝাই ও খালাস করা হইত। ইহার পর ইংরাজেরা চিনির জন্য চন্দ্রকোণায় এবং কার্পাস বস্ত্র ও রেশমী রুমালের জন্য প্রসিদ্ধ রাধানগরে বাণিজ্য বিস্তার করেন। ফরাসীরা ও ডাচরাও ঘাটাল মহকুমায় লোক পাঠাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবসা ইংরাজের ব্যবসার মত বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

ভ্যালেণ্টীন ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন—"পূর্ব্বে হিঙ্গলীতে (হিজলী) আমাদিগের (ডাচদিগের) অন্যতম প্রধান কুঠী ছিল। পর্ত্তুগীজেরাও এই স্থানে আবাস ও গির্জ্জা নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে, কেন্দুয়ায়, কেনকায় (?) ও ভদ্রকে চাউল প্রভৃতি বিক্রীত হইত। শেষে আমরা এসব স্থান ত্যাগ করি। তাম্বুলী ও বাঁজি য়

নামক গ্রামদ্বয়ে পর্ত্তুগীজদিগের গির্জ্জা আছে—তাহাদের ব্যবসাও আছে। এইস্থানে মোমের ব্যবসা প্রসিদ্ধ।” এই বিবরণ পাঠে বুঝা যায়, তখনও তাম্বুলী (তাম্রলিপ্তি) একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই এবং তথায় একটী পর্ত্তুগীজ গির্জ্জা ছিল। গামেলী কাবেরী ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনিও বলিয়াছেন, পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালায় তাম্বুলীন জয় করিয়াছিল।

সিহাব-উদ্দীন-তালিশের ফার্সিতে লিখিত বিবরণে দেখা যায়—তাম্রলিপ্তিতে ক্রীতদাসের ব্যবসাও চলিত। সম্রাট আকবরের রাজত্ব-কালে বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়া হইতে শায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলে চট্টগ্রাম বিজয় পর্য্যন্ত মগ ও ফিরিঙ্গী বোম্বেটিয়ারা জলপথে বাঙ্গালার নানাস্থানে ডাকাইতি করিত। তাহারা হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা যাহাকে পাইত তাহাকেই ধরিয়া নৌকায় তুলিত—তাহাদের কর ছিদ্র করিয়া ছিদ্র মধ্যে পিষ্ট বেত্র দিয়া রাখিত ও তাহাদিগকে স্তূপাকারে নৌকার পাটাতনের নিম্নে রাখিয়া দিত। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় মুর্গীকে ধান দিবার মত তাহাদিগকে কিছু কিছু চাউল ছড়াইয়া দেওয়া হইত। সময় সময় তাহারা চড়া দরে বিক্রয় করিবার জন্য এই সকল হতভাগ্যকে তমলুকে ও বালেশ্বর বন্দরে আনিত। দস্যুরা কূল হইতে কিছু দূরে নৌকা বান্ধিয়া সংবাদ দিয়া সহরে নৌকা পাঠাইত। পাছে দস্যুরা কূলে নামিয়া ডাকাইতি করে, এই আশঙ্কায় স্থানীয় কর্ম্মচারীরা লোক লইয়া কূলে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং টাকা দিয়া নৌকায় লোক পাঠাইয়া দিতেন। দরে বনিলে দস্যুরা টাকা লইয়া প্রেরিত লোকের সঙ্গে বন্দীদিগকে পাঠাইয়া দিত। ফিরিঙ্গী দস্যুরাই বন্দীদিগকে বিক্রয় করিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনবার মেদিনীপুরের শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল।

১৬২২ খৃষ্টাব্দে উত্তরকালে সম্রাট শাহজাহান নামে সুপরিচিত কুমার করাম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়েন এবং উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা আহাম্মদ বেগ খাঁ পলাইয়া বর্দ্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান অধিকৃত ও নবাব ইব্রাহিম খাঁকে নিবৃত্ত করিয়া কুমার বঙ্গবিজয় করিয়া দুই বৎসর বঙ্গাধিকারী ছিলেন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সেনাদল এলাহাবাদের সন্নিকটে তাঁহাকে পরাজিত করিলে তিনি মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন।

তাহার পর বাঙ্গালার নবাবের সহিত ইংরাজের বিবাদ-নাটকের এক অঙ্ক মেদিনীপুরে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। জব চার্ণক হুগলী ত্যাগ করিয়া গঙ্গার মোহানার দিকে অগ্রসর হয়েন এবং টানার দুর্গ বিনষ্ট করিয়া সেনাদলের অর্দ্ধাংশ ও নৌবহর দিয়া হিজলী দখল করিবার জন্য কাপ্তেন নিকলসনকে প্রেরণ করেন। নিকলসন অনায়াসে হিজলী দখল করিয়াছিলেন; কারণ মুসলমানেরা পূর্ব্বেই সেইস্থানের দুর্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। চার্ণক স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তথায় উপনীত হয়েন ও আক্রমণ-আশঙ্কা করিয়া দুর্গ সুরক্ষিত করিতে থাকেন। হিজলী তখন বর্ত্তমান সময়ের মত বাঁধ দিয়া সুরক্ষিত ছিল না। তখন ইহা নিম্ন জলাভূমি—সাগর-গর্ভ হইতে সদ্যোত্থিত ও প্রবাহপুঞ্জ দ্বারা ভূমিখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন। এই স্থান তখন বন্য বরাহ, বন্য মহিষ, হরিণ ও ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অকর্ষিত—ভূমি উর্ব্বরা হইলেও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অকর্ষিত। এই স্থানে চার্ণক চারি শত সহচর লইয়া একটী সামান্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন তাহার চারিদিকে যে প্রাচীর ছিল তাহা এখন প্রায় অদৃশ্য

হইয়াছে—তবে প্রবাহগুলি পরিখার কাজ করিত—আর সম্মুখে তরীগুলি ছিল। নবাবের দ্বাদশ সহস্র সৈনিক তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রসদ বন্ধ করিয়া দিল ও সঙ্কীর্ণ প্রবাহের পরপার হইতে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল, জাহাজগুলি সরাইতে হইল। ২০শে মে তারিখে যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে পরিখা হইতে বিতাড়িত করিতে হইল। তখন ইংরাজদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। তিন মাসে দুই শত সৈনিক প্রাণত্যাগ করিয়াছে; আর একশত পীড়িত, অবশিষ্ট এক শতের মধ্যেও অনেকে জরাজীর্ণ, অত্যন্ত দুর্ব্বল। চল্লিশ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে চার্নক ও আর পাঁচ জন জীবিত ও কার্য্যক্ষম। প্রধান জাহাজে ছিদ্র হইয়াছে—অন্য জাহাজগুলিতে লোকাভাব। সর্ব্বনাশের সময় সমাগত; এমন সময় সত্তর জন সৈনিক সহ একখানি জাহাজ আসিয়া পৌছিল। চার্নক ভাবে দেখাইলেন, তাঁহার অনেক সৈনিক জমিয়াছে। এই চালাকীতে মোগল সেনাপতি ভুলিলেন ও ভয় পাইয়া ৪ঠা জুন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সন্ধির সর্ত্ত সাব্যস্ত হইলে চার্নক পতাকা উড্ডীন করিয়া ডঙ্কাবাদ্য সহকারে স্বীয় রোগশীর্ণ মুষ্টিমেয় সৈনিক লইয়া সেই মৃত্যুর গহ্বর হইতে বাহির হইলেন।

শেষ শান্তিভঙ্গ শোভা সিংহের বিদ্রোহ। সে ঘটনা ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। ঘাটালের চিতোয়া ও বরদা পরগণাদ্বয়ের জমীদার শোভা সিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন ও রহিম খাঁ একদল আফগান লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন। বিদ্রোহীরা বর্দ্ধমানের রাজাকে পরাজিত করিয়া হুগলী দুর্গ-অবরোধান্তে অধিকার করেন। অল্পকাল মধ্যে তাহারা মেদিনীপুর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ দখল করিয়া নদী পার হইয়া মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে উৎপাত করিতে থাকে। বর্দ্ধমানের রাজার কন্যাকে অঙ্কশায়িনী করিবার চেষ্টার ফলে

শোভা সিংহ তাঁহার দ্বারা নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ বিদ্রোহিনায়ক হয়েন। কিছুদিন দেশে অত্যাচার করিয়া বেড়াইবার পর বিদ্রোহীরা ভগবানগোলার নিকটে নবনিযুক্ত ফৌজদার জবরদস্ত খাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমপারে পলায়ন করে। তথায় তাহারা নানা অত্যাচার করিতে থাকে। আজিম্-উস্-সান বাঙ্গালার নবাব নিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধমানে উপনীত হইলে, তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে তাহারা পরাভূত ও রহিম খাঁ নিহত হইলে আফগানগণ দণ্ডিত হয়। দেশে আবার শান্তি সংস্থাপিত হয়।

মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দেওয়ানীপদ হইতে ক্রমে যোগ্যতাহেতু নাজীমপদে উন্নীত হয়েন। তিনি দেশ মধ্যে শাসন-ব্যাপারে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি নূতন জরীপ জমাবন্দী করিয়া বাঙ্গালাকে ত্রয়োদশ ভাগে (চাকলায়) বিভক্ত করেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জিলা হিজলী, হুগলী ও বর্দ্ধমান তিন চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদ্ভিন্ন তমলুকের জমীদারী স্বতন্ত্র ছিল। নিমক মহল তখন হিজলী চাকলার মধ্যে ছিল। এই সব চাকলা আবার বিবিধ পরগণায় বিভক্ত ছিল।

আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে মেদিনীপুরে অশান্তির অনল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। বাঙ্গালার মসনদে আরূঢ় হইবার অব্যবহিত পরেই— ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃত উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মেদিনীপুরে তিনি খেলাৎ ও উপঢৌকন দিয়া জমীদারদিগকে পক্ষভুক্ত করিয়া জলেশ্বরে অগ্রসর হয়েন। তথায় ময়ূরভঞ্জের রাজার সেনাদল পরাভূত করিয়া তিনি সুবর্ণরেখা পার হয়েন ও ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যুদ্ধে কুলী খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। তখন তিনি উড়িষ্যা অধিকৃত

করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিতে থাকেন। পথে মুর্শিদের জামাতা কর্ত্তৃক তাঁহার সহকারী বন্দী হওয়ার সংবাদ পাইয়া তিনি আবার মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া কটক গমন করেন। এবার আলিবর্দ্দী অল্প আয়াসেই জয়লাভ করিলেন। তখন শত্রু পরাজিত, সুতরাং আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই মনে করিয়া বিজয়গর্ব্বোৎফুল্ল নবাব ঠিকা সৈনিকদিগকে বিদায় দিলেন। যে সকল সমরশ্রান্ত সৈনিক গৃহে ফিরিবার অনুমতি চাহিল, তাহাদিগকে সে অনুমতি দিলেন। তাহার পর তিনি পাঁচ বা ছয় হাজার সৈনিক লইয়া ধীরে ধীরে শীকার করিতে করিতে—কাননকুণ্ডলা মহীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে রাজধানীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু নির্ম্মেঘগগনে বজ্রনাদের মত মোহিনীপুরের নিকটে তিনি সংবাদ পাইলেন—চল্লিশ হাজার মার্হাট্টা অশ্বারোহী লইয়া শঙ্কর পণ্ডিত বাঙ্গালার প্রান্তরে আবির্ভূত হইয়াছেন—তিনি বিংশ ক্রোশ ব্যবধানে রহিয়াছেন—দ্রুতগতিতে নবাবের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। নবাব তখন মধ্যাহ্নে নামাজ করিতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ভীতভাব না দেখাইয়া সদর্পে বলিলেন,—"সেই কাফেরগণ কোথায়? জগতে কোথায় আমি তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতে না পারি?" কিন্তু অত্যল্প-কাল মধ্যেই তিনি বুঝিলেন, এ বিপদে দর্পের অবকাশ নাই। পার্ব্বত্য বন্যার মত প্রবলবেগে মার্হাট্টাগণ ময়ূরভঞ্জ ও পঞ্চকোট ভেদ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবাবও ব্যস্ত হইয়া বর্দ্ধমান-রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। বর্দ্ধমানে তিনি মার্হাট্টাদিগের আক্রমণে কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন এবং কি কৌশলে উদ্ধার পাইয়া বহুকষ্টে কাটোয়ায় উপনীত হইয়া শেষে মুর্শিদাবাদে গমন করেন সে সব কথা বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠকদিগের অজ্ঞাত নাই। সে সকলের উল্লেখের স্থানও এ নহে। তবে এই পঞ্চ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন যে বাঙ্গালী

সেনার কীর্ত্তিস্তম্ভ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজধানীতে উপনীত হইয়া নবাব দেখিলেন, মার্হাট্টারা তাঁহার পূর্ব্বেই আসিয়া সহর লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর মার্হাট্টারা হুগলী দখল করিল। তখন দ্বাদশমাসব্যাপী যুদ্ধে নবাবের সেনাদল শ্রান্ত—যুদ্ধে, পীড়ায়, দুর্ভিক্ষে তাহাদের সংখ্যা-রও হ্রাস হইয়াছে। আবার বর্ষাকাল সমাগত; এ অবস্থায় তাহাদিগকে বিতাড়িত করা অসম্ভব বুঝিয়া নবাব সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মার্হাট্টারা এই অবসরে দেশের চারিদিকে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। মেদিনীপুরের ফৌজদার মীর কালন্দর বহু চেষ্টার পর গড় রক্ষা করিলেন বটে; কিন্তু মেদিনীপুরের অবশিষ্ট অংশ, এমন কি, গঙ্গার পশ্চিম সমগ্র বঙ্গদেশ মার্হাট্টাদিগের করতলগত হইল। শেষে শরতের অবসানে দেশে গমনাগমন সুসাধ্য হইলে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবাব বহু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। তখন মার্হাট্টারা তাঁহার আক্রমণে ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। মার্হাট্টারা মেদিনীপুর প্রভৃতি যে সকল স্থান অধিকৃত করিয়াছিল, সে সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ভাস্কর পণ্ডিত পঞ্চকোটের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে বন মধ্যে পথ হারাইলেন। তখন নাগপুরে প্রত্যা-বর্ত্তন অসম্ভব বুঝিয়া তিনি স্বপক্ষাবলম্বী মীর হবিবের উপর সেনাচালন-ভার দিয়া স্বয়ং গমন করিলেন। হবিব সেনাদলকে বিষ্ণুপুরের বনমধ্য দিয়া লইয়া চন্দ্রকোণার প্রান্তর পার হইয়া মেদিনীপুরের নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী তখনও তাহাদের অনুসরণে নিবৃত্ত হয়েন নাই, মার্হাট্টারা মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় যাইয়া আশ্রয় লইল।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী মার্হাট্টাদিগকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত

করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি মীরজাফর খাঁকে মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে সাত হাজার অশ্বারোহী ও বার হাজার পদাতি স্থাপিত করিলেন। মীরজাফর মেদিনীপুরে উপনীত হইয়া একদল মার্হাট্টা ও আফগানকে পরাভূত করিলেন। তাহারা জলেশ্বরে পলায়ন করিল। কিন্তু জানোজী বহু মার্হাট্টা সৈন্য লইয়া আসিতেছেন—এই সংবাদ পাইয়া জাফর আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না; পরন্তু বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন। মার্হাট্টারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। পর বৎসর বর্ষাগমে জানোজী মেদিনীপুরে ফিরিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। সুতরাং মেদিনীপুর তখন তাঁহার অধিকৃতই ছিল। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দেও তিনি মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মীর হবিবের অধীনে একদল সৈনিক রাখিয়া তিনি তথা হইতে নাগপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী পুনরায় মেদিনীপুরে গমন করেন। মার্হাট্টারা তাঁহার সহিত আদৌ যুদ্ধ না করিয়া কটকে পলায়ন করে। আলিবর্দ্দী অনায়াসে কংশাবতী নদী পার হইলেন। যাহাতে শত্রুরা ভবিষ্যতে আর এদিকে আসিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আলিবর্দ্দী সেনাসন্নিবেশ করিয়া মেদিনীপুরেই কিছুদিন থাকিবেন, স্থির করিলেন। তিনি সিরাজদ্দৌলার সেনাদলের নায়ক আলাকুলী খাঁকে মেদিনীপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। সিরাজদ্দৌলা একজন সৈনিক লইয়া জলেশ্বরে গমন করিলেন এবং তথায় জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নারায়ণগড়ে সিরাজের সেনাদিগের সহিত নবাবের সেনাদলের সাক্ষাৎ হইল। সিরাজ স্নেহশীল মাতামহের চরণবন্দন করিলেন। বিজয়ী দৌহিত্রকে পাইয়া নবাবের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সম্মিলিত সেনাদল মেদিনীপুরেই শিবিরসন্নিবেশ করিল।

মার্হাট্টাগণ মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে অবগত হইয়া, নবাব মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মার্হাট্টাগণের আর কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি আবার মেদিনীপুরে ফিরিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। মুতাক্ষরীণ-কার এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেদিনীপুরের দুর্গ অধিকৃত করাই বহুদিন হইতে মার্হাট্টাগণের অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু স্থানীয় শাসনকর্ত্তা হায়দার আলী খাঁ লোকাভাবে দুর্গসংরক্ষণে কাতর হইয়া পড়িতেছিলেন। মার্হাট্টারা যখন পার্ব্বত্য নদীর বন্যার মত বাঙ্গালার প্রান্তরে উপনীত হইত, তখন তাহাদের বেগ প্রতিহত করা সকলের পক্ষেই অসম্ভব হইত; মুষ্টিমেয় সেনাদল লইয়া হায়দার আলি কি প্রকারে তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন? সেই জন্য নবাব স্বয়ং মেদিনীপুরের দুর্গেই বর্ষাযাপনের সঙ্কল্প করিয়া দুর্গের সংস্কারের ও পরিবর্দ্ধনের ব্যবস্থা করিলেন এবং পুরস্ত্রীবর্গকে মুর্শিদা-বাদ হইতে আনিতে পাঠাইলেন; এদিকে বর্ষাকালের জন্য আবশ্যক উপাদান সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সেনাদল আদিষ্ট হইল। এই আদেশে সেনাদলে অসন্তোষের সঞ্চার হইল; কারণ, সৈনিকগণ ও কর্ম্মচারীরা সকলেই মনে করিয়াছিল যে, অভিযানের শেষে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আবার পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে। এখন সে আশার অবসান হইল। কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া সকলেই বাসস্থান-নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইল। সকলেই মনে করিল, বর্ষাকালে আর যুদ্ধ করিতে হইবে না।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত দিক হইতে বিপদের সংবাদ আসিল। সংবাদ পাওয়া গেল, সিরাজদ্দৌলা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পাটনা অভি-মুখে অগ্রসর হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া আলিবর্দ্দী ব্যস্ত হইয়া

মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন ও তথা হইতে পাটনায় রওনা হইলেন। মীরজাফর খাঁ ও রাজা দুর্ল্লভ রাম সেনাপরিচালনভার লইয়া রহিলেন।

পর বৎসর (১৭৫১ খৃষ্টাব্দে) যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া নবাব মার্হাট্টা দিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিলেন। স্থির হইল, নবাব রঘুজী ভোঁশ-লার সেনাদলের বকেয়া পাওনা বাবদে সুবর্ণরেখা নদীর অপর পার পর্য্যন্ত সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ মার্হাট্টাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন; তদ্ব্যতীত মার্হাট্টাদিগকে বার্ষিক ১২ বার লক্ষ টাকা দিবেন। মার্হাট্টারা বাঙ্গালায় পদার্পণ করিবে না। চুক্তি এইরূপ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণরেখা নদী মার্হাট্টাদিগের অধিকারসীমা ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, নদীর পরপারেও তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

ইহার পর বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে নূতন নাটকের অভিনয় আরব্ধ হইল। সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে পীড়িত প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং ইংরাজকে সহায় পাইয়া আশায় উৎফুল্ল হইল। সিরাজদ্দৌলার দুরদৃষ্ট, তিনি ফরাসীদিগের সাহায্যগ্রহণের ব্যবস্থাও করিলেন না। শেষে পলাশীতে পরাজিত যুবক সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার মসনদের আশা ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন এবং পথে ধৃত হইয়া নিহত হইলেন। তাঁহার শব হস্তিপৃষ্ঠে মুর্শিদাবাদে নীত হইলে আমিনা বেগম পুত্রের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ বক্ষে চাপিয়া ধরিবার জন্য রাজপথে বাহির হইলে মীরজাফরের দণ্ডধারীদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইলেন। পাপের অগ্নিতে আলিবর্দ্দীর বংশের সমৃদ্ধি ভস্মীভূত হইয়া গেল। সে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের কথা।

তখন রাজারাম সিংহ মেদিনীপুরের ফৌজদার। রাজারাম সিরাজ-দ্দৌলার সংবাদবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইংরাজদিগের

কাগজপত্রে তিনি নবাবের প্রধান গুপ্তচর বলিয়া অভিহিত, দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের রাজস্ব বকেয়া পড়ায় মীরজাফর তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আসিয়া হিসাব নিকাশ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা দুর্লভ রাম তাঁহাকে নবীন নবাবের আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিতে উপদেশও দিলেন। কিন্তু রাজারামের বোধ হয় মনে হইয়াছিল, তিনি মুর্শিদাবাদে যাইলে নবাবের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবেন না; তাই তিনি স্বয়ং না যাইয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইলেন। মীরজাফর উভয়কেই কারারুদ্ধ করিলেন। ক্লাইভ মীরজাফরকে এইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, রাজারাম ইংরাজদিগের শত্রুতাসাধনে সচেষ্ট ছিলেন—তিনি সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ফরাসী বুসীর সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের সংবাদ পাইয়া ফৌজদার দুই সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতী সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং ক্লাইভকে লিখিলেন যে, আক্রান্ত হইলে তিনি সেনাসহ জঙ্গলে আশ্রয় লইবেন—দেহে প্রাণ থাকিতে আত্মসমর্পণ করিবেন না; কিন্তু ক্লাইভ যদি এমন কথা বলেন যে, তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার হইবে না, তবে তিনি স্বয়ং যাইয়া নবাবকে লক্ষ টাকা দিয়া কুর্ণিশ করিয়া আসিবেন। বিনাযুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার করাই ক্লাইভের অভিপ্রেত ছিল; তিনি নবাবকে ফৌজদারের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে বলিলেন। কিন্তু সে উপদেশ বোধ হয় মীরজাফরের মনের মত হয় নাই; কারণ, ইতিহাসে দেখা যায়, নবাব মেদিনীপুরের ফৌজদারের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর ক্লাইভেরই চেষ্টায় গোল মিটিয়া যায় এবং রাজারাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলে তিনি তাঁহাকে আনিবার জন্য পিপ্‌লী পর্য্যন্ত একদল

য়ুরোপীয় সৈনিক প্রেরণ করেন। সাক্ষাতের সময় ক্লাইভ বলেন যে, রাজারামের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার হইবে না। সেই কথায় নির্ভর করিয়া য়ুরোপীয় সেনাদলপরিবৃত হইয়া রাজারাম মুর্শিদাবাদে গমন করেন।

আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা মোগল আমলে মেদিনী-পুরের ইতিহাস শেষ করিব। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ আলমের আক্রমণকালে শিউবাত নামক নায়কের অধীনে মার্হাট্টারা আবার মেদিনীপুরে দেখা দেয়। এই নায়ক বঙ্গে হাঙ্গামার সুযোগ পাইলে তাহা ত্যাগ করিতেন না। তিনি সম্রাটের পক্ষে আসিতেছেন, এই কথা প্রচার করিয়া তিনি মেদিনীপুরে নবাবের কর্ম্মচারী খোসাল সিংহকে পরাজিত করেন ও স্বয়ং মেদিনীপুর অঞ্চল অধিকৃত করেন, তাহার পর তিনি ক্ষীরপাই ও বিষ্ণুপুর স্থানদ্বয় পর্য্যন্ত সেনা পাঠাইয়া ক্ষীর-পাই হইতে হুগলী ও কলিকাতা আক্রমণের ভয় দেখান, এবং বিষ্ণু-পুর হইতে প্রয়োজন হইলে বর্দ্ধমানের দিক দিয়া মুর্শিদাবাদাভি-মুখগামী সম্রাটের সহিত সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে কলি-কাতায় ইংরাজেরা ভয় পাইয়া সমরসজ্জা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নীর কর্ম্মচারী নহেন এমন অস্ত্রধারী ভারতবাসীদিগকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হয়; কারণ, জনরব উঠে যে, রাজা দুর্ল্লভ রাম মহারাষ্ট্র-নায়কের সহিত যোগে কায করিতেছিলেন এবং তিনি তখন কলিকাতায়। যাহা হউক, সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত ইংরাজ সেনার সহিত যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে মনে করিয়া পাটনায় প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। তখন নবেম্বর মাসে কাপ্তেন মার্টিন হোয়াইট্ মুষ্টি-মেয় সৈন্য লইয়া যাইয়া অত্যল্পকালমধ্যে মেদিনীপুর অধিকৃত করিয়া তথায় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

ইহার পর ইংরাজ-শাসনের আরম্ভ। আজ আমরা ইংরাজ-অধিকৃত বাঙ্গালায় যেরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাই, তখন তাহা ছিল না; যে ব্যবস্থা ক্রমোন্নতির ফলে পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন যন্ত্রবদ্ধবৎ বোধ হয়, তখন সেই ব্যবস্থা কেবল গঠিত হইতেছিল। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা সংস্থাপিত করিয়া বণিক ইংরাজ ক্রমে শাসক ইংরাজে পরিণত হইতে-ছিলেন। মুসলমান শাসনের শেষ সময় বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কথার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। আলিবর্দ্দীর শাসনকালে সেই দুর্দ্দশার চরমাবস্থা; তাহার পরই এদেশে ইংরাজের শৃঙ্খলাসংস্থাপনপ্রয়াস। সে প্রয়াস যে সাফল্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে সে জন্য বাঙ্গালী ইংরাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মীর কাশেম আলী বাঙ্গালার নবাব নাজিম নিযুক্ত হইয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধি অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর এই তিনটি জিলা প্রদান করেন। এইরূপে ইংরাজ এদেশের শাসনভার লইবারও পূর্ব্বে মেদিনী-পুর ইংরাজের হস্তগত হয়; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মেদিনীপুর জিলা যেরূপে গঠিত তখন সেরূপে গঠিত ছিল না, তখনও মার্হাট্টারা উড়িষ্যা অধিকৃত করিয়া আছে। মেদিনীপুরের পটাশপুর পরগণাও তখন তাহাদের অধিকৃত। ইংরাজ-অধিকৃত মেদিনীপুর তিন ভাগে বিভক্ত হয়—হিজলীর ফৌজদারী, চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা জলে-শ্বর। তখন হিজলীর ফৌজদারী হুগলীর সংলগ্ন এবং তমলুক জমি-দারী ও চারিটী নিমক-মহল সেই ফৌজদারীর অন্তর্গত। চাকলা মেদিনীপুরে তখন গোয়ালপাড়া সরকারের কতকাংশ ছিল—ঘাটশিলা প্রভৃতি পরে মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মেদিনীপুর ও জলেশ্বর চাকলাদ্বয় তখন একজন কর্ম্মচারীর অধীনে

ছিল, তাঁহাকে রেসিডেণ্ট বলা হইত এবং তাঁহার কার্য্যেরও অন্ত ছিল না। তিনি বিচার, শাসন ও রাজস্ব তিন বিভাগেরই কর্ত্তা ছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহাকে বাণিজ্য-ব্যাপারের এবং রাজনীতিক বিষয়েও তত্ত্বাবধান করিতে হইত; আবার তিনিই সৈন্যসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিতেন অর্থাৎ মিলিটারী গভর্ণর ছিলেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসর মেদিনীপুর বর্দ্ধমানের প্রাদেশিক কৌন্সিলের অধীন ছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব-আদায়ের ভার একজন কর্ম্মচারীর উপর প্রদত্ত হয়, তাঁহাকে কলেক্টর বলা হইত; আর একজন বাণিজ্যব্যাপার দেখিতেন। চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে, আবার পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। এই বৎসর বর্দ্ধমানের প্রাদেশিক কৌন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার কার্য্য-ভার কলিকাতার রাজস্ব-কমিটী গ্রহণ করেন, এই কমিটীই বোর্ড অব রেভিনিউ নামে পরিচিত। দেওয়ানী মোকর্দ্দমার বিচারের জন্য মেদিনীপুরে একটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়, এই আদালতের জজ কতকাংশে পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজও করিতেন; তিনি আসামী ধরিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাদের বিচার করিতে পারিতেন না। চারি বৎসর পরে ম্যাজিষ্ট্রেটকে ছোট ছোট ফৌজদারী মামলার বিচার-ক্ষমতাও দেওয়া হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে একই কর্ম্মচারী জজ-কলেক্টর ও পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট—তিন জনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বতন্ত্র কলেক্টর নিয়োগ হয়; তবে একই কর্ম্মচারী জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়ের কাজ করিতেন এবং তিনিই গুরু অপরাধে অপরাধীকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করিতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সার্কিট কোর্ট ফৌজদারী আদালতের স্থান গ্রহণ করে এবং কলিকাতা বিভাগের সার্কিট কোর্টের জজ সময়ানুসারে মেদিনীপুরে,

দায়রা করিতে থাকেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থায় দেওয়ানী আদালতগুলিকে জিলা আদালত বলা হয়।

হিজলীর ফৌজদারী তমলুক ও হিজলী দুইটি নিমক-মহলে বিভক্ত ছিল। প্রতি মহলে একজন করিয়া কর্ম্মচারী ছিলেন—উভয়েই নিমক জেলাগুলির কলেক্টরের অধীন ছিলেন। প্রথমোক্ত কর্ম্মচারীরা রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজও কিছু কিছু করিতেন এবং ছোট ছোট ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন। বড় বড় ফৌজদারী মামলার বিচার প্রথমে ফৌজদারী আদালতে ও পরে সার্কিট কোর্টে হইত।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আরও পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল পরি-বর্ত্তনের মধ্যে নিমক-মহলের কর্ম্মচারিগণের ক্ষমতাসঙ্কোচই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিমক বিভাগ হুগলীর কর্ত্তৃত্বাধীন করা হয়। এই সময় নূতন নূতন যে সকল ব্যবস্থা হয় সে সকলের উল্লেখ করিয়া আমরা পাঠকদিগের ধৈর্য্য নষ্ট করিব না।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জিলা যখন গঠিত হয়, তখন হইতে ঘাটাল থানা ও চন্দ্রকোণা থানা হুগলীর অধীন ছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকোণা থানার ফৌজদারী কাজ মেদিনীপুরে হইতে আরম্ভ হয়; কারণ, বহুলোক সে জন্য আবেদন করে; দেওয়ানী কাজ হুগলীতে হইতে থাকে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দেও এই দুই থানা হুগলীতে দেখা যায় এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বৃটিশ-শাসনের প্রারম্ভকালে মেদিনীপুরে শান্তি ছিল না, মেদিনীপুর সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া মার্হাট্টাদিগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিত না। আবার ইহার পশ্চিমাংশের জঙ্গলে যে সব জঙ্গলী জাতি বাস করিত, তাহারাও দস্যুবৃত্তি করিত। মার্হাট্টারা মেদিনীপুর আক্রমণ করিত বা আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইত; ময়ুরভঞ্জের রাজার সেনা-

দলও মেদিনীপুরে আসিয়া লুণ্ঠন করিত ; সশস্ত্র সন্ন্যাসী ও ফকিরেরাও লুণ্ঠনে কাতর ছিল না, চুয়াড় নামক আদিম-নিবাসী জাতিও দস্যুবৃত্তি করিত, বনপ্রদেশের অধিকারীদিগের অত্যাচারেরও অবধি ছিল না। এইরূপে মেদিনীপুরে—বিশেষ মেদিনীপুরের পশ্চিম ও উত্তরাংশে লোক সর্ব্বদাই অত্যাচার-পীড়িত হইত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বৃটিশ অধিকার বিস্তারের প্রায় চল্লিশ বৎসর পরেও কলেক্টর লিখিয়াছিলেন যে, মেদিনীপুরের দুই-তৃতীয়াংশ জঙ্গলাকীর্ণ ও জনহীন ও অগম্য। এই জেলার রক্ষাকার্য্যে মেদিনীপুরের দুর্গে ও জলেশ্বরের নিকটে নক্‌স দুর্গে সৈন্য রাখিতে হইত।

মার্হাট্টারা প্রথমাবধিই ইংরাজদিগকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিত, প্রথম ইংরাজ রেসিডেণ্ট মিষ্টার জনষ্টনের সময় তাহারা মেদিনীপুর আক্রমণ করিয়া ইহার কতকাংশ হস্তগত করে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা কয়জন অধীন জমীদারকে শাসন করিবার অছিলায় সমরে প্রবৃত্ত হয় এবং পাছে তাহারা সীমারেখা অতিক্রম করে, সেই ভয়ে ইংরাজগণ জলেশ্বরে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে শিউপত নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি কামান ও লোক সংগ্রহ করিয়া দূত পাঠাইয়া বকেয়া চাউলের কর আদায় করিবার অছিলায় ইংরাজ-অধিকৃত নেপুচরের অধিবাসিগণের গোলা লুঠিয়া লইয়া যায়। তখন এরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটিত।

তাহার পর ২০ বৎসর ধরিয়া মার্হাট্টাদিগের সহিত সর্ব্বদাই সংঘর্ষ হইত, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বিশৃঙ্খলা লাগিয়াই ছিল, এবং ইংরাজ সৈন্যদিগকে প্রায়ই তথায় যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইত। নহিলে কোম্পানীর প্রজাদিগের ধন-প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই সব সংঘর্ষে সময় সময় ইংরাজের পরাজয়ও যে না হইত, এমন নহে ; ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পাইকড়া ভূইয়া নামক একজন মার্হাট্টা জমীদার ৯ শত

অনুচর লইয়া নৌরঙ্গচর পরগণায় প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করে, যে মাসে আবার ঐ পরগণা আক্রমণ করে, সেবার সে ও তাহার সহকারী সর্দ্দারেরা রাত্রিকালে সুবর্ণরেখা পার হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে ১ হাজার ৬শত অনুচর-সহ পরগণায় প্রবেশ করে। বলরামপুরের বীরপ্রসাদ চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি ৩ শত অনুচরসহ তাহাদিগের সহিত যোগ দিলে তাহারা দুইখানি গ্রামে ইংরাজের সিপাহীদিগকে আক্রমণ করে, রাত্রি শেষ হইবার ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাদের আক্রমণ আরব্ধ হয় এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ চলে, দিবাবসানকালে গুলি বারুদ ফুরাইয়া যাওয়ায় ইংরাজের সিপাহীরা পলাইতে বাধ্য হয়, তখন মার্হাট্টারা পরিত্যক্ত গ্রাম লুঠিয়া গ্রামে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং গবাদি পশু ও রণহত শত্রুদিগের মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করে। ম্যাজিষ্ট্রেট এই ব্যাপার কলিকাতায় লিখিয়া বলেন,—মার্হাট্টা দূতকে ইহা জানাইয়া ক্ষতিপূরণ দাবী করা হউক। তিনি মেদিনীপুরে আরও অধিক সৈনিক রাখিতে ও উলমারা হইতে মার্হাট্টাদিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করিতে বলেন।

এই বৎসরই পটাশপুরের মার্হাট্টারা ইংরাজদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে। তাহারা বৃটিশ অধিকারস্থ প্রজাদিগকে ধরিয়া বন্দী করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে থাকে। এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতীকার জন্য পটাশপুরের তহশীলদারকে পত্র লিখিলে তহশীলদার, তিনি কিছু করিবেন না বলিয়া সে পত্র অপঠিত অবস্থাতেই প্রত্যর্পণ করেন। এই ব্যবহারের পর ম্যাজিষ্ট্রেট উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া প্রজাদিগের ধন-প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য তথায় একদল সিপাহী পাঠাইয়া দেন, সুযোগ পাইলেই মার্হাট্টারা ইংরাজ-অধিকারে প্রবেশ করিয়া প্রজাদিগকে নির্য্যাতিত করিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে দ্বিধা করিত না।

চারিদিকে বৃটিশ অধিকার-বেষ্টিত পটাশপুর পরগণায় দস্যু, তস্কর, দুষ্কৃত প্রভৃতির বাস ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছিলেন, মার্হাট্টাদিগের অধিকৃত এই পরগণায় বহু ডাকাইতের বাস। তাহারা কেহ প্রকাশ্যভাবে, কেহ বা গোপনে ডাকাইতি করে। পরগণার জমীদার ও ধনীরাও হয় দস্যু, নহে ত দস্যুদিগের সাহায্যকারী। মার্হাট্টারা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের বা রাজস্ব আদায়ের অছিলা করিয়া যে সব লোক নিযুক্ত করে তাহারা দস্যু বা অন্য দুষ্কৃতদিগের সহায়তা করিয়া অর্থলাভ করে। দস্যুরা ও চুয়াড়রা এই পরগণায় যাইয়া বাস করে এবং সময় সময় বৃটিশ অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়; এই স্থানে বাস করিলে তাহাদের দুষ্কর্ম্ম করা চলে এবং দণ্ডের আশঙ্কামাত্র থাকে না। এই জন্য এই পরগণায় অনেক লোকের বাস এবং বৃটিশ অধিকার অপেক্ষা এই পরগণায় কৃষিকার্য্যও ভাল। মার্হাট্টাদিগের প্রজাদিগের ধনপ্রাণ নিরাপদ; কিন্তু বৃটিশ অধিকারে শান্তিপ্রিয় প্রজাদিগকে সেরূপ নিরাপদে রক্ষা করা অসম্ভব। যে সকল অপরাধী দণ্ডের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহে, যে সকল অপরাধী জেল হইতে পলাইয়াছে, যাহারা দোষ করিয়া পলাইয়াছে—এইরূপ লোক সাগ্রহে এই পরগণায় আসিয়া আশ্রয় লয় এবং নিরাপদে বাস করে। ম্যাজিষ্ট্রেট আরও লিখিয়াছিলেন, ইহারা নিকটবর্ত্তী ইংরাজ-অধিকার হইতে গবাদি গৃহপালিত পশু চুরি করিয়া আনে, প্রজারা তাঁহার নিকট প্রতীকারপ্রার্থী হইলে, তিনি কোন উপায়ই করিতে পারেন না। মার্হাট্টারা লবণ প্রস্তুত করিয়া গোপনে ইংরাজ-অধিকারে আনিয়া বিক্রয় করে। তাহাতে ইংরাজ সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হয়।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই অবস্থার প্রতীকারের চেষ্টা হইয়াছিল।

তখন মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট মিষ্টার ভ্যানসিটার্ট কলিকাতার কাউ-ন্সিলের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ইংরাজ-অধিকার একত্রিত করিবার জন্য ও হাঙ্গামা চুকাইবার জন্য স্বর্ণরেখা নদীর দক্ষিণতীরস্থ ভেলোরাচর মার্হাট্টাদিগকে দিয়া ইংরাজ সরকার তাহার পরিবর্ত্তে এমাজফের করিয়া পটাশপুর পরগণা গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হউন। উত্তরে কাউন্সিলের সভাপতি মিষ্টার ভেরেলষ্ট লিখেন, সমগ্র উড়িষ্যা লইবার জন্য কথা চলিতেছে; যদি প্রয়োজন হয় পটাশপুর মেদিনীপুরের রেসিডেণ্টের অধীন করা হইবে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ উড়িষ্যা লইবার প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহার পর ওয়ারেন হেষ্টিংসও ভোঁশলার নিকট হইতে উড়িষ্যার উপকূল ইজারা লইবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হয়েন। এই সময় মেদিনীপুরে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে মার্হাট্টাদিগের অধিকৃত ভূমি জলেশ্বরের ফৌজদারের অধীন ছিল। স্বার্থরক্ষার্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জলেশ্বরে একজন রেসিডেণ্ট রাখিয়াছিলেন। তিনি পোষ্টমাষ্টারের এবং মার্হাট্টাদিগের নিমকের এজেণ্টের কাজও করিতেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের উড়িষ্যাবিজয় পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থাই বহাল ছিল। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কর্ণেল ফার্গুসন একদল সৈন্য লইয়া বালেশ্বর দখল করেন; আর একদল সৈনিক পটাশপুর দখল করে। ইহার পর সন্ধিসর্ত্তে উড়িষ্যা ও পটাশপুর পরগণা ইংরাজের হস্তগত হয়।

ঐ দিকে ময়ূরভঞ্জের রাজা দেশে অশান্তি উৎপন্ন করেন। তিনি নামে কটকের মার্হাট্টা শাসনকর্ত্তার অধীন ছিলেন। তিনি আপনার স্বাধীন রাজ্য ব্যতীত মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে খাজনা দিয়া নয়াবশান পরগণা দখল করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে সহজে রাজস্ব আদায় হইত না; আবার তাঁহার লোকজন প্রায়ই মেদিনীপুরের অন্যান্য

অংশে লুণ্ঠন করিত; ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনাকে বালেশ্বরে একটি পরগণার মালিক বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার স্বত্ব ইংরাজ স্বীকার করেন না। পর বৎসর তিনি আর একজন বিদ্রোহী নায়কের সহিত একযোগে ইংরাজাধিকার আক্রমণ করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ করিতে থাকেন। তখন কোম্পানী কটকের মারহাট্টা শাসনকর্ত্তা রাজা রাম পণ্ডিতের সহিত একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিলে কয় মাস পরে তিনি অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার মেদিনীপুরস্থ সম্পত্তির জন্য বার্ষিক ৩ হাজার ২ শত টাকা করিয়া রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েন।

আবার দলে দলে সন্ন্যাসীরা দেশমধ্যে অশান্তিবিস্তার করিতে থাকে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে—বিশেষ এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে গমন করিত। এক এক দলে হাজার হাজার লোক থাকিত, তাহারা সকলেই সশস্ত্র। তাহারা প্রধানতঃ পশ্চিমা; কিন্তু এ প্রদেশের লোকও তাহাদের দলে মিশিত। গমনপথে তাহারা ধনীদিগের নিকট হইতে খাদ্য ও অর্থ আদায় করিত, গৃহ ও গোলা লুঠ করিত, যাহারা বাধা দিত তাহাদিগকে প্রহার—এমন কি সংহারও করিত।

ইংরাজের প্রথম আমলের দলিল-দস্তাবেজে সন্ন্যাসীদিগের অনেক অত্যাচারের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এই সন্ন্যাসীরা প্রধানতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বেড়াইত—পুরীর পথ বলিয়া তাহারা মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া যাইত। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সংবাদ পাওয়া যায়, একদল ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাইয়ের নিকটে দেখা দিয়াছে। সরকার তাহাদিগকে বিনষ্ট, বন্দী ও বিতাড়িত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন। মার্চ্চ মাসে রায়পুরে তিন হাজার সন্ন্যাসী

সম্মিলিত হইয়াছে শুনিয়া সরকার কাপ্টেন ফরবেসকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্থানীয় জমীদারদিগকে লোক লইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে বলিলেন। সন্ন্যাসীরা কুলকুসমা হইতে জঙ্গলমহলে প্রবেশ করিয়া মার্হাট্টাধিকারের সীমান্তপ্রদেশ দিয়া আলমপুর ও গোপীবল্লভপুরের দিকে চলিয়া গেল। ততদূর যাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করা ইংরাজ সেনার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে জুন মাসে কাপ্টেন এডওয়ার্ডসেরই পরাভব হয়; অক্টোবর মাসে সংবাদ পাওয়া যায়, দুই দল সন্ন্যাসী বালেশ্বর হইতে উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছে। সরকার জলেশ্বরে কাপ্টেন হার্সের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন যে, তাহারা জলেশ্বর রাস্তা দিয়া মেদিনীপুরে প্রবেশ করিতে না পারে। সন্ন্যাসীরা সংবাদ পাইয়া দল ভাঙ্গিয়া বনপথে চলিয়া গেল—হার্সে তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। নভেম্বর মাসে তাহারা ময়ূরভঞ্জে উপনীত হইলে কাপ্টেন টমাস তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন; উদ্দেশ্য—তাহারা বৃটিশ অধিকারমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। সন্ন্যাসীরা পার্ব্বত্যপথে প্রয়াগের দিকে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ভিত্তির উপর বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসীরা অত্যাচারী ছিল বটে; কিন্তু তাহারা সময় সময় উপস্থিত হইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিত। চুয়াড়দিগের অত্যাচারে এই অঞ্চলের লোকের শান্তি ছিল না। মেদিনীপুর অঞ্চলের জঙ্গলে যে সকল বন্যজাতি বাস করিত তাহাদিগকেই চুয়াড় বলা হইত। এখন বাঙ্গালার চলিত কথায় চুয়াড় বলিলে অসভ্য—গোঁয়ার বুঝায়। তখন অনেকগুলি পরগণা জঙ্গলমহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল; সেগুলি জিলার পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই জঙ্গলমহলের পরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার অনেক স্থলেই ঘন জঙ্গল

ছিল; এই মহলের অধিবাসী পাইক ও চুয়াড়রা কৃষিকার্য্যে মন দিত না—সুবিধা পাইলেই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিত। এই প্রদেশের নায়কগণও কতকটা স্বাধীন ছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের বিবরণে দেখা যায়, এই সব জমীদারও ডাকাইত-দলভুক্ত ছিলেন এবং লোকের ধনলুণ্ঠন করিতেন। তাঁহাদের প্রজারাও ডাকাইত; তাহারা প্রভুর লুণ্ঠনকার্য্যে সহায় ও সহচর ছিল। কাযেই এ প্রদেশে জমীদার ও প্রজারা সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিত। আত্মরক্ষা ও পরস্বাপহরণ উভয় কার্য্যেই অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজন হইত।

এই দস্যুদলপতিদিগকে দণ্ডিত করিয়া দেশমধ্যে শান্তিসংস্থাপনের উপযোগিতা বহুদিন পূর্ব্বেই উপলব্ধ হইয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সরকার সাব্যস্ত করেন, জেলার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমভাগে সৈন্য পাঠাইয়া এই সব জমীদারকে রাজস্ব-প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে আর তাঁহাদের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দুষ্টনীড় নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সিপাহী-সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায় পরবৎসর জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত অভিযান অগ্রসর হইতে পারে নাই। তখন ফার্গাসনের নেতৃত্বে সেনাদল এই প্রদেশে প্রবেশ করে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি কল্যাণপুরে উপনীত হইলে সে স্থানের জমীদার বশ্যতা স্বীকার করিয়া বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে সম্মত হয়েন। কিন্তু ঝাড়গ্রামের জমীদার বশ্যতা-স্বীকারে অসম্মত হইলে ফার্গাসন ৬ই তারিখে তাঁহার দুর্গ দখল করিয়া লয়েন। তখন জমীদার বশ্যতা স্বীকার করিয়া বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে সম্মত হইয়া জামীন দিলে তাঁহার দুর্গ তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। রামগড়, লালগড়, জামবাণী, শিলদা—সকল স্থানের জমীদারগণ বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দেই ফার্গাসন আরও অগ্রসর হইয়া সিংহভূম, মানভূম, বাঁকুড়া —জিলাত্রয়ের অন্তর্গত জঙ্গলমহলে ইংরাজ-আধিপত্য সংস্থাপিত করেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ও পর-বৎসর ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী স্থানের চুয়াড়গণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে; কিন্তু মেদিনীপুর আক্রমণ করিতে অক্ষম হয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহারা মেদিনীপুরের বাহিরে অত্যাচার করিত; কিন্তু সিংহভূম তখন মেদিনীপুরের অন্তর্গত থাকায় তাহাদিগের শাসন জন্য ইংরাজ সরকারকে সেনা পাঠাইতে হইত। এই সব অভিযানে চুয়াড়দিগের তীরে এবং ব্যাধিতে ইংরাজপক্ষের লোকক্ষয়ও যে না হইয়াছিল, এমন নহে।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চুয়াড়গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দুইখানি গ্রাম পুড়াইয়া দিল। পর-মাসে তাহারা রায়পুরে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এই বৎসর জুলাই মাসে একজন বাগ্দী-নায়কের অধীনে ৪ শত দস্যু চন্দ্রকোণা থানার এলাকায় উপস্থিত হইল। তাহার পর কাশীযোড়া, তমলুক, জলেশ্বর প্রভৃতি পরগণায় প্রজারা দস্যুদিগের দারুণ অত্যাচারে বিব্রত হইয়া উঠিল। মেদিনীপুরের পশ্চিমভাগেই অত্যাচার অধিক চলিতে লাগিল। চুয়াড়গণ ক্রমে অধিক সাহসী ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল এবং ডিসেম্বর মাসে ছয় সাতখানি গ্রাম তাহাদের হস্তগত হইল; বলরামপুর, রাজগড়, শালবনী সর্ব্বত্রই তাহারা লুণ্ঠনব্যাপারে লিপ্ত হইতে লাগিল। চুয়াড়েরা মেদিনীপুর পরগণাতেও প্রবেশ করিল এবং আতঙ্কতাপিত প্রজারা মাঠের শস্য মাঠে রাখিয়া প্রাণভয়ে কোম্পানীর সিপাহীরক্ষিত মেদিনীপুর, আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। মেদিনীপুর সহরের সন্নিকটে তিনটি স্থানে চুয়াড়গণ দেখা দিল—কর্ণগড় সেগুলির অন্যতম। এই কর্ণগড় মেদিনীপুরের রাণীর বাসস্থান। তখন তাঁহার জমীদারীর খাস করা খাজনা খাসে আদায় করা হইতেছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে চুয়াড়গণ লুণ্ঠনকার্য্যে বাহির হইত এবং ফিরিয়া আসিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ভাগ

করিয়া লইত। এই সময় কালেক্টর লিখেন যে, চুয়াড়দিগকে অতি সামান্য চেষ্টায় দূর করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু কালেক্টর মিষ্টার মাইহক্কের সহিত জজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার গ্রেগরীর মনোমালিন্যহেতুই হউক আর মেদিনীপুরে সৈনিকের সংখ্যাল্পতাহেতুই হউক, এই সময় চুয়াড়দিগকে শাসিত করিবার কোন উপায়ই হইল না; তাহারা পূর্ব্ববৎ অবাধে লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই চুয়াড়েরা মেদিনীপুরের উপকণ্ঠ-স্থিত কতকগুলি গ্রাম লুঠিয়া পুড়াইয়া দিয়া গেল এবং শাসাইতে লাগিল যে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনীতে মেদিনীপুর সহর আক্রমণ করিবে। কালেক্টরের ভয় হইল, তাহারা তোষাখানা লুঠিয়া লইবে। কারণ তোষাখানায় তখন কেবল ২৭জন প্রহরী আছে। আক্রান্ত হইলে তাহারা যে পলায়ন না করিয়া যুদ্ধ করিবে সে সম্ভাবনা নিতান্তই সুদূরপরাহত। নিরুপায় হইয়া তিনি ৭ই মার্চ্চ তারিখে বোর্ডে লিখিলেন, চুয়াড়দিগকে তাড়াইবার কোন ব্যবস্থাই করা হইল না। তাহারা প্রতিদিন প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে।

চুয়াড়দিগের অত্যাচারে প্রজারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। তাহাদের অন্নের উপায় রহিল না। অনেকে বনে কাঠ কাটিয়া তাহাই বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তাহারা ভয়ে বনে যাওয়া ত্যাগ করিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে চুয়াড়েরা আনন্দপুর আক্রমণ করিয়া বহু রায়ত ও দুইজন সিপাহীর প্রাণসংহার করিল—অবশিষ্ট সিপাহীরা মেদিনীপুরে পলাইয়া আসিল, কিন্তু মেদিনীপুরও যে নিরাপদ রহিল, এমন নহে।

১৭ই মার্চ্চ তারিখে কালেক্টর কর্ণেল ডানকে লিখিলেন যে, সেইদিন

রাত্রিকালে চুয়াড়দিগের মেদিনীপুর আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা—তিনি টাকা বুরুজখানায় রাখিতে চাহেন। তাহার পর তিনি ২১শে তারিখে লিখেন, পূর্ব্বরাত্রিতে চুয়াড়েরা মেদিনীপুর সহর দগ্ধ করিবে স্থির করিয়াছিল। তাহারা সে সংবাদ প্রচার করিয়া দেওয়ায় অনেক লোক হঠাৎ পলাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ান এই সংবাদ প্রচার করেন যে, দুই দল সিপাহী ও ৫০ জন য়ুরোপীয় সৈনিক সহরে আসিয়াছে। সেই সংবাদ পাইয়া চুয়াড়েরা আর সহর আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই—বোধ হয় আরও দিন কতক সাহস করিবে না; কিন্তু সহরবাসীরা ভয়ে কাতর—রাত্রিকালে অনেকে পুত্রকন্যা ও অর্থাদি লইয়া আসিয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে থাকে। গতায়াত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে; কারণ, বদমায়েসের দল দেখিতেছে, তাহারা চুরী-ডাকাইতী করিলে দণ্ডিত হয় না; তাই তাহারা অবাধে চুরী-ডাকাইতী করিতেছে। এই ম্যাজিষ্ট্রেট বোর্ডে লিখেন যে, মেদিনীপুর জিলার বিশেষ মেদিনীপুর পরগণার দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত—তথায় নিত্য লোকের উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা তিনি আর দেখিতে পারেন না।

এই সকল বিবরণ হইতে একদিকে যেমন মেদিনীপুরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়, অপরদিকে আবার তেমনই কোম্পানীর লোকের নিশ্চেষ্টতা দেখা যায়। বোধ হয় তখনও দেশশাসন ইংরাজ আপন কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করেন নাই। পরে দেশের লোকের কষ্টে তাঁহারা বিচলিত হইয়া সে কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শেষে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা আর এ ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আউসগড় ও কর্ণগড় জয় করা হইল এবং চুয়াড়দিগের সহকারিতাসন্দেহহেতু রাণীকে বন্দী করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল

তারিখে মেদিনীপুরে আনা হইল। ২০শে মে তারিখে আরও পাঁচ দল সিপাহী মেদিনীপুরে পাঠাইয়া নানাস্থানে রাখা হইল। আনন্দপুর প্রভৃতি ছয়টি স্থানে মোট ৩০৯ জন স্থবেদার, জমাদার, হাবিলদার ও নায়েক রক্ষিত হইল। চুয়াড়গণ এক পরগণা হইতে অন্য পরগণায় বিতাড়িত হইতে লাগিল এবং প্রজারা ক্রমে ক্রমে গৃহে ফিরিয়া চাষ-আবাদে মন দিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে চুয়াড়দিগের পরাজয় হইয়া গেল—তবে তাহারা স্থানে স্থানে অত্যাচার করিয়া ঘুরিতে লাগিল, তাহারা কোথাও নরহত্যা করিতে লাগিল, কোথাও বা গ্রাম জ্বালাইতে লাগিল; কিন্তু আর তাহারা কোথাও লোককে ভয় দেখাইয়া গ্রাম-ছাড়া করিতে পারিল না। মিষ্টার প্রাইস লিখিয়াছেন, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে যে চুয়াড়বিদ্রোহ হয়, তাহা নৃশংস অত্যা-চারের ইতিহাস। জায়গীর বাজেয়াপ্তির জন্য সরদার ও পাইকগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। তাহারা মনে করিয়াছিল, অত্যাচারে সরকার শেষে বাধ্য হইয়া তাহাদিগের জায়গীর ফিরাইয়া দিবেন। বন অঞ্চলের সব দুর্দ্দান্ত জাতি তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত অত্যাচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লইল। মেদিনীপুরের পুলিশ ও সৈনিকগণ তাহাদিগকে শাসিত করিতে পারে নাই। শেষে বাহির হইতে বহু সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে দমিত করিতে হয়। পরগণায় অত্যাচারের অবধি ছিল না, কর্ত্তব্যের কঠোরতায় জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু হয়। শেষে ঐ বৎসরের শেষভাগে চুয়াড়বিদ্রোহ দমিত হইলে প্রজারা নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছিল।

তখন সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, মেদিনীপুরের স্বাধিকারভ্রষ্ট রাণী ও অন্যান্য লোক চুয়াড়দিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু

সকল দিক দেখিলে মনে হয়, রাণীর জমীদারীতে পাইক-জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবার আদেশেই পাইক প্রভৃতি উত্তেজিত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পাইকেরা সরকারকে সাহায্য দানে বিরত হয় এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চুয়াড়দিগের সহিত যোগ দিয়া অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। ক্রমে দেশ যেন অরাজক হইয়া উঠে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে জেলার কালেক্টর বোর্ডে যে পত্র লিখেন, তাহাতে দেখা যায়—পাইকান জমা বাজেয়াপ্ত করাতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। চুয়াড়রা অসভ্য ও বৃটিশ শাসন-প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহারা যখন দেখিল, সহসা তাহাদের বহুদিনের অধিকৃত জমী পুলিসের জন্য বাজেয়াপ্ত হইল, তখন তাহারা মনে করিল, যে সরকার এই কাজ করিয়াছেন, সেই সরকারের কাছে প্রতীকারের আশা করা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে; তাই তাহারা অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহী হইয়া দেশমধ্যে লুণ্ঠনে ও অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ফলে রাজস্ব বর্দ্ধিত হওয়া ত দূরের কথা, কমিয়াই যাইতেছে।

এদিকে কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেন্টও পাইকান জমা ব্যবস্থা বিষয়ে বোর্ডকে তিরস্কার করেন। রাজস্ব কমতি ও বিশৃঙ্খলা বিষয়ে অমনোযোগের জন্যও বোর্ড নিন্দিত হইয়াছিল। তাই বোর্ড স্থির করেন, জিলায় লুণ্ঠনাদির প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত পাইকান জমার বন্দোবস্ত স্থগিত থাকিবে। আর পুলিস দারোগারা অত্যাচারনিবারণে অক্ষম প্রতিপন্ন হওয়ায় জঙ্গল মহলের জমীদারদিগকে পুলিশের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। জঙ্গল মহলের যে সব জমীদারের সম্পত্তিতে চুয়াড়দিগের লুণ্ঠনে প্রজারা বিপন্ন হইয়াছিল, সে সকল মহলের বকেয়া খাজনা আদায়সম্বন্ধেও সরকার যথাসম্ভব শৈথিল্য দেখাইয়াছিলেন।

কিন্তু চুয়াড়দিগের অত্যাচারনিবারণে আরও কালবিলম্ব হইয়াছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হ্যামিল্টন লিখিয়াছিলেন,—বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশে বৃটিশ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইলেও কলিকাতা হইতে ৩০ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী এই স্থানে লোক নিরাপদ হয় নাই। এই বাগড়ী অঞ্চলে প্রজারা যেন কোন রাজারই অধীন নহে, এমনই ভাবে ব্যবহার করিত। কেহ সাহস করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে যাইত না; কারণ, তাহারা সুবিধা পাইলেই সাক্ষীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। ইহারা অধিবাসিগণের মধ্যে বিবাদে ও অর্থলোভে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিপক্ষের প্রাণনাশ করিত। অন্যান্য উপায়ে ইহাদিগের অত্যাচারের প্রতীকার করা অসম্ভব হইলে শেষে গভর্ণর জেনারলের অধীনে এক জন কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দিয়া অত্যাচার-নিবারণের ভার দেওয়া হয়। মিষ্টার ওকলী নামক একজন কর্ম্মচারী সেই ভার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি প্রথমে সন্ধান করিয়া দস্যুনেতৃগণের নাম সংগ্রহ করেন। উদ্দেশ্য—অন্যান্য চুয়াড়দিগকে ক্ষমা করা হইবে, কিন্তু দুষ্কৃত দলপতিদিগকে ক্ষমা করা হইবে না। তাহার পর তিনি দস্যুদিগের আহার্য্য রসদ পাইবার পথ রুদ্ধ করিতে লাগিলেন ও দেশবাসিগণকে তাঁহার সাহায্যার্থ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দেশবাসীরা কেবল চুয়াড়দিগের ভয়ে এতদিন সব অত্যাচার সহ্য করিয়াছে—প্রতীকারের পথ খুঁজিয়া পায় নাই। এখন মিষ্টার ওকলীকে চুয়াড়-দলন-কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা সাগ্রহে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। এই ব্যবস্থায় সুফল ফলিতে বিলম্ব হইত না; কিন্তু ইতিমধ্যে নিকটবর্ত্তী ভঞ্জভূম পরগণায় পাইকবিদ্রোহে সরকারকে আবার বিব্রত হইতে হইল। সুখের বিষয়, এই বিদ্রোহ অল্পদিনেই দমিত হইয়াছিল।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে জিলায় অনেকটা শান্তি-সংস্থাপন হইয়াছিল এবং হাল তলব খাজনাও আদায় হইয়াছিল। বৎসরের প্রথমে ১৯ জন দলপতি ও ২ শত দস্যুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। কয় মাসের মধ্যেই ২ জন ব্যতীত আর সকল দলপতিই নিহত বা ধৃত হয়। চুয়াড়েরা স্বভাবতঃ উগ্রপ্রকৃতি—তাহার উপর ধৃত হইলে তাহাদের প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য বুঝিয়া দলপতিরা প্রায়ই প্রাণান্ত পর্য্যন্ত পুলিসের আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রয়াস পাইত।

নবাব মীর কাশিমের সহিত সন্ধিসর্ত্তে এই জিলা বৃটিশ অধিকার-ভূক্ত হইলে ইংরাজেরা রেসিডেণ্টের অধীনে মেদিনীপুর সহরে একটি কাপড়ের কুঠী স্থাপিত করেন; তদ্ভিন্ন ঘাটালে ক্ষীরপাইতে একটি বয়ন-কারখানাও ছিল; কিন্তু সে কারখানা রেসিডেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল না—বর্দ্ধমানের ও পরের হুগলীর শাসকের অধীন ছিল। সুতরাং মেদিনীপুরে ইংরাজ কোম্পানীর ব্যবসাও যথেষ্ট ছিল। রেসিডেণ্ট মহাজনদিগের সঙ্গে রেশম এবং রেশমী ও সূতী কাপড় সরবরাহের জন্য চুক্তি করিয়া দাদন দিতেন। মহাজনদিগকে নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট মাল সরবরাহ করিতে হইত এবং তাহারা আর কাহাকেও সেইরূপ মাল যোগাইতে পারিত না। মহাজনেরা আবার কোম্পানীর লোকের সঙ্গে চুক্তি করিতে যাইয়া রেশম চাষীদিগের সহিত ও তন্তুবায়দিগের সহিত মাল সরবরাহের জন্য চুক্তি করিত এবং চুক্তি অনুসারে তাহাদিগকে দাদন দিত; নির্দ্ধারিত দিনে মহাজনেরা কাপড় লইয়া কুঠীতে উপস্থিত হইত। তথায় পরীক্ষা করিয়া কাপড় গৃহীত হইত ও বস্তাবন্দী করিয়া সরকারী রাজস্বের সঙ্গে সিপাহী পাহারা দিয়া কলিকাতায় পাঠান [illegible] তাহ[illegible] সাধারণতঃ এক বস্তায় এক শত হইতে এক শত কুড়িখা[illegible]ড় বান্ধা হইত। রেশম প্রধানতঃ

রাধানগর হইতে রপ্তানী হইত। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে রেসিডেণ্ট রেশমের চাষ বাড়াইবার আশায় তুতগাছের চাষের জন্য সস্তাদরে জমি বিলি করিয়া কাশীজোড়া, কুতবপুর, নাড়াজোল—এই সব স্থানের রেশম ব্যবসায়ীদিগকে মেদিনীপুরে আনিয়া বাস করাইবার চেষ্টা করেন। পরবৎসরও তিনি এইরূপ চেষ্টা করিলে ক্ষীরপাই হইতে কতকগুলি ব্যবসায়ী মেদিনীপুরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ কাপড়ের বর্ণের ও "জমী"র উন্নতিসাধন জন্য বিলাত হইতে একজন বিশেষজ্ঞকে মেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে এক জন বাণিজ্য রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়েন ; তাহাতে মনে হয়—যে ব্যবসা বাড়িয়াছিল ; নহে ত ব্যবসা বাড়াইবার আশায় সরকার এ ব্যবস্থা করেন।

এই সময় ফরাসীরাও মেদিনীপুরে ব্যবসা করিতেন। ঘাটালে, ক্ষীরপাইতে এবং জলেশ্বরের নিকটে মোহনপুরে ফরাসীদিগের দুইটী ছোট কুঠী ছিল। মোহনপুরে সাদা কাপড়, আর ক্ষীরপাইতে রেশমী ও সূতী কাপড় প্রস্তুত হইত। দুইটি আড়ংই চন্দননগরের শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল; আড়ং হইতে দালালদিগকে দাদন দেওয়া হইত, দালালেরা প্রায়ই আড়ংয়ের নিকট দায়িক হইয়া পড়িত এবং তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায়ের জন্য সময় সময় ফরাসীদিগকে ইংরাজের শরণ লইতেও হইত। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে একবার খেজুরীতে ফরাসীদিগকে প্রচুর চাউল সংগ্রহ করিতে দেখিয়া ইংরাজদিগের মনে আশঙ্কা জন্মে—ফরাসী সেনা আসিবে। ইংরাজ সেনাও সে জন্য সুসজ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে যখন বর্ষা পর্য্যন্ত ফরাসী সেনার সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন বুঝা গেল, মিথ্যা আশঙ্কায় সরকারদোতির মধ্যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হইয়াছিল।

মেদিনীপুরে প্রত্নসম্পদও অনেক। বহু জাতি মেদিনীপুরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—প্রত্নসম্পদে তাহাদের প্রভাব সপ্রকাশ। গোপীবল্লভপুর থানার এলাকায় যে সকল ছোট ছোট স্তম্ভ দেখা যায় সেগুলি সম্ভবতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে পার্ব্বত্য জাতিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাহার পর উড়িয়ারা কয় শতাব্দী ব্যাপিয়া মেদিনীপুরে প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল এবং সেই জন্য মেদিনীপুরের স্থাপত্যে উড়িষ্যার শিল্পপ্রভাব দেখা যায়। উত্তরে গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরে ও কংশেশ্বর মন্দিরে; দক্ষিণ-পশ্চিমে চন্দ্রেখাগড়ে* সহস্রলিঙ্গ মন্দিরে; দাঁতনে শ্যামলেশ্বরের মন্দিরে এবং আরও অনেক মন্দিরে উড়িষ্যার মন্দিরের বিশেষত্বব্যঞ্জক রচনারীতি দেখা যায়। তাম্রলিপ্তির লোকপ্রসিদ্ধ বর্গভীমার মন্দিরের সহিতও উড়িষ্যার মন্দিরের সাদৃশ্য সপ্রকাশ। ইহার কিছুকাল পরে বিষ্ণুপুর হইতে বঙ্গীয় স্থাপত্য মেদিনীপুরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গোয়ালটোরের কারুকার্য্য-মনোহর পঞ্চরত্নমন্দিরে, চন্দ্রকোণার লালজী-মন্দিরে, মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে নাড়াজোলের মন্দিরে বিষ্ণুপুরের মন্দিরের রচনারীতি লক্ষিত হয়।

মেদিনীপুরের নানাস্থানে দুর্গের চিহ্ন দেখা যায়। যখন দেশে অরাজকতা ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বা খাজনা দিবার দায় এড়াইবার জন্য জমীদারেরা গড়ে আশ্রয় লইতেন। জঙ্গল মহলে সকল জমীদারই প্রাচীরবেষ্টিত জঙ্গলাকীর্ণ গড় রাখিতেন। অন্যান্য স্থানে জঙ্গলের পরিবর্ত্তে বাঁশের ঝাড় করা হইত; তাহাতেও শত্রুর গতি প্রহত হইত। ময়নাগড়ের বর্ণনায় দেখা যায়, গড়ের দুইটি পরিখা ছিল—পরিখায় বহু কুম্ভীর থাকিত। তাহার মধ্যে [illegible] তাহ[illegible]সন্নিবিষ্ট বাঁশঝাড় ছিল যে, মার্হাটা অশ্বারোহীরা তাহার মধ্য[illegible] [illegible]গ্রসর হইতে পারিত না। বহু দীর্ঘ

দীর্ঘিকায় সে সময়ের শাসকদিগের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে। অনেক গ্রামের লোক এখনও সেই সব দীঘির জল পান করে। দাঁতনের কাছে এইরূপ দুইটি দীঘি বর্ত্তমান।

বাদশাহী শড়কের ধারে মুসলমান স্থাপত্যকীর্ত্তিরও অভাব নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মনে করেন, কপিলেশ্বর দেবের সময়ের (১৪৩৪—৬৯ খৃষ্টাব্দ) একটি মন্দির ভাঙ্গিয়া মুসলমানেরা গগনেশ্বরের মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

মেদিনীপুর রাজবংশ অতি প্রাচীন—তাহার উৎপত্তির ইতিহাস অতীতের কুহেলিকায় আবৃত—কিম্বদন্তীর অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য। কেবল জানিতে পারা যায়—মেদিনীপুরের রাজারা এককালে উড়িষ্যার রাজার অধীন ছিলেন। দেখা যায়, যখন আফগান দলপতি সুলেমান উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, তখন খয়রারাজা সুরত সিংহ উড়িষ্যার রাজার এই রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। সুরত সিংহের দেওয়ান ও সেনাপতি লক্ষ্মণ সিংহ উড়িষ্যার রাজার সহায়তায় প্রভুকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য দখল করেন।

আমাদের দেশে কোন হীনাবস্থ লোকের সৌভাগ্যোদয় হইলেই তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল গল্পই একরূপ। লক্ষ্মণ সিংহের সম্বন্ধেও গল্পের অভাব নাই। কথিত আছে, তাঁহার পিতার আদি বাস বর্দ্ধমানের নীলপুর গ্রামে। তিনি তথা হইতে লক্ষ্মণ ও শ্যাম নামক পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আশায় মেদিনীপুরে আইসেন। দরিদ্র পিতা পুত্র লক্ষ্মণকে এক ব্রাহ্মণের গৃহে গোরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। সেই ব্রাহ্মণ খয়রারাজা সুরত সিংহের সরকারে। তৎকালে মেদিনীপুরে খয়রা প্রভৃতি জঙ্গলী লোকদিগের [illegible] অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক

দিন বালক প্রভাতে গো-পাল লইয়া মাঠে গেল—কিন্তু দিনমণি মধ্যগগনে আগত হইলেও প্রত্যাবর্ত্তন করিল না, ইহাতে গো-স্বামী ব্রাহ্মণ চিন্তিত হইয়া স্বয়ং গো-পালের সন্ধানে গমন করিলেন। মাঠে যাইয়া তিনি দেখিলেন—তাঁহার গো-পাল তথায় তৃণভক্ষণরত—কিন্তু গোরক্ষক নিদ্রাগত; আর পাছে তাহার মুখে রৌদ্রপাত হয় সেই জন্য একটি কৃষ্ণবর্ণ সর্প তাহার মুখের উপর ফণা বিস্তার করিয়া অবস্থিত। সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, লক্ষ্মণ সাধারণ মানুষ নহে। সেই দিন হইতে তিনি আর তাহাকে গোরক্ষকের হীন কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না।

লক্ষ্মণসিংহ বলবান, চতুর ও সাহসী ছিলেন, মেদিনীপুরে তাঁহার শারীরিক শক্তির অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি কথিত আছে,—তিনি বন্য মহিষের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন। তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়াই রাজা সুরত তাঁহাকে চাকরী দেন। ক্রমে তিনি সুরত সিংহের দেওয়ান ও সেনাপতি হইয়াছিলেন।

সুলেমান বাঙ্গালার শাসক হইয়া উড়িষ্যা-বিজয়ার্থ সেনাদল প্রেরণ করিলে সামন্তনৃপতি সুরত সিংহ উড়িষ্যার রাজার সাহায্যার্থ লক্ষ্মণ-সিংহের অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। লক্ষ্মণসিংহ আক্রমণ-কারীদিগকে পরাভূত করিলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই মেদিনীপুর রাজ্য দান করেন এবং রাজ্য অধিকার করিবার জন্য এক দল সৈনিক প্রদান করেন। সেই সকল সৈনিকের বংশধরগণ অদ্যাপি কর্ণগড়ের সন্নিকটে বাস করিতেছে।

তখন দেশ কোন শত্রু [illegible] তাহ[illegible] আক্রান্ত হইলে রাজারা পুরাঙ্গনা-দিগকে কোন নিরাপদ স্থ[illegible]াইয়া রাখিতেন। উড়িষ্যার রাজার

আদেশে লক্ষ্মণসিংহ তাঁহার পুরাঙ্গনাদিগের অন্যত্র গমনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার যে তিন জন সহকারী সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, শত্রুনাশের পর রাজা তাঁহাদিগকেও উপাধিদানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এক জন ভূমি খনন করিয়া পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাকে ভূঁইয়া উপাধি দেন। আর এক জন বন্ধুর পথের উপর পল (খড় তৃণ) বিছাইয়া দিয়া পথ সুগম করিয়াছিলেন বলিয়া সালঙ্কারা মহিলারা সেই পথে গমনকালে তাঁহাদের নূপুরশিঞ্জিতে তাঁহাদের গমনবার্ত্তা প্রকাশিত হয় নাই। রাজা তাঁহাকে পয়াল-(পল) মল উপাধি দিয়াছিলেন। আর এক জন রাণীদিগের পলায়নে সাহায্য করায় পাল উপাধি পাইয়াছিলেন।

সেনাবলসহ উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণসিংহ গড়সর্দ্দার ও সহকারী গড়সর্দ্দারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া প্রভুকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকৃত করেন। তাহার পর তাঁহারা তিন জন সেই রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়েন।

সুরত সিংহের সাত রাণী সহমৃতা হইবার সময় প্রভুহন্তাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই অভিসম্পাত করেন যে, সাত পুরুষের মধ্যে তাহাদের বংশলোপ হইবে ও রাজ্য অপরের হস্তগত হইবে। লক্ষ্মণসিংহের ও বলরামপুরের জমীদারের সম্বন্ধে এই অভিসম্পাত বহুদিন ফলিয়াছে। সপ্তম-পুরুষে সহকারী গড়সর্দ্দার—নারায়ণগড়ের ভূস্বামীর বংশও লুপ্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন,—রাজা লক্ষ্মণসিংহ ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু 'মেদিনীপুরের ইতিহাস'-লেখক অনুসন্ধানে জানিয়াছেন,—তিনি সদ্‌গোপ ছিলেন। যে সমস্ত কারণে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল:—

১। অদ্যাপি উক্ত রাজবংশের কতকগুলি জ্ঞাতি কর্ণগড়ের অদূর-বর্ত্তী শিরোমণি গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা জাতিতে সদেগাপ।

২। কর্ণগড় রাজবংশের যে সকল কুটুম্ব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা জাতিতে সদেগাপ।

৩। চিরপ্রচলিত বিখ্যাত কিম্বদন্তী এই যে, উক্ত রাজবংশ জাতিতে সদেগাপ।

৪। কর্ণগড়ের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় বা রজপুতগণের বাস আছে, তাঁহারা কেহ কখনও ঐ রাজবংশকে তাহাদিগের স্বজাতীয় বলেন না।

৫। মেদিনীপুর জেলায়, কি বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, কি পঞ্জাবে, কি অন্য স্থানে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কখনও ঐ রাজবংশীয়গণকে তাঁহাদের আত্মীয়, কুটুম্ব, কি স্বজাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহা শুনা যায় না।

৬। কর্ণগড় রাজ্য বা জমিদারী লইয়া জ্ঞাতি, কুটুম্ব বা অপর সদেগাপবংশীয় বা ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সহিত যে বহুতর স্বত্ব ও শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় অতি বৃহৎ মামলা-মোকদ্দমা, জিলাকোর্ট, সদর দেওয়ানি আদালত, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট ও প্রিভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও কর্ণগড় রাজবংশ যে ক্ষত্রিয় ইহা কস্মিনকালে উল্লেখ হয় নাই। অপর পক্ষে, উঁহারা সদ্‌গোপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।

৭। নাড়াজোল-রাজবংশের বিখ্যাত রাজা মোহনলাল খাঁন ও কর্ণগড়ের শেষ রাজা অজিত সিংহের এক স্বগোত্র, রাজা কন্দর্পসিংহের সহিত যে তুমুল মামলা হ[illegible] তাহা[illegible] তাহাতে প্রিভি কৌন্সিলের মতে প্রাচীনকালে বাঙ্গালা হইতে [illegible]টী (সদ্‌গোপ ব্রাহ্মণের) পরিবার

মেদিনীপুরে আসিয়া জমীদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন…………ইত্যাদি। এখানে "সদ্‌গোপ ব্রাহ্মণ" বাক্যের দ্বারা বোধ হয়, প্রিভি কৌন্সিল এইরূপই বলিয়াছিলেন যে, উহা "সর্ব্বোৎকৃষ্ট সদ্‌গোপ"-জাতীয় পরিবার। সে যাহা হউক, তাঁহাদিগের মতে কর্ণগড়ের রাজারা জাতিতে যে প্রথমাবধি সদ্‌গোপ, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণসিংহ যে দক্ষ সেনাপতি ও শাসক ছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি সুশাসনে রাজ্য করিতেও বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ে তাঁহার ভ্রাতা শ্যাম সিংহ ঈর্ষ্যাবশে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তিনি ভ্রাতাকে বিতাড়িত ও নিহত করিয়া ১০৬৮ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর রাজ্য অধিকৃত করেন। ১০৭৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসিংহ জীবিত থাকিতেই তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তমের ও পৌত্র সংগ্রামের মৃত্যু হয়। সংগ্রামসিংহের তিন পুত্র ছিলেন—ছোট্টু রায়, রঘুনাথ রায় ও দুর্গাদাস রায়। লক্ষ্মণসিংহের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর ভ্রাতৃত্রয়ের চেষ্টায় ভ্রাতৃহন্তা শ্যামসিংহ রাজ্যভ্রষ্ট হয়েন। তখন ছোট্টু রায় রাজ্য গ্রহণ করেন। তিনি হুদা দোগাছিয়ায় যে দীর্ঘিকা খনন করান তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান।

কিন্তু তিনি অধিক দিন রাজ্যসম্ভোগ করিতে পারেন নাই। ১০৭৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন রঘুনাথ রাজা হইয়া পুত্র বীরসিংহের ও ভ্রাতা দুর্গাদাসের পুত্র যোগী মহাপাত্রের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।

১১০০ বঙ্গাব্দে রঘুনাথের পুত্র রামসিংহ রাজা হয়েন। প্রসিদ্ধ 'শিবায়ন'-গ্রন্থপ্রণেতা রামেশ্বর রঘুসরকারনি "মহারাজ রঘুবীর" বলিয়াছেন—

"রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর॥"

মার্শম্যান তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে রাজা রামসিংহকে মীরজাফরের সমসাময়িক বলিয়াছেন। কিন্তু মেদিনীপুরের ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয় প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মার্শম্যানের সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। তাহার কারণ—"'শিবায়ন' কাব্য হইতে জানা যায় যে, উহা ১৭১২ খৃঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল এবং তখন রাজা যশোবন্ত সিংহ মেদিনীপুরাধিপতি; রাজা তৎকালে কর্ণগড়ে অবস্থিতি করিতেন। অতএব ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, অন্ততঃ তৎপূর্ব্বে রাজা যশোবন্তের পিতা রাজারাম সিংহের মৃত্যু হইয়াছিল।" অপিচ—"কর্ণগড় রাজবংশের যে কুলাখ্যান পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে,—১১১০ বঙ্গাব্দে (১৭১১ খৃঃ অঃ) রাজা যশোবন্ত সিংহ তদীয় পিতার মৃত্যুর পর মেদিনীপুর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।"

ত্রৈলোক্য বাবু লিখিয়াছেন,—"ইতিহাসে ইনি মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা রাজারাম সিংহ নামে অভিহিত, কিন্তু এ প্রদেশে রাজা রাম সিংহ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। জনশ্রুতি আছে, ইনি বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হন। সেই সুযোগে ইঁহাদের কর্ম্মচারী রাধাকৃষ্ণ রায় ও সুধাকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি চক্রান্ত করিয়া ইঁহার পরিবর্ত্তে ইঁহার ভ্রাতা বীরসিংহ রায়কে মেদিনীপুরের রাজত্বে অভিষিক্ত করেন। এই ঘটনার পর বালক রামসিংহ গৃহ [illegible] তাহা[illegible]গ করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট গমন করেন। নব[illegible]রের এক কাজী তাঁহাকে দয়া

করিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেওয়াতে তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা নবাবের সমীপে জ্ঞাপন করিলেন। যে কয়েক দিবসের জন্য বীরসিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে সময়ে রাজ্যের অতিশয় বিশৃ-ঙ্খলতা ঘটে। প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিত না। তিনি নামে মাত্র রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চক্রান্তকারি-গণই সর্ব্বেসর্ব্বা। তৎকালে রাজ্যের নিয়মিত রাজস্ব নবাব সরকারে প্রদত্ত হয় নাই, নবাবও বীরসিংহকে রাজা বলিয়া জানিতেন না। এই সময়ে (১৬৮৯—৯৭) বাঙ্গালার সিংহাসনে মৃদুস্বভাব, পক্ষ-পাতশূন্য, ন্যায়পরায়ণ ইব্রাহিম খাঁ আসীন ছিলেন। তিনি ইহাও অবগত হইয়াছিলেন যে, রাজা রামসিংহ মেদিনীপুর রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অবিলম্বে বাকী রাজস্ব আদায় ও রাজা রামসিংহকে মেদিনীপুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নবাব ইব্রাহিম আদেশ প্রদান করিলেন। নবাবের সৈন্যগণ সহায়তা করিয়া রাজা রামসিংহকে মেদিনীপুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।" (১৬৯৩ খৃঃ)।

কর্ণগড়ে ও আবাসগড়ে তাঁহার কীর্ত্তি সপ্রকাশ। কেহ কেহ বলেন, তিনি এই দুর্গদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কেহ কেহ বলেন, তিনি দেশমধ্যে দস্যুতস্করের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া কর্ণগড় ও আবাসগড় স্থানদ্বয়কে দুর্গবদ্ধ করিয়া সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। এই দুর্গদ্বয়ের বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল। কর্ণগড় দুর্গ এক্ষণে ভগ্ন, কিন্তু মেদিনীপুর হইতে ক্রোশত্রয় উত্তরে অবস্থিত এই দুর্গ এককালে দুর্ভেদ্য ছিল। ইহা ভিতর ও বাহির দুই ভাগে বিভক্ত, বাহিরের অংশে সৈনিকগণ থাকিত ও হাটবাজার হইত। কর্ণগড়ের অধিষ্ঠাতা দণ্ডেশ্বর মহাদেবের ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়ার মন্দিরগুলিও এই অংশে অসরক্ষিত মন্দিরগুলি আজও বর্ত্তমান। এই দার্ঘদ দেবালয়গুলি স্থপতিকীর্ত্তির [illegible] নীয় উদাহরণ। মেদিনী-

পুরের ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—"এই প্রস্তরময় মন্দিরের নির্ম্মাণকৌশল অবলোকন করিলে অনুভূত হয়, উহা উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের বা পুরীর কোন মন্দিরের অনুকরণ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমাদের এইরূপ অনুমানের আরও তাৎপর্য্য এই যে, উৎকলের ও রাঢ়ের শাস্ত্রী ও মিস্ত্রীগণ একত্রিত না হইলে এই সর্ব্বজনসেব্য দেবতার প্রতিষ্ঠা হইত না এবং যুগপৎ ভয়ভক্তির উদ্রেকস্থল যুগান্তদর্শী এই সুদৃঢ় মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারিত না।" মহামায়ার মন্দিরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য রচিত পঞ্চ-মুণ্ডীর আসন আজও লোকের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে। এই রামেশ্বরের কথা আমরা পরে বলিব। গড়ে আরও কয়টি মন্দির ও ভক্তদিগের জন্য যোগীখোপা নামক একটি স্বতন্ত্র গৃহ আছে। মন্দিরে সিদ্ধিকুণ্ড নামে একটি কূপ আছে। লোকের বিশ্বাস, এই কূপোদক পান করিলে বন্ধ্যানারী সন্তানবতী হয়। গড়ের ভিতরাংশে রাজার বাসগৃহ ছিল। সে অংশ বেষ্টনপরিখায় বাহিরের অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। পরিখায় সকল সময়েই জল থাকিত।

আবাসগড় মেদিনীপুরের উত্তরে বাঁকুড়াগামী রাস্তার পূর্ব্বভাগে অব-স্থিত। ইহার পরিমাণ এক শত বিঘা হইবে। রাণী শিরোমণি শেষদশায় এইস্থানে বাস করিতেন। রাজা মোহনলাল খাঁন এইস্থানে বাস করিয়া ইহার বিবিধ উন্নতি সাধিত করেন।

রাজা রামসিংহ রাজ্যের অনেক উন্নতি করেন, তিনি কেশবপুরে যে জলাশয় খনন করান, তাহা আজও লক্ষিত হয়। তাহা "রামসাগর" নামে অভিহিত।

তাঁহার সৈনিকসংখ্যা ১২ হাজার ছিল। সেনাপতি "বক্সী" এবং সৈনিককর্ম্মচারীরা "সর্দ্দার" তাহা অভিহিত হইতেন। সৈন্যদিগকে "পাইক" বলা হইত। তাহারা বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর পাইত।

ইহারা যুদ্ধের সময় বন্দুক, তীর, টাঙ্গী, বর্শা, বাঁটুল প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যবহার করিত। কোন কারণে সেনাসংগ্রহ করিতে হইলে দুর্গের তোরণদ্বারের উপর হইতে নাগরা বাজান হইত। নিকটস্থ সর্দ্দার বা ঘাটওয়ান সেই শব্দ শুনিয়া স্ব স্ব নাগরা বাজাইতেন, সেই ধ্বনি শুনিয়া সৈনিকগণ যে যাহার সর্দ্দারের কাছে উপস্থিত হইত এবং দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া দুর্গপ্রাঙ্গণে সমবেত হইত।

উৎপীড়িত কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য রাজা রামসিংহের আশ্রয়ে শান্তিতে সাধনার ও কাব্যরচনার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রথমে মেদিনীপুর জিলার যদুপুর গ্রামে বাস করিতেন। তিনি নিজপরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যা'রে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।"

যদুপুরে তিনি তান্ত্রিক মতে যোগসাধনা করিতেন। এই স্থানেই তাঁহার 'সত্যনারায়ণের কথা' রচিত হয়। আজও মেদিনীপুর অঞ্চলে সত্যনারায়ণের পূজায় রামেশ্বরের 'কথা' পঠিত বা গীত হয়। শেষে যদুপুর ত্যাগ করিয়া তিনি রাজা রামসিংহের পারিষদ হইয়া মেদিনীপুর পরগণার অযোধ্যাবর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি রাজা রামসিংহের নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন—

"মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রামরাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত॥"

কর্ণগড়ে মহামায়ার মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী-আসন রচিত করিয়া তিনি তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া যোগসাধনা করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাকে রুদ্রাক্ষ [illegible]দান করেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় কবি শিবদুর্গার লীলা-স[illegible] না কথায় পূর্ণ 'শিবসঙ্কীর্ত্তন'

গ্রন্থ রচিত করেন। এই 'শিবায়ন' এখনও নানাস্থানে ভিখারী ও গায়কগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে।

রাজা রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা যশোবন্ত সিংহ মেদিনীপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই রাজবংশে ইঁহার মত যশস্বী পুরুষ আর দেখা যায় না। রাজকার্য্যে ইঁহার যেরূপ দক্ষতা ছিল, ধর্ম্মেও সেইরূপ মতি ছিল।

যশোবন্ত সিংহ রাজকার্য্যে কিরূপ দক্ষ ছিলেন মার্সম্যানের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হইয়া বাঙ্গালার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া বঙ্গদেশে সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সময় বাঙ্গালার রাজস্ব বৰ্দ্ধিত হয় এবং দিল্লীর ভাণ্ডার বাঙ্গালার সম্পদে পূর্ণ হয়। তাঁহার পুত্র ছিল না—জামাতা সুজাউদ্দীনই তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু চরিত্রদোষহেতু সুজাউদ্দীন মুর্শিদকুলীর বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী দৌহিত্র সরফরাজকে আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তখন সুজাউদ্দীন উড়িষ্যায়—আলিবর্দ্দী তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী পারিষদ। মুর্শিদ কুলী খাঁয়ের অন্তিম পীড়ার সংবাদ পাইয়া সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার মসনদ লইতে মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন। সরফরাজ পিতাকে বলে পরাভূত করিবার সঙ্কল্প করিলে তাঁহার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে এই কথা বলেন যে, পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের অস্ত্রধারণ মহাপাপ—তিনি যেন সেই পাপের অনুষ্ঠান না করেন। তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সরফরাজ সাদরে পিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুজাউদ্দীন বিচক্ষণ ও ন্যায়পর [illegible]শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বিশেষ তিনি প্রতিভাবান কর্ম্মচারী বা[illegible] [illegible]হাদের ক্ষমতা সুপ্রযুক্ত করিতে

জানিতেন। যশোবন্ত সিংহ মুর্শিদকুলীর শাসনকালে রাজকার্য্যে ব্রতী ছিলেন এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহারই মত বুদ্ধি ও চতুরতার সহিত ধর্ম্মজ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার মিশ্রণে লোকরঞ্জনক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার মসনদ লাভ করিয়া এই সকল গুণ দেখিয়া তাঁহাকে ঢাকার দেওয়ানীপদ প্রদান করেন। তিনি পুত্র সরফরাজকে নামে ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন; কিন্তু পুত্রকে কাছেই রাখিয়া ঘানিব আলিকে সহকারী ও যশোবন্তকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করেন। যশোবন্তের সুশাসনে দেশের সকল অনাচারের উচ্ছেদ হয় এবং রাজস্বাদি আদায়েরও সুব্যবস্থা হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। দেশের লোক তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। তিনি প্রজার সুখবিধানে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকায় প্রজারাও তাঁহাকে ভক্তি করিত ও ভালবাসিত।

পাঠকগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে, নবাব সায়েস্তা খাঁ যখন ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁহার শাসনগুণে খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত সুলভ হয়। তিনি টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় করাইয়া সেই ঘটনা স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকার পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ করিয়া তদুপরি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—যিনি তাঁহার মত টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় করাইতে পারিবেন, তিনিই যেন এই দ্বার মুক্ত করেন। সায়েস্তা খাঁয়ের পর আর কোন শাসনকর্ত্তা সেরূপ অল্পমূল্যে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাই সে দ্বার রুদ্ধই ছিল। যশোবন্ত সিংহ সেই দুষ্কর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার শাসনগুণে আবার ঢাকায় [illegible]কায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। যশোবন্তের এই কী[illegible]দান [illegible]লার ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ত না ক

সুজাউদ্দীন বৃদ্ধ হইয়া রাজকার্য্যে পূর্ব্ববৎ মনোযোগ দিতে বিরত হইলে তরুণবয়স্ক পুত্র সরফরাজ রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। তিনি বিচারকার্য্যে তাদৃশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, তাহা তাঁহার শোচনীয় পরিণামেই সপ্রকাশ। তিকি ঘানিবকে ঢাকা হইতে আনাইয়া তাঁহার স্থানে মুরাদ নামক এক যুবককে প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ ইঁহারই পেস্কার ছিলেন। মুরাদ ও রাজবল্লভ লোকের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করায় বিরক্ত হইয়া যশোবন্ত সিংহ পদত্যাগ করেন। তখন মুরাদের ও রাজবল্লভের অত্যাচারে ঢাকা অঞ্চলে প্রজার দুর্দ্দশার একশেষ হয়।

যশোবন্ত সিংহ বিষয়কর্ম্মে যেমন দক্ষ ছিলেন তেমনই ধর্ম্মানুরাগীও ছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে কিম্বদন্তী—কুলদেবতা দণ্ডেশ্বর ও মহামায়া তাঁহার অর্চ্চনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন; এমন কি দেবী তাঁহার প্রণতিপরায়ণ মস্তকে দিব্য কর সংস্থাপিত করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলেন এবং রাজার মস্তকে দেবীর পঞ্চাঙ্গুলি চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

মেদিনীপুরের ঐতিহাসিক দেবীর মাহাত্ম্য-সম্বন্ধীয় আর একটী কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন—"কথিত আছে, রাজা যশোবন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর মহামায়ার প্রসাদী মালাগ্রহণ করিতেন। এক সময়ে তিনি তিন দিবস মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এজন্য মালা গ্রহণ করা হয় নাই। সেবাকারী একজন উৎকল ব্রাহ্মণ ঐ তিন দিবসের মালা লইয়া গিয়া আপনার পত্নীকে তাহা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। রাজা বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া ঐ তিন দিবসের মালা ব্রাহ্মণের নিকটে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ ব[illegible] হইয়া তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে মালা আনিয়া রাজাকে দিলেন। তাহায় মালার সহিত একটী লম্বা কেশ (স্ত্রীলোকের মস্তকের কে[illegible]) দেখা গেল। রাজা ব্রাহ্মণকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই মালা আপনি কাহাকেও পরিতে দিয়াছিলেন কি?' ব্রাহ্মণ কম্পিতকলেবরে কহিলেন, 'না।' রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরাণীর মস্তকে ত চুল নাই; তবে এই চুল কোথা হইতে আসিল?' তখন ব্রাহ্মণ ভয়ে নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'ঠাকুরাণীর মস্তকে চুল আছে।' রাজা বলিলেন 'দেখাইতে পারিবেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হাঁ, কল্য দেখাইব।' এই স্থলে বলা উচিত, মহামায়ার মূর্ত্তি পাষাণময়ী—'যন্ত্রাকৃতি,' অতএব তাহাতে কেশ থাকা অসম্ভব। এ দিকে ব্রাহ্মণ রাজার নিকট চুল দেখাইবার কথা বলিয়া গিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দেবীর নিকট সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিলেন। কারণ চুল দেখাইতে না পারিলে রাজা তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন; অথবা অন্য কোন গুরুতর দণ্ড দিবেন। গভীর নিশায় প্রত্যাদেশ হইল, 'আমি কল্য বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যোগীধোপার উপরে চুল শুষ্ক করিতে বসিব, তুমি কেবল রাজাকে তাহা দেখিতে বলিও। উহা রাজা ব্যতীত আর কেহ দেখিতে পাইবে না।' তদনুসারে ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলে, তিনি তৎপর দিবস তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দর্শনের পরমুহূর্ত্তেই দেবী অন্তর্হিত হয়েন এবং রাজার মূর্চ্ছা হয়। রাজা সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন, ভগবতীর মন্দিরের দ্বার অবরুদ্ধ। প্রত্যাদেশ হইল, ঐ ব্রাহ্মণের দ্বারা আর পূজা হইবে না। গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে এক জন সদ্‌ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলে পূজা হইবে। তদনুসারে লোক প্রেরিত হয় এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানের এক গঙ্গোপাধ্যায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ আনীত এবং কর্ণগড়ে স্থাপিত হইয়াছিলেন। সেই গঙ্গোপাধ্যায় বংশীয়েরাই অদ্যাপি দেবীর সেবাকার্য্য সম্পাদন করেন।"

এইরূপ আরও অনেক কিম্বদন্তী না কং ক্রমে পরিপুষ্টিলাভ করিয়া

আজিও মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত যশোবন্তের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী নিম্নে প্রদত্ত হইল। তৎকালে মেদিনীপুরের উত্তরে বগড়ী ও ব্রাহ্মণভূম পরগণা এবং পশ্চিমে অনেক স্থান বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। সীমানির্ণয়াদি লইয়া মধ্যে মধ্যে রাজায় রাজায় বিবাদ বাধিত। তখন বিবাদের মীমাংসা বিচারালয়ে হইত না, যুদ্ধক্ষেত্রেই হইত। যখন উভয় পক্ষই বলশালী —সেনার অধিকারী, তখন এইরূপই হয়। বিশেষ তখন দেশের শাসনপ্রণালী পদ্ধতিবদ্ধ হয় নাই। একবার এইরূপ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুপুরের রাজা যশোবন্তের প্রাসাদ আক্রমণ করেন। যশোবন্ত তৎকালে মহামায়ার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ বহুক্ষণ তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিয়া শেষে ভয়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিল। শত্রুদল বাহিরগড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন তাহাদিগের হুঙ্কারে রাজার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সৈনিকগণ পলায়ন করিয়াছে, তিনি একা। তিনি তখন দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া "মাভৈ" "মাভৈ" রবে স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেবীর কৃপায় শত্রুসেনা পরাভূত হইল। কিন্তু বিষ্ণুপুরের কুলদেবতা মদনমোহন বিষ্ণুপুরের রাজার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন মদনমোহনের সহিত মহামায়ার যুদ্ধ হইল। মেদিনীপুরে কিম্বদন্তী, সে যুদ্ধে মহামায়ারই জয় হয় এবং সমরে পরাজিত হইয়া মদনমোহন স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এই কিম্বদন্তী লইয়া রামেশ্বর একখানি ক্ষুদ্র কাব্যও রচিত করিয়াছিলেন। "সেখানি অনেকদিন পর্য্যন্ত কর্ণগড়ে ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।" তাহার একটি কবিতা এইরূপ—

"মহামায়া মদনমোহনে ঠেলাঠেলি।
দ্বিজ রামেশ্বর ভণে, কলিকালে কালী॥"

রামেশ্বর যশোবন্তের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন আমরা পাঠক-দিগকে তাহা উপহার দিলাম—

"যশোবন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
সে রাজ সভায় হৈল সংগীত প্রকাশ॥
বিদগ্ধ বসুধাপতি অতি বিচক্ষণ।
শক্রসম সভাশোভা করে সুধীগণ॥
পণ্ডিত পৃথিবীপতি পণ্ডিতে মণ্ডিত।
গুণিপ্রিয় গুণবান গীতবাদ্যে রত॥
প্রতাপে পাবকসম সাগর-গভীর।
অবিরত ধর্ম্মভীত যেন যুধিষ্ঠির॥
রূপে কাম রণে রাম দানে হরিশ্চন্দ্র।
সকলে সামর্থ্য স্মিতমুখ সদানন্দ॥
নিত্যকর্ম্ম জপ পূজা যজ্ঞ দান ব্রত।
পেয়ে যাঁর প্রসাদ পাতকী হৈল পূত॥
জগৎ ভরিল যাঁর যশকীর্ত্তিগানে!
কর্ণপুরে কলিরামে কেবা নাই জানে॥
ভক্ত ভূমীশ্বর ভূপ ভুবন-বিদিত।
রিপুগর্ব্বখর্ব্ব সর্ব্বগুণসমন্বিত॥"

ভারতচন্দ্রের কবিতায় কৃষ্ণচন্দ্র যেমন "পরিপূর্ণ চৌষট্টী কলায়" তেমনই রামেশ্বরের কবিতায় যশোবন্ত "রূপে কাম, রণে রাম, দানে হরিশ্চন্দ্র।" কিন্তু অতিরঞ্জন বাদ দিলেও বুঝা যায়, যশোবন্ত সিংহ নানাগুণের অধিকারী ছিলেন।

তিনি যে সুধীসঙ্গ ভালবাসিতেন, তাঁহার আশ্রয়ে রামেশ্বরের গীতরচনাই তাহার প্রমাণ। রামেশ্বরের কথা আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মোপাসনামূলক হিন্দুধর্ম্মকে অন্ত্যজনগণের মনোরঞ্জক করিবার জন্য এদেশে চেষ্টা হইয়াছিল। পুরাণাদি পূর্ব্বকালের সেই চেষ্টার ফল। তাহার পর পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া এদেশে নানা দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি-বিষয়ক কবিতাপুস্তক রচিত হইয়াছিল। সে সকল অনেক সময় গীত হইত। রামেশ্বর শিবের মহিমা কীর্ত্তন করেন—

"চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥"

মধুমক্ষিকা যেমন নানা কুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়া মধুচক্রে সঞ্চিত করে, রামেশ্বর তেমনই নানা গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে তাঁহার উপকরণের সংগ্রহ-স্থানের পরিচয়ও পাওয়া যায়—

"জৈমিনিরে ঐ মণি বলিলা বেদব্যাস।
চতুর্দ্দশাধ্যায় পদ্মপুরাণে প্রকাশ॥"
"ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাষিলা ব্যাসের মত।"

তাঁহার পুস্তকের উপকরণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"যে কথা নৈমিষারণ্যে দীর্ঘ সত্রে দীর্ঘ পুণ্যে
শৌনকাদ্যে শুনাইলা সূত।
আর বৃদ্ধ পরম্পরা যে কিছু বলেন যাঁরা
তাহার করিয়া সারোদ্ধার॥"

দক্ষযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ে গৌরীর জন্ম, হরগৌরীর মিলন ও বিবিধ লীলা 'শিবায়নে' বর্ণিত। "শিবায়ণ" মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে গায়কদিগের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দুর্গোৎ-সবের সময় চণ্ডীপাঠের ন্যায় অনেকেরই গৃহে চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ণ পাঠ হয়। চণ্ডীমঙ্গল ষোলপালা গীত; শিবায়ণের আটপালা। গায়কেরা পালাক্রমে এই সকল গীত গান করিয়া থাকেন।"

যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার ফলে কেবল দেশের প্রাচীন সাহিত্যকে ঘৃণা করিতেই শিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে শিবায়ণ অনাদৃত থাকিলেও দেশের জনসাধারণ আজও তাহাতে রচনাকৌশল ও কবিত্ববিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হয়। আজকাল যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া যশ অর্জ্জন করেন, তাঁহারাও দাশরথি প্রভৃতি কবিগণের কবিত্বের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ। ইহা আমাদের লজ্জার ও কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় সকলের অগ্রণী সেই পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"বাগ্দিনীপালা ও শাঁখা পরাইবার বৃত্তান্তটি আমাদের এতই মিষ্ট লাগিল যে, দুই তিনবার পাঠ করিয়াও তৃপ্তিবোধ হইল না।" ভারতচন্দ্র যেরূপ শাক্তবৈষ্ণবের বিভেদ ঘুচাইবার জন্য বলিয়াছিলেন—"অভেদে যে জন ভজে—সেই ভক্ত ধীর"—রামেশ্বরও তেমনই হরি, হর, দুর্গা—দেবদেবীর একতা দেখিতেন। "তিনি শৈব কি শাক্ত কি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা শিবায়ণ পাঠ করিয়া স্থির করা কঠিন।"

১১৫৫ বঙ্গাব্দে যশোবন্ত সিংহের লোকান্তর হয়।

তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার দেয় রাজস্বের পরিমাণ এইরূপ ছিল—মেদিনীপুর পরগণা—২৯ হাজার ৪ শত ৬৩ টাকা ১০ আনা:—মেদিনী-পুর সহর—৯ শত ৪৬ টাকা ১০ আনা;—মনোহরগড় পরগণা—৩ শত

৮৭ টাকা ১ আনা ;—টেঁকিয়াবাজার পরগণা—৬ হাজার ৮ শত ৯৪ টাকা ৯ আনা ; বাহাদুরপুর পরগণা—২ হাজার ৪ শত ৩৪ টাকা ১২ আনা।

অধিক বয়স পর্য্যন্ত রাজা যশোবন্তের কোন সন্তান জন্মে নাই। তজ্জন্য তিনি ক্রমে বিষয়কার্য্যে অনাদর প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় কালাতিবাহন করিতেছিলেন। তাহার পর তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের জন্ম সম্বন্ধেও মেদিনীপুর অঞ্চলে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যখন রাজা সন্তানলাভ বিষয়ে নিরাশ হইয়া ধর্ম্মালোচনায় মন দিয়াছিলেন, তৎকালে এক দিন রাজবাড়ীতে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। রাজকর্ম্মচারীরা সাদরে ও সাগ্রহে তাঁহার ভোগের আয়োজন করিয়া দেয়। কিন্তু রাজা অপুত্রক—এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি অপুত্রকের গৃহে ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রস্থানোদ্যোগ করেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজা যশোবন্ত বিষাদে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ন্যাসী রাজার বিনয়ে ও ভক্তিতে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার আথিত্যগ্রহণে সম্মত হইয়া বলেন, রাজা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিলে তিনি রাজার অপুত্রক অপবাদ খণ্ডিত করিয়া তথায় জলগ্রহণ করিবেন। সন্ন্যাসীর এই কথায় সকলেই বিস্মিত হইল। রাজা সাধুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী সপ্তাহকালব্যাপী যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যে মুহূর্ত্তে সপ্তাহকাল পূর্ণ হইল, সেই মুহূর্ত্তেই সাধুর সমিধকুশাদি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং সেই অনলে সাধুর দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীর এইরূপ শোচনীয় পরিণামে যশোবন্তের পরিতাপের সীমা রহিল না। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার রাণী গর্ভবতী

হইলেন এবং যথাকালে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রই অজিৎসিংহ। কথিত আছে, অজিৎসিংহের আকৃতি অপরিচিত সন্ন্যাসীর আকৃতিরই অনুরূপ ছিল। লোকে বলিত, সন্ন্যাসী রাজার ভক্তিতে প্রীত হইয়া স্বদেহ ত্যাগ করিয়া আবার রাজার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

অজিৎসিংহ স্বয়ং এক জন বিখ্যাত বীর ছিলেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যাও ১৫ হাজার ছিল। তৎকালে এত সৈনিক রাখা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু অজিৎসিংহকে বোধ হয় অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। তিনি যে সময় পিতার গদীতে আরোহণ করেন, তখন বাঙ্গালার দুরবস্থার সীমা ছিল না। তখন এদেশে মুসলমান শাসনের পতন ঘটিতেছে। আরঙ্গজেবের দীর্ঘ রাজত্বের শেষ ভাগেই দেশের চারিদিকে বিদ্রোহ ও উপদ্রব লক্ষিত হইয়াছিল। সে উপদ্রব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। শাসনপ্রতাপ তখন বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পৌছিত না। কাযেই যে পারিত লুটিয়া লইত। দেশের এই অবস্থা। তাহার উপর আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে যে সমগ্র মোগলসাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়াছিল তাহারা স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার সম্পদ-সংগ্রহের লোভে পার্ব্বত্য বন্যার মত বাঙ্গালার প্রান্তরে উপনীত হইয়া সম্মুখে যাহা পাইত আত্মসাৎ করিত। এমন কি নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিতেন না। তাহারা একবার তাঁহাকেও বন্দী করিবার উপক্রম করিয়াছিল—একবার তাঁহার রাজ-ধানী লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল। বর্গীদিগের ভয়ে বাঙ্গালার নবাবই যখন নিশ্চিত নহেন, তখন জমীদারেরা নিশ্চিন্ত হইবেন কিরূপে? সেই সময় ভয়েই কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিবনিবাসে একটি সুরক্ষিত গৃহ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন, পাটুলীর জমীদারেরা বংশবাটীতে আসিয়া

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার পল্লীতে ছেলেভুলান ছড়ায় সেই দুর্দ্দিনের স্মৃতি এখনও রহিয়া গিয়াছে—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ুলো
বর্গী এল দেশে।"

তাহার পর বাঙ্গালী ইংরাজকে স্বেচ্ছায় রাজা করিয়া সে অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাজা অজিতের সময় ইংরাজেরা দেশশাসনের স্বপ্নও দেখেন নাই। তখন তাঁহারা বণিক। তাঁহারা অতি কষ্টে এদেশে বাণিজ্যের অধিকারলাভ করিয়া সেই অধিকার লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। সে কষ্টের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইংরাজের অসাধারণ অধ্যবসায়ের প্রমাণস্বরূপে লিখিত আছে। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ইংরাজ কোম্পানীকে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সার টমাস রো ইংরাজ-রাজদূতরূপে জাহাঙ্গীরের দরবারে উপনীত হয়েন। তাঁহার ৬ বৎসর পূর্ব্বে কাপ্তেন হকিন্স তথায় আসিয়াছিলেন—বাদশাহ তাঁহাকে আর যাইতে দেন নাই। শেষে জাহাঙ্গীর এক পিতৃমাতৃহীনা আর্ম্মাণী বালিকার সঙ্গে তাঁহাকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিয়া দেন। বাদশাহের অভিপ্রায় ব্যতীত তাঁহার পক্ষে দরবার-ত্যাগ সম্ভব ছিল না। উপহারে তোষামোদে বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া ইংরাজেরা যে অধিকার পাইতেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা তাহাদিগকে সেটুকু হইতেও বঞ্চিত করিতে প্রচেষ্ট হইতেন। বাঙ্গালার সিরাজদ্দৌলার ব্যবহারে তাহার চরমপরিণতি। বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া আবার ব্যবসায়ীদিগকে শাসনকর্ত্তাদের তুষ্ট করিতে হইত। বাদশাহের কর্ম্মচারী বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব-নাজিমের প্রতিনিধি এবং উড়িষ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তাও ইংরাজ-দূতদিগকে আপনার চরণচুম্বনে বাধ্য করাইয়াছিলেন।

ইংরাজ তখনও এই দুঃখলব্ধ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া—ব্যবসা করিতেই ব্যস্ত। লোকের ধনপ্রাণ তখন আর নিরাপদ নহে। এই সময় আত্মরক্ষার্থই অজিতসিংহকে সেনাবল বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছিল। সেই বর্দ্ধিত বল লইয়া তিনি সীমান্ত-জমীদারদিগকে পরাভূত করিয়া অধিকার বিস্তারও করিয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দেও তাঁহার পত্নী যে ২১ খানি জঙ্গল পরগণার অধিকারী ছিলেন, সরকারী দপ্তরেই তাহার প্রমাণ আছে।

রাজা অজিত নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তিনিই কর্ণগড় রাজ্যের শেষ রাজা। ১১১২ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই রাণী—ভবানী ও শিরোমণি রাজ্যাধিকারিণী হয়েন। ৫ বৎসর পরে ভবানীর মৃত্যু হয়। শিরোমণি ৫ বৎসর রাজ্যভোগ করেন। "রাজা লক্ষ্মণ-সিংহের রাজ্যপ্রাপ্তি হইতে রাজা অজিতসিংহের মৃত্যু পর্য্যন্ত গণনায় ৯৭ বৎসর এবং রাণী শিরোমণির রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত গণনায় ১৫২ বৎসর কর্ণগড় রাজবংশের প্রভুত্বকাল।"

অজিতসিংহের মৃত্যুর পর যখন রাজ্য তাঁহার পত্নীদ্বয়ের হস্তগত হইল, তখন বঙ্গদেশ অরাজক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজ্যাধিকারী রাণীরা রাজ্যরক্ষায় অক্ষম। মেদিনীপুরের অরণ্যময় অঞ্চলে চুয়াড়েরা প্রবল হইয়া উঠিল। দেশের লোক তাহাদিগের অত্যাচারে "ত্রাহি! ত্রাহি!" ডাক ছাড়িতে লাগিল। এই চুয়াড়দিগের দলপতি গোবর্দ্ধন দিকপতি শেষে কর্ণগড় আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। রাণীরা ভয় পাইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। আত্মরক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার আর কোন উপায় করিতে না পারিয়া তাঁহারা নাড়াজোলের জমীদার ত্রিলোচন (ঘোষ) খাঁনের শরণ লইলেন। ত্রিলোচন তাঁহাদিগের আত্মীয়—রাজা যশোবন্তের মাতুল-পুত্র; স্বয়ং প্রসিদ্ধ জমীদার। রাণীরা

গোপনে "রাণীপাটন" নামে পরিচিত স্থানে ত্রিলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এই সময় হইতে মেদিনীপুর রাজ্য নাড়াজোল-রাজবংশের হস্তগত হইবার সূচনা হইল।

মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখক নাড়াজোল-রাজবংশের পরিচয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"নাড়াজোল-রাজবংশ অতি প্রাচীনকাল হইতে তৎ-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। নাড়াজোল পরগণার মধ্যভাগে 'গড় নাড়াজোল' নামক স্থানে এই বংশের বাসস্থান। ইহার আয়তন প্রায় ৩৩০ বিঘা ভূমি। কর্ণগড় হইতে গড়নাড়াজোল প্রায় ১০ ক্রোশ ব্যবধান। এই গড় দুই ভাগে বিভক্ত—বহির্গড় ও অন্তর্গড়। রাজবাটীকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দুইটী পরিখা ঐ দুই গড়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছে। বহির্গড়ে হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং অনেক মুসলমানের বাস। খাজনার পরিবর্ত্তে উহারা বর্গী প্রভৃতি লুণ্ঠনপটু লোকদিগের আক্রমণ হইতে রাজধানী-সংরক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অন্তর্গড়ে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিখার মধ্যে—যেন একটি ক্ষুদ্র উচ্চ দ্বীপের উপরি-ভাগে রাজবাটী অবস্থিত। নাড়াজোল রাজাদিগের গড়বাড়ী দেখিতে অতি মনোহর; ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহদট্টালিকা, মন্দির, পূজার দালান, বৈঠকখানা, তোষাখানা, অন্দরমহল প্রভৃতি অনেক খণ্ডে বিভক্ত। এই অট্টালিকার মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত দ্বিতল ত্রিতল গৃহ বিরাজিত। এই প্রাসাদে প্রবেশের একমাত্র তোরণদ্বার। ঐ দ্বারে দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ড স্তম্ভ, ঐ স্তম্ভদ্বারের মস্তকোপরি নহবতখানা।"

রাজাদিগের কুলদেবতা সীতারামের মন্দির এবং এক প্রাচীন শিবালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রেণীবদ্ধ ছয়টি শিবালয়, রঙ্গমহল,

রাসমঞ্চ এবং দোলমঞ্চও উল্লেখযোগ্য। রাসমঞ্চ সপ্তদশ চূড়াবিশিষ্ট—"শতরত্ন মন্দির"। নাড়াজোলের আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিষ—"লঙ্কাগড়"। ইহা একটি বিশাল সরোবর—সলিল ফটিকস্বচ্ছ। এই সরোবরের মধ্যস্থলে একটি কৃত্রিম দ্বীপ আছে—তাহাতে একখানি গৃহ বিদ্যমান। এই পুষ্করিণীর জলকর ৬০ বিঘারও অধিক। কথিত আছে,—ইহা রাজা মোহনলাল খাঁ'র কীর্ত্তি। তিনিই বহু ব্যয়ে এই বিলাসক্ষেত্র নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে নাড়াজোল কুতুবপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল। এখন একটি স্বতন্ত্র পরগণা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম "তপ্পে নাড়াজোল"।

নাড়াজোল-রাজবংশ কর্ণগড় ও নারায়ণগড় প্রভৃতি স্থানের রাজ-বংশের ন্যায় প্রাচীন ও সম্মানিত। বর্ত্তমানে এই রাজাদিগের সম্পত্তি নানা সম্পত্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট।

ত্রিলোচন যে বংশে জমীদার ছিলেন সে বংশও অতি প্রাচীন। সে বংশে জ্যেষ্ঠাধিকার-প্রথা প্রচলিত থাকায় সম্পত্তি বিভাগে বিনষ্ট হয় নাই। বংশপতি উদয়নারায়ণ ঘোষ হইতে ত্রিলোচন পর্য্যন্ত বংশলতিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বংশ-তালিকা।
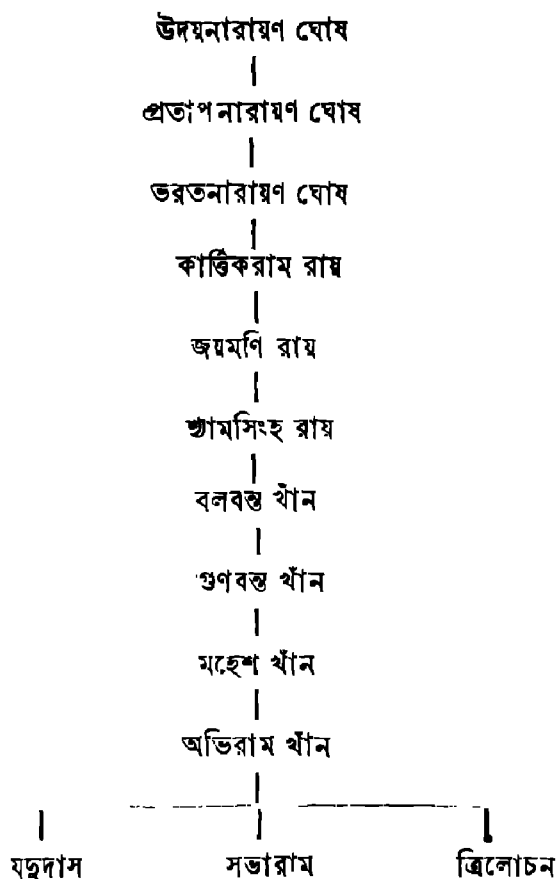
১১৬৫ বঙ্গাব্দে রাণীরা এই অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিবেন, ত্রিলোচন ততদিন তাঁহাদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক থাকিবেন; তাঁহাদের লোকান্তর হইলে ত্রিলোচন বা তাঁহার উত্ত-

রাধিকারী সম্পত্তি পাইবেন। এই বন্দোবস্তে ত্রিলোচন মেদিনীপুর রাজ্যমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা-সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং অচিরে চুয়াড়-বিদ্রোহ বিদলিত করিয়া রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন করেন।

১১৬৭ বঙ্গাব্দে রাণী ভবানীর মৃত্যু হয় এবং তাহার অল্পদিন পরেই ত্রিলোচনের মৃত্যু হয়। ত্রিলোচনের সন্তান না থাকায় তাঁহার ভ্রাতা যদুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মতিরাম পিতৃব্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়া মেদিনীপুর রাজ্যের কার্য্যপরিচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বলবন্ত বাঙ্গালার নবাব নাজিমের নিকট হইতে সম্মানজ্ঞাপক "খাঁন" উপাধিলাভ করায় বুঝা যায়, এই বংশে প্রভাবের, প্রতাপের ও প্রতিভার অভাব ছিল না। কিন্তু মতিরাম অধিক দিন মেদিনীপুর রাজ্যের ভারবহন করিতে পারেন নাই। পর বৎসর অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে ত্রিলোচনের অপর ভ্রাতা সভারামের পুত্র সীতারাম তাঁহার কার্য্যে ব্রতী হয়েন। তিনি জমীদারী কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ও রাজ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন।

সীতারামের দেওয়ানীর আমলে মেদিনীপুর রাজ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। তৎপূর্ব্বে ইংরাজগণ মেদিনীপুরের শাসনভার লইয়াছিলেন। এই সময় (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজ কোম্পানী মেদিনীপুর রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব ১ লক্ষ ১১ হাজার ৭ শত ৯৭ টাকা ৮ আনা ৮ গণ্ডা নির্দ্ধারিত করেন। রাজা যশোবন্তের সময় যে রাজস্ব ছিল বর্ত্তমানে রাজস্ব তদপেক্ষা ৭১ হাজার ৬ শত ৭০ টাকা ৮ আনা ৬ গণ্ডা বর্দ্ধিত হইল। রাণী শিরোমণির পক্ষে এত অধিক রাজস্ব প্রদান করা অসম্ভব হওয়ায় রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। এই কারণে নাড়াজোল জমীদারীও খাস হইয়া গেল। মেদিনীপুর রাজ্যে ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর ও চাকরদিগকে চাকরান বলিয়া যে সব জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল, "নিজ

লওয়াজিমাৎ” নামে পরিচিত সেই সব জায়গীর ব্যতীত আর সব জমীই ইংরাজ সরকারের খাস হইল। এ দিকে ১১৯১ বঙ্গাব্দে সীতারামের মৃত্যু হইল।

কথিত আছে—মহামায়া সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিলোচনকে স্বীয় পদাঙ্কযুক্ত একখানি বস্ত্র দিয়াছিলেন; বস্ত্রখানি অদ্যাপি নাড়াজোল-রাজবংশের কুলদেবতার মন্দিরে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। সেই দেবীপ্রসাদ সম্বল করিয়া সীতারামের পুত্র আনন্দলাল বিপদসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর উদ্ধার-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন।

আনন্দলাল দেখিলেন, ইংরাজ সরকার যখন রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন, তখন বর্দ্ধিত রাজস্বে পৈত্রিক জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ব্যতীত উপায় নাই। তাই তিনি ১৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা ১০ আনা জমা স্বীকার করিয়া নাড়াজোল জমীদারী নূতন করিয়া বন্দোবস্ত লইলেন।

এ দিকে রাণী শিরোমণির দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। বৃদ্ধি জমা দিতে অক্ষম হওয়ায় তাঁহার জমীদারী বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেদিনীপুরের রাজারা বহু সৈন্য রাখিতেন। সৈনিকেরা বেতন পাইত না—পাইকান জমী ভোগ করিত। ইংরাজ সরকার সেই সব জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ায় তাহারা জীবনোপায়হীন হইয়া দস্যু-তস্করের মত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা চুয়াড়দল-ভুক্ত হইয়া চুয়াড়দিগের সঙ্গে গ্রাম ও নগর-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। দস্যুদলের বৈশিষ্ট্যই এই যে, কোথাও এইরূপ একটি দল গঠিত হইলে চারিদিক হইতে দুর্ব্বৃত্তগণ আসিয়া সে দল পুষ্ট করে। ইংরাজ সর-কারের বিশ্বাস জন্মিল, বাজেয়াপ্ত জমীদারীর মালেক রাণী শিরোমণির প্ররোচনাতেই তাঁহার কর্ম্মচ্যুত ও ভূমিভ্রষ্ট সৈনিকগণ এমন কার্য্য করি-তেছে। ইংরাজ সরকার রাণীকে বন্দী করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ

করিলেন। এই বিপদের সময় রাণীর ভৃত্যাদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কেবল আনন্দলালের পিতৃব্য চুণীলাল এই দুঃসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। ইংরাজের সেনাদল রাণীর বাসস্থান কর্ণগড়ে প্রবেশ করিল—গড়ের মধ্যে সঞ্চিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। রাণী তাহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদও করিলেন না—স্বয়ং সৈনিকদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। চুণীলালও সেই পথ অবলম্বন করিলেন। সেনাপতি রাণীর ও চুণীলালের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি দুই জনকে কয় দিন আবাসগড় দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। আবাসগড়ে বন্দী অবস্থায় থাকিবার সময় সেনাপতির কৃপায় তাঁহারা আনন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতায় রাণীকে ও চুণীলালকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল। এদিকে আনন্দলাল তাঁহাদের উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাণী শিরোমণি আনন্দলালকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; সেই জন্য ও পিতৃব্যের জন্য তিনি তাঁহাদিগকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সদর নেজামত আদালতের বিচারে তাঁহারা নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি পাইলেন। সেই বৎসর জুন মাসে ইংরাজ সরকার রাণীকে বাজেয়াপ্তী ২৮টি বন্দুক ও ছট্‌রা, ১টি হস্তী ও ১টি সোণার হুক্কা প্রত্যর্পণ করিলেন। রাণী কর্ণগড় ত্যাগ করিয়া আবাসগড়ে গমন করিলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল সেই স্থানেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

তখনও মেদিনীপুর রাজ্যে রাজস্ব টাকা আদায় হইত না—প্রজারা ফসলের কতকাংশ খাজনা বাবদে জমীদারকে দিত। এরূপ অবস্থায়

রাণীর পক্ষে প্রজাদিগের নিকট হইতে সদরখাজনা আদায় করাও দুঃসাধ্য বুঝিতে পারিয়া ইংরাজ সরকার মেদিনীপুর রাজ্যের খাজনা ১ লক্ষ ১১ হাজার ৭ শত ৯৭ টাকা ৮ আনা ৮ গণ্ডা হইতে ৮৫ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত করিলেন। কিন্তু রাণী শিরোমণি এ জমাও স্বীকার না করিয়া মেদিনীপুর রাজ্যের ঐ পরগণা দানপত্রদ্বারা আনন্দলালকে দান করিলেন। সে দানপত্রের তারিখ ২৭শে আষাঢ়, ১২০৭ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ৩০শে জুন, ১৮০০। এই দানপত্র ৩০শে জুলাই তারিখে রেজেষ্টারী করা হয় এবং এই দলিলের বলেই আনন্দলাল "রাজা" হয়েন। আনন্দলাল উভয় জমীদারীর মালেক হইয়া জমীদারীর কায চালাইতে লাগিলেন। ১২১২ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত এইভাবে কায চলিল।

এই সময় নানা লোকের মন্ত্রণায় রাণী শিরোমণি রাজ্যলোভে প্রদত্ত জমীদারী পাইবার জন্য মামলা দায়ের করিলেন।

এই মোকদ্দমা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১২১৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজা আনন্দলালের মৃত্যু হইল। তাঁহার সন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দানপত্র (হেবানামা) করিয়া যান ; তদ্দ্বারা মেদিনীপুর রাজ্যের চারি পরগণা কনিষ্ঠভ্রাতা মোহনলালকে ও আর এক হেবানামার দ্বারা পৈত্রিক সম্পত্তি নাড়াজোল জমীদারী অপর ভ্রাতা নন্দলালকে দিয়া যান।

আনন্দলালের মৃত্যুর পর মোকর্দ্দমায় মোহনলাল খাঁনকে পক্ষভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে নিম্ন আদালতে মামলার বিচার হইয়া যাইলে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল রুজু হইল ; আপীলে রাণীর জয় হইল। কারণ সদর দেওয়ানী আদালত সাব্যস্ত করিলেন,—হিন্দু বিধবা কোন মতেই স্বামীর মৃত্যুতে প্রাপ্ত সম্প-

ত্তির সর্ব্বাংশ হস্তান্তরিত করিতে পারেন না; যদি বিশেষ কারণে সম্পত্তির কতকাংশ হস্তান্তর করিতে হয়, তাহা হইলেও কেবল স্বামীর নিকট-আত্মীয়দিগের সম্মতিক্রমে সে কার্য্য হইতে পারে না; সে জন্য স্বামীর সকল উত্তরাধিকারীর সম্মতি লইতে হইবে; আর এক জন পরকে সম্পত্তি দানপত্র দিতে হইলে তাহাতে স্বামীর সকল উত্তরাধিকারীর সম্মতি ও স্বাক্ষর থাকা চাহি। রাণীর যে দানপত্রের বলে আনন্দলালের পর মোহনলাল সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন, সে দানপত্রে তাঁহার স্বামীর উত্তরাধিকারিগণের স্বাক্ষর ছিল না। স্থতরাং দানপত্র অসিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

রাজা মোহনলাল এই রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভিকাউন্সলে আপীল করিলেন এবং মোকর্দ্দমা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে মেদিনীপুর কলেক্টরের অধীন রহিল।

১২২০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আশ্বিন, (ইংরাজী—১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮১২ খৃষ্টাব্দ) তারিখে রাণী শিরোমণির মৃত্যু হইল। তখন কন্দর্পসিংহ নামক অজিতসিংহের এক জন দূর জ্ঞাতি আর এক হেবানামা দাখিল করিয়া মেদিনীপুর রাজ্যের চারি পরগণার অধিকার চাহিলেন। তিনি যে হেবানামা দাখিল করিলেন, তাহা রাণীর মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সম্পাদিত বলিয়া ব্যক্ত করা হইল। মোহনলালও পূর্ব্বোল্লিখিত হেবানামার বলে সম্পত্তি দাবী করিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর সকল পক্ষকে স্ব স্ব দাবীর বিবরণ দিয়া আবেদনপত্র দাখিল করিতে আদেশ করিলেন।

সকল পক্ষের আবেদন লইয়া জেলার জজ বিচার করিয়া ১৮১৩ দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে যে রায় দিলেন তাহাতে সাব্যস্ত হইল:—

(১) কন্দর্পসিংহ যে হেবানামার বলে সম্পত্তি পাইবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন, সে হেবানামা রাণী শিরোমণির মৃত্যুর পর প্রস্তুত হয়, তাহা জাল। আবার কন্দর্পসিংহ যে শাস্ত্রানুসারে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বা কোন দলিলের বলে সম্পত্তি পাইতে পারেন এমন প্রমাণের অভাব।

(২) ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট তারিখে ডিক্রীর ব্যবস্থা অনুসারে অজিতসিংহের মাতুলপুত্রগণই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং রাণী শিরোমণির মৃত্যুর পর তাঁহারাই সে সম্পত্তি পাইবেন।

(৩) কিন্তু ঐ মাতুলপুত্রগণ মোহনলাল খাঁনকে সম্পত্তিতে স্ব স্ব স্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছেন।

(৪) এ সকল সিদ্ধান্ত সত্বেও মোহনলাল খাঁন মোকদ্দমায় বিলাতে যে আপীল দায়ের করিয়াছিলেন, সে আপীলের রায় বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন থাকিবে।

জেলার জজ বাহাদুরের এই সিদ্ধান্ত সদর দেওয়ানী আদালতে প্রেরিত হইল। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারকেরা সাব্যস্ত করিলেন যে, এই রায়ের পর মেদিনীপুর জমীদারীতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আর কোন অধিকার থাকিতে পারে না। সুতরাং মোহনলাল খাঁন জামীন দিয়া সম্পত্তি দখল করিতে পারেন।

মোহনলাল জমীদারী দখল লইলেন। কিন্তু দুই পক্ষে মামলা শেষ হইল না, চলিতে লাগিল। শেষে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে প্রিভি কাউন্সিল মোহনলালকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিলেন। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে এই সম্পত্তির অধিকারীদিগের কুলাচারঘটিত তর্কের যে মীমাংসা হইয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সদর দেওয়ানী আদালত সাব্যস্ত করেন,—

হিন্দু বিধবা কোন ক্রমেই স্বামীর মৃত্যুতে প্রাপ্ত সম্পত্তির সর্ব্বাংশ হস্তান্তরিত করিতে পারেন না, যদি বিশেষ কারণে সে সম্পত্তির কতকাংশ হস্তান্তর করিতে হয়, তাহা হইলেও কেবল স্বামীর নিকট—আত্মীয়দিগের সম্মতি লইয়া সে কার্য্য হইতে পারে না ; সে জন্য স্বামীর সকল উত্তরাধিকারীর সম্মতি লইতে হইবে ; আর এক জন পরকে সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা দিতে হইলে তাহাতে স্বামীর সকল উত্তরাধিকারীর সম্মতি ও স্বাক্ষর থাকা চাই। প্রিভি কাউন্সিল এই সিদ্ধান্তের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—যে সদ্গোপবংশ এই মোকর্দ্দমা দায়ের হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই সম্পত্তির অধিকারী, তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে মেদিনীপুরে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু মেদিনীপুরে প্রচলিত মিতাক্ষরা অনুসারে কায না করিয়া সব ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগাদির শাসন মানিয়া চলিয়াছেন। আর মিতাক্ষরামতে যে দূরস্থ জ্ঞাতি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে চাহেন তিনি সম্পত্তি পাইতে পারেন না ; কারণ, নিঃসন্তান স্বামীর মৃত্যুর পর পত্নী পরকে দানপত্র দ্বারা সম্পত্তি দিলেও দায়ভাগ অনুসারে সে দান সিদ্ধ।

প্রিভি কাউন্সিলের এই রায়ে জজদিগের একটি অজ্ঞতার চিহ্ন সপ্রকাশ ছিল। তাঁহারা মেদিনীপুর রাজবংশকে "সদ্গোপ ব্রাহ্মণ" বলিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বোধ হয় তাঁহারা "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" অর্থে "ব্রাহ্মণ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে মেদিনীপুর বাঙ্গালার অন্তর্গত হইলেও তখন এমত ছিল না। তথায় মিতাক্ষরার শাসন চলিতেছিল। কিন্তু মেদিনীপুর রাজবংশে বাঙ্গালার মত দায়ভাগশাসন চলিত ছিল।

প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে এই বংশে উত্তরাধিকারপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়া যায়।

এই মোকর্দ্দমা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১২৩৭ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে রাজা মোহনলালের লোকান্তর ঘটে। তিনি তাঁহার জমীদারীর মধ্যে বহু জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন; সে সকলের মধ্যে ৩০টি নাড়াজোলে ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে লঙ্কাগড় অতি প্রসিদ্ধ; ইহার পরিমাণ সাড়ে বাইট বিধা; মধ্যস্থলে গ্রীষ্মাবাস। রাজা মোহনলাল ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পুষ্করিণী খনন ও গৃহনির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১২২৫ বঙ্গাব্দে তিনি গড়নাড়াজোলে একটি দার্ষদ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বারাণসীতে তীর্থদর্শনান্তে ফিরিবার সময় মন্দিরের প্রস্তর সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি এই মন্দিরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই কয়জনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে তিনি রামসীতার বিবাহ-উৎসবে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; তদুপলক্ষে বারাণসী, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠায় রাজার ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ১২৩৫ বঙ্গাব্দে তিনি একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গারাম দাসকে তাহার মোহান্ত নিযুক্ত করেন। এই উপলক্ষেও বারাণসী বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান হইতে বহু মোহান্তের সমাগম হয়। তাহাতে রাজার প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিনি নানারূপ ধর্ম্মকর্ম্মে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। নাড়াজোলে ও আবাসগড়ে তাঁহার সত্রে নিত্য বহুলোক অন্ন পাইত।

রাজা মোহনলালের ৪ রাণী ছিলেন; প্রথমার ও দ্বিতীয়ার নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হয়। তৃতীয়া কুন্দলতার গর্ভে—অযোধ্যারাম, রামজয় ও ব্রজকিশোর তিন পুত্রের এবং কনিষ্ঠা রঙ্গলতার গর্ভে—রামচন্দ্র, হৃদয়রাম ও রামকমল তিন পুত্রের জন্ম হয়। মোহনলালের মৃত্যুকালে ইহারা সকলেই নাবালক।

শ্বাসকষ্টে পীড়িত হইয়া রাজা মোহনলাল খাঁ মৃত্যুর পূর্ব্বে ১২৩৭বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে দানপত্রদ্বারা তাঁহার নাবালক জ্যেষ্ঠ পুত্র অযোধ্যারামকে রাজ্যাধিকারী করিয়া রাণীদ্বয়কে অভিভাবক ও পিতৃব্য চুণীলাল খাঁনকে সরবরাহকার নিযুক্ত করেন। অল্পদিন পূর্ব্বে চুণীলালের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র শ্রীমন্তলাল রাণীদিগের সম্মতিক্রমে পিতার স্থানে সরবরাহকারের কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রাণীদ্বয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উৎপন্ন হইয়া মামলা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হইতে থাকে এবং শেষে তাঁহারা জমীদারী দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া লয়েন।

দীর্ঘ ৭ বৎসর এইরূপভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থায় কার্য্য-চালনার ফলে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী রাজস্ব বাকি পড়ে এবং সম্পত্তি লাটবন্দী হয়। কোন ক্রেতা না থাকায় সরকার "সরকারী ডাক" ১ টাকায় সম্পত্তি খরিদ করিয়া রাখেন। পর বৎসর ২০ বৎসরের জন্য জমীদারী রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানীর সঙ্গে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

জমীদারী বিক্রীত হইয়া গেলে রাণীরা নিলাম রদের জন্য দরখাস্ত করেন এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার নিলাম রদ করিয়া সম্পত্তি রাণীদিগকে দেন; কেবল জঙ্গলমোহলের ইজারায় ওয়াটসন কোম্পানীর সকল স্বত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। ওয়াটসন কোম্পানীও ২০ বৎসরের অবশিষ্ট কালের জন্য রাণীদের নিকট হইতে জঙ্গলমহল ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন।

এদিকে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সাবালক হইয়া রাজা অযোধ্যারাম অজিৎ সিংহের বংশের নিয়ম ও জ্যেষ্ঠাধিকারহেতু সমগ্র সম্পত্তি পাইবার জন্য নালিশ রজু করেন। বহুদিনব্যাপী মামলার পর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হয়।

এই মোকর্দ্দমায় মেদিনীপুরের সদর আমিনের রায়ের বিরুদ্ধে অযোধ্যারাম সদর দেওয়ানী আদালতে যে আপীল করেন, তাহাতে মোকর্দ্দমার অজুহত প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছিল। রাজা মোহনলাল মৃত্যুর পূর্ব্বে অযোধ্যারামকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিয়া গদি দান করেন। রাণী কুন্দলতা ও রাণী রঙ্গলতা তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হয়েন। তাহার পর অনেক মামলা মোকর্দ্দমা চলে এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে দায়রা জজ আদেশ করেন যে, অযোধ্যারাম ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবেন—অপরার্দ্ধ মোহনলালের দ্বিতীয়া রাণী রঙ্গলতার গর্ভজাত পুত্রত্রয়ের প্রাপ্য। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যারাম মেদিনীপুরের জিলা আদালতে ঐ অপরার্দ্ধের অধিকার-প্রাপ্তির জন্য নালিশ রজু করেন। তিনি নিম্নলিখিত কারণে সমগ্র সম্পত্তি দাবী করেন—

(১) তাঁহার রাণী শিরোমণি বংশের নিয়মানুসারে একাই সমগ্র সম্পত্তি ভোগ করিয়াছেন।

(২) এ বংশে বংশের একজনের সমগ্র সম্পত্তি লাভই কুলপ্রথা।

(৩) রাণীদ্বয় তাঁহার অপর ভ্রাতাদিগের নাম মালেক বলিয়া স্বীকার করেন; ইহাতে মোহনলালের উইলের সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে।

(৪) যে উইলে অযোধ্যারামকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষ জবাবে বলেন, বিবাদী সম্পত্তি কাহারও পৈত্রিক সম্পত্তি নহে। তাঁহাদের কুলপ্রথানুসারে সম্পত্তি বিভক্ত হওয়াই সঙ্গত। রাজা মোহনলালের উইলের মর্ম্ম এই যে,—জ্যেষ্ঠ অযোধ্যারাম যদি সদ্ভাবে অন্য ভ্রাতাদিগের সহিত সম্মতিক্রমে একান্নে বাস করেন, তবে তিনি সম্পত্তির কর্ত্তা থাকিতে পারেন। তিনি তাহা না করিলে সম্পত্তি

বিভক্ত হইবে! অযোধ্যারাম ও তাঁহার মাতা বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। মোহনলালের উইলেও দানসম্বন্ধে তাঁহার এক পত্রে দেখা যায়, সম্পত্তি বিভক্ত হওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এ সম্পত্তি মোহনলালের স্বোপার্জ্জিত; সুতরাং ইহার উত্তরাধিকার-ব্যাপার অন্য কোন বংশের কুলপ্রথানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। সম্পত্তির পূর্ব্বাধিকারীর বংশেও এক জনের উত্তরাধিকার-প্রথা ছিল না।

তখন রামমোহন রায় সদর আমিন। তিনি নানা কারণে অযোধ্যা-রামের মামলা ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন এবং তাহাকে খরচের দায়ী করেন। বিক্রীত সম্পত্তিতে সরকার কর্ত্তৃক ৩ ভ্রাতার নামে নামপত্তন করিয়া লওয়া হয়। সরকারের এই কার্য্যের দ্বারা উইলের সর্ত্ত নষ্ট হয় এবং উভয় পক্ষেই অর্দ্ধাংশ হিসাবে সমগ্র জঙ্গলমহল ওয়াটস কোম্পানীর সঙ্গে ইজারা বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর অযোধ্যারাম আর সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইতে পারেন না। অযোধ্যারাম পিতার উইলের নির্দ্দেশ-অনুসারে কায করেন নাই। অপর পক্ষ রাজা মোহনলালের যে পত্র দাখিল করেন, তাহাতে লেখা ছিল, রাজা অযোধ্যারাম ও রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতি দানের কার্য্য পরিচালিত করিবেন।

সদর আমিনের এই নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে অযোধ্যারাম আপীল দায়ের করেন। আপীলে সদর দেওয়ানী আদালত আমীনের রায় বাহাল রাখিতে অস্বীকার করেন। কারণ, সরকারী নিলামখরিদ মহল প্রত্যর্পণে সম্পত্তি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সদর দেওয়ানী আদালত এই মোকর্দ্দমায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিচার করেন—

(১) মোহনলাল যে অজিৎ সিংহের সম্পত্তি পাইয়াছিলেন সেই অজিৎসিংহের পরিবারে উত্তরাধিকারের কোন্ নিয়ম প্রচলিত?

(২) মোহনলালের উইলের সদর্থ কি ?

(৩) মোহনলাল কিরূপ সর্ত্তে অজিৎ সিংহের স্পত্তি পাইয়াছিলেন ? যদি তিনি সে সম্পত্তি পূর্ব্বাধিকারীর কু থানুসারে ভোগ করিবার সর্ত্তে পাইয়া থাকেন, তবে তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহা বিভক্ত করিতে পারেন কি না ?

প্রথম বিষয়ে বিচারকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, সে সম্পত্তি বিভক্ত হইতে পারে না। মোহনলাল তাঁহার উইলে স্পষ্টই বলিয়াছেন, সে সম্পত্তি পরিবারের এক জনেরই ভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে এবং তিনিও সম্পত্তি প্রাপ্তিকালে ভ্রাতা নন্দলাল বর্ত্তমান থাকিলেও সমগ্র সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তাহাতে রাণী শিরোমণির দাখিলী কাগজেও দেখা যায় ; পুরুষানুক্রমে এ সম্পত্তি পরিবারের একজনেরই ভোগ্য হইয়া আসিয়াছে। জমীদারী যে প্রদেশে অবস্থিত, সে প্রদেশের নিয়মানুসারেও সম্পত্তি অবিভাজ্য।

দ্বিতীয় কথা—মোহনলালের উইলের সদর্থ। বিচারকদিগের মতে মোহনলালের অভিপ্রায় এই যে, অযোধ্যারাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একক সমগ্র সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া যে বংশের সম্পত্তি লাভ করিবেন সেই বংশের সকল অধিকার সম্ভোগ করিবেন। উইলের শেষাংশে যে নির্দ্দেশ আছে তাহাতে সম্পত্তি বিভাগের অভিপ্রায় বুঝা যায় না—যাহাতে অযোধ্যারাম ভ্রাতৃগণের ভরণপোষণবিষয়ের অবহেলা না করেন; সেই উদ্দেশ্যেই সে সব কথা লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং ভ্রাতাদিগের ইচ্ছানুসারে এই অবিভাজ্য সম্পত্তি বিভক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয় বিষয়ে বিচার করিলে দেখা যায়, মোহনলাল যে সব সর্ত্তে

রাণী শিরোমণির সম্পত্তি পাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি সে বংশের নিয়ম পালন করিতে বাধ্য।

এ সকল সিদ্ধান্ত অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালত অযোধ্যারামকেই সম্পত্তির অধিকারী সাব্যস্ত করিয়া দেন।

অযোধ্যারামের নাবালকী আমলেই সম্পত্তিতে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাহার পর কয় বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে কেবলই মোকর্দ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবের নিকট হইতে জমিদারী বন্ধক রাখিয়া ঋণগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি ঋণশোধের কোন উপায় করিতে না পারায় উত্তমর্ণেরা বন্দক বাবদে নালিশ করিয়া ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বয়ঃসিদ্ধ করিয়া সমগ্র জমীদারী দখল পাইলেন। কিন্তু তাঁহারা উহা না রাখিয়া জন ক্যাম্পটন অ্যাবট নামক এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলেন। অ্যাবট সব টাকা নগদ দিতে না পারায় কতক টাকা নগদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থের জন্য ক্রীত সম্পত্তি বিক্রেতাদিগের নিকট বন্দক রাখিয়া জমীদারীর দখল লইলেন।

পর বৎসর—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ সম্পত্তি লাটখাজনা অনাদায়ে নিলামে বিক্রীত হয়। এই নিলাম কিরূপে হয় তাহা পাঠককে বলিব। আমরা বলিয়াছি, অ্যাবট সম্পত্তি ক্রয়কালে তাহার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারেন নাই। বোধ হয় সম্পত্তি রাখিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না—তিনি মধ্যে হইতে কিছু টাকা পাইবার ইচ্ছাই করিয়াছিলেন। তখন মিষ্টার ম্যাক-আর্থার বাঙ্গালার নবাব নাজীমের আমমোক্তার। অ্যাবটের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হইল, তিনি মার্চ্চ কিস্তির লাটখাজনা দাখিল করিবেন না এবং ম্যাক-আর্থার ৩ লক্ষ টাকায় সম্পত্তি কিনিয়া লইবেন; যদি নিলামে সম্পত্তির মূল্য কম হয়, তাহা হইলেও ম্যাক-আর্থার ৩ লক্ষ

টাকার অবশিষ্ট টাকা অ্যাবটকে দিবেন। তাহাই হইল। সম্পত্তি লাটবন্দী হইলে ম্যাক-আর্থার ৮৫ হাজার টাকায় উহা ক্রয় করিলেন এবং অবশিষ্ট টাকা নবাব নাজীমের তহবিল হইতে অ্যাবটকে দিলেন।

আশুতোষ দেবদিগরের বয়ঃসিদ্ধ করিবার পর রাজা অযোধ্যারাম উক্ত ডিক্রী রদ করিবার জন্য নালিশ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্যই ম্যাক-আর্থার সম্পত্তি কিনিয়া নবাবের কর্ম্মচারী সাদক আলী খাঁকে হস্তান্তরিত করিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সাদক আলীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী উহা নবাবকে এবং নবাব আবার উহা তাঁহার ক্রীতক্লীব ভৃত্য সিদ্দী নজর আলীকে দিলেন।

অযোধ্যারাম মোকর্দ্দমার ক্রমে ইঁহাদিগকেও পক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মূল মোকর্দ্দমায় রাজার জয় হইল এবং দেনাপাওনার হিসাবের আদেশ হইল।

তাহার পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যারাম লাটের টাকার জন্য সম্পত্তি বিক্রয় প্রতারণামূলক বলিয়া সে নিলাম নাকচ করিবার প্রার্থনায় নালিশ করিলেন। মেদিনীপুরের জিলা আদালতে পরাজিত হইয়া অযোধ্যা-রাম হাইকোর্টে আপীল করিলেন। অনেক কষ্টে অযোধ্যারাম জয়ী হইলেন। এই মোকর্দ্দমায় প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত যাইয়া শেষে অযোধ্যা-রাম সম্পত্তি পাইবার অধিকারী সাব্যস্ত হয়েন। অ্যাবট, ম্যাক-আর্থার নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা যে প্রতারণায় প্রবৃত্ত হইয়া যোগে কাজ করিয়াছিলেন তাহা প্রতিপন্ন হয়। এই মোকর্দ্দমায় এ দেশের ভূমি-সম্পত্তি-ঘটিত অনেক বিষয়ের নজীর হইয়াছে।

তখন অযোধ্যারাম সম্পত্তির ওয়াসিলাৎ পাইবার জন্য হিসাব দায়ের করিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নজরালীর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করেন। মেদিনী-

পুরের জন্ম ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজার স্বপক্ষে ২১৯৯ হাজার ২ শত ২৫ টাকা ৩ আনা ৯ পাই—টাকায় ডিক্রী দেন। আপীলে ঐ মোকর্দ্দমা পুনর্বিচারের আদেশ হয় এবং পুনর্বিচারে সাব্যস্ত হয় মর্টগেজের দেনা দিয়াও অযোধ্যারাম ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৯ শত ৩৭ টাকা ৭ আনা পাইবেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ইহাই তাঁহার পাওনা স্থির হয়। তখন নজরালীর পক্ষে হাইকোর্টে আপীল রুজু হয়। কিন্তু মোকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাজা অযোধ্যারাম মেদিনীপুর সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রাজা অযোধ্যারাম যখন সাবালক হয়েন, তখন হইতে তিনি নানারূপ মোকর্দ্দমায় প্রবৃত্ত হয়েন। দীর্ঘ ৩০ বৎসরের মধ্যে সে সব মামলার নিবৃত্তি হয় নাই —অযোধ্যারামের ভাগ্যেও শান্তি ছিল না। শেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মামলা শেষ হইলে তিনি অপেক্ষাকৃত স্থির হইবার অবকাশ পাইলেন এবং সম্পত্তির অবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখক বলেন—"বহুকালের পুরাতন রাজ-সংসারে স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন ও মণিমাণিক্য হীরকাদি যথেষ্টই ছিল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মোকর্দ্দমাকালে রাজা অযোধ্যারাম খাঁন এমন দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন যে, এই সকল অমূল্য সম্পত্তি অত্যল্প টাকায় অনেক স্থলেই বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইলেন। কালসহকারে বন্ধকী দ্রব্যাদি খালাস করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অনেক স্থলে বন্ধক-গ্রহিতাগণ বহুমূল্যের রাজসম্পত্তি অত্যল্প টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিলেন; খালাসের সময় অতীত হইয়া গেলে বন্ধক-গ্রহিতাগণ এই সকল বহুমূল্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করিলেন। ঐ সকল লোকের মধ্যে বর্ত্তমান কালে অনেক লোক প্রধান ধনশালী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।"

রত্নাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিক্রীত হইল। কিন্তু ঋণ পরিশোধের উপায় হইল না। তৎপূর্ব্বেই রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ জার্ডিন স্কীনার কোম্পানী নজরালী খাঁ'র নিকট মেদিনীপুর বা ভঞ্জভূম পরগণার জঙ্গলমহল ইজারা লইয়াছিলেন। ইজারা মহলে ১ হাজার ৫ শত ২২ খানি গ্রামে ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৩ বিঘা ৮ কাঠা জমী ছিল—বার্গিক আয় ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৯ শত ৮৮ টাকা ১৫ আনা। এখন জার্ডিন স্কীনার কোম্পানী প্রস্তাব করিলেন, রাজা জমীদারী পাইয়া তাঁহাদিগকে ঐ মহল বার্ষিক ৪৫ হাজার টাকা খাজনায় পত্তনী দিবেন; লিখাপড়া করিলে তাঁহারা অগ্রিম ৯০ হাজার টাকা সেলামী দিবেন। অনন্যোপায় হইয়া রাজা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সেই বন্দোবস্তই করিয়া টাকা লয়েন।

কলিকাতার বাবু ভোলানাথ দত্ত রাজার পক্ষে মোকর্দ্দমার তদ্বির করেন। কথা থাকে, তিনি পুরস্কারস্বরূপ ২০ হাজার টাকা এবং মর্টগেজের দেনা-শোধের পর রাজা লাভের ২ আনা অংশ বা ৩০ হাজার টাকা পাইবেন। কিন্তু শেষে ভোলানাথ বাবু পুরস্কারের মাত্রা প্রায় ৯০ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। রাজা তখন তাহাতেই সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তদনুসারে শেষে স্থির হয়, তিনি পত্তনীদার স্কীনার কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ১১ হাজার ৩৭টাকা পাইবেন, তন্মধ্য হইতে ৩ হাজার ৮ শত ৩৭ টাকা ৮ আনা রাজস্ব প্রদান করিবেন।

মূল মোকর্দ্দমা শেষ হইল বটে. কিন্তু অযোধ্যারামের অদৃষ্টে তখনও শান্তিলাভ ঘটিল না। কারণ, তাঁহার জয় হইল দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ আবার অর্থলোভে নূতন নূতন মামলার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই সকল মোকর্দ্দমার মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুরের

রাজা অজিৎ সিংহের মাতুলপুত্রগণ খোরপোষ বাবদে যে সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, মিষ্টার অ্যাবট সে সম্পত্তিও অধিকার করিয়া তাঁহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সে সম্পত্তি অযোধ্যারামের হস্তগত হওয়ায় তাঁহারা সেই সম্পত্তিলাভের জন্য মামলা রুজু করিলেন। ওদিকে রাজার জ্ঞাতি চুণীলালের পৌত্র—শ্রীমন্তলাল খাঁনের পুত্র রামদয়াল প্রভৃতি এক কৃত্রিম কায়েম ইজারা দলিল দাখিল করিয়া স্কিনার কোম্পানীকে পত্তনি প্রদত্ত মেদিনীপুর পরগণার জঙ্গলমহল পাইবার জন্য নালিশ করিলেন। মুর্শিদাবাদ আজীমগঞ্জের প্রসিদ্ধ কুঠিয়াল ধনপতি সিংহ তাঁহাদিগের মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগাইলেন। উভয় মোকর্দ্দমাতেই মেদিনীপুরের জেলা আদালতে রাজা অযোধ্যারামের জয় হইল। কিন্তু উভয় মোকর্দ্দমাতেই হাইকোর্টে আপিল হইল। শেষে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আপিল শুনানি হইবার পূর্ব্বেই মোকর্দ্দমা দুইটি আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা হয়।

মেদিনীপুর রাজ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া রাজা পৈত্রিক সম্পত্তি নাড়াজোল সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি দিবার সুযোগ পাইলেন। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৮ শে মার্চ্চ তারিখে রাজস্ব বাকী পড়ায় ঐ সম্পত্তি নিলাম হইয়া গিয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—দীর্ঘ ৩৭ বৎসর কাল নানা কষ্ট ভোগ করিয়া অনবরত মোকর্দ্দমা করিয়া রাজা মেদিনীপুর সম্পত্তি উদ্ধার করিলেন বটে,* কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তির অভাবজনিত দুঃখ তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। তিনি বিপদে কখনও ধৈর্য্যহারা হইতেন না—সহিষ্ণুতাসহকারে কার্য্য করিতেন। সেই জন্যই তিনি জীবনে অজস্র বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। নাড়াজোলের সম্পত্তি বর্দ্ধমান রাজসরকারের হস্তগত হইয়াছিল। এত

দিন পরে যে রাজসরকার সে সম্পত্তি ত্যাগ করিবেন, এমন আশার অবকাশ অবশ্যই ছিল না। কিন্তু রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বর্দ্ধমানের মহারাণী নারায়ণকুমারী ৭৫ হাজার ২ শত টাকা লইয়া ঐ সম্পত্তি রাজাকে বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে মহারাণী বিক্রয়কোবালা সহি করিয়া দিলেন। ২৮শে জুন সন্ধ্যাকালে এই সংবাদ রাজার নিকট পৌঁছিল। ইহাতে রাজপরিবারে যে আনন্দের সঞ্চার হইল তাহার স্বরূপ কল্পনা করাও অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য। যে পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধারের কোন আশাই ছিল না, তাহাই এত দিনে হস্তগত হইল। রাজপরিবারে আনন্দের স্রোত বহিল।

রাজা অন্য দিনেরই মত রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শরীর সুস্থই ছিল, কিন্তু প্রভাতে পুরবাসীরা দেখিল, তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত! তিনি দীর্ঘকাল—জন্মাবধি যে প্রতিকূল অবস্থার সহিত প্রাণান্তকর সংগ্রাম করিয়াছিলেন সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াই তিনি পার্থিব সম্পদের মায়া ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। এমন ব্যাপার সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যেমন অসাধারণ প্রতিভা ও সহিষ্ণুতা সহকারে একাগ্র চেষ্টায় নষ্টসম্পত্তির উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, তেমনই নাড়াজোল রাজপরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে দুর্দ্দশার অতলতল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য—নাড়াজোল রাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই বংশদীপ রাজা অযোধ্যারাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মহাজনের জন্ম বংশের পুণ্যেরই পরিচায়ক। ইঁহাদের জন্মে বংশ পবিত্র হয়। ইঁহার পুণ্যপ্রভায় নাড়াজোল রাজবংশ বহুকাল সমুজ্জ্বল থাকিবে।

১২২৮ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫৭ বৎসর বয়সে রাজ্যোদ্ধার সম্পন্ন করিয়া রাজা অযোধ্যারাম সুস্থদেহে ব্যাধিক্লেশ

ভোগ না করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা অনায়াসে বলিতে পারি—

জীবনের সর্ব্বকর্ম্ম করি সমাপন,
দেশহিত, লোকহিত করিয়া সাধিত,
যশের মুকুট শিরে করিয়া ধারণ,
অনন্ত নিদ্রায় শেষে হইলে নিদ্রিত।

আমরা দেখিয়াছি, অযোধ্যারামের জীবন মামলায় অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে জীবনান্ত পর্য্যন্ত বিপদসমুদ্রে সন্তরণ করিয়াছিলন, বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু সৌভাগ্যবলে সে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি অতিক্রম করিয়া নিরাপদে কূলে উপনীত হইয়াছিলেন। বিপদে হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস একদিনের জন্যও বিচলিত হয় নাই। পূজায়, অর্চ্চনায়, ভিক্ষাদানে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে অর্থপ্রদানে, সঙ্গীতচর্চ্চায় তিনি অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তির সকল কার্য্যই স্বয়ং দেখিতেন এবং প্রজাদিগের হিতকর কার্য্য সর্ব্বদাই করিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-কালে তিনি নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না; পরন্তু প্রজারক্ষার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন। মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয় লিখিয়াছেন—"রাজা অযোধ্যা-রাম অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি, উন্নতমনা, দুঃখসহিষ্ণু ও দানশীল ছিলেন। বিনয় ও উদারতা তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক গুণ ছিল। তিনি সকল লোকের সুখসাধন জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। কখনও কাহারও হৃদয়ে ক্লেশ প্রদান করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তিনি চিরজীবন নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং বিশ্বাসপূর্ণহৃদয়ে হিন্দুদেবদেবীর অর্চ্চনা করিতেন। হিন্দুর প্রধান কর্ত্তব্য

দীন, অনাথ, আতুরদিগের দুঃখমোচন, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগকে সাহায্যপ্রদান এবং দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে সেবা করা ইত্যাদি হিন্দুধর্ম্মোচিত কার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে অর্থপ্রদান করিতেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। তিনি জানিতেন, পৃথিবীতে সকলেই এই সকল লোককে অত্যন্ত ঘৃণা করে; কেহই আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হয় না। রাজা এই সকল দুর্ভাগ্য লোকের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বন্দোবস্ত অনুসারে মেদিনীপুর সহরের মধ্যে কতকগুলি কুষ্ঠরোগী সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। তাঁহার স্থাপিত কুষ্ঠাশ্রম 'খাঁনের ওয়ার্ড' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর তত্ত্বাবধানে আছে। তিনি চিরজীবন বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত থাকায় সুযোগ ও সুবিধার অভাবে সঙ্কল্পিত অনেক সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।"

তিনি ইংরাজসরকারের রাজভক্ত প্রজা ছিলেন এবং মেদিনীপুরের রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩১ আইনের ৪ ধারা অনুসারে ছোটলাটের আদেশে ১১টি কামান রাখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তাহার পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধি-ধারণ-উপলক্ষে তিনি মেদিনীপুর উচ্চ স্কুল প্রভৃতি নানা সদনুষ্ঠানে সাহায্য করায় ও স্বীয় সম্পত্তির সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করায় Certificate of Honour পাইয়াছিলেন। সুতরাং রাজা অযোধ্যারামের ভাগ্যে রাজসম্মানলাভেরও অভাব হয় নাই।

অযোধ্যারামের মৃত্যুর ৬ মাস পরে মহাসমারোহে তাঁহার ষাণ্মাষিক,

শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শ্রাদ্ধে ১৬টি রৌপ্যের ষোড়শ অর্থাৎ ১৬ প্রকার তৈজস. বহু পিত্তলের ঘড়া, শাল, বনাত ও রেশমী কাপড় দান উৎসর্গ করা হইয়াছিল। কলিকাতা, নদীয়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বর্দ্ধমান বাঁকুড়া. বালেশ্বর প্রভৃতি নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন ও যথোপযুক্ত বিদায় পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগকে যে ভিক্ষাদান করা হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে অযোধ্যারাম নিরন্তর বিপন্ন হইয়া স্বীয় বুদ্ধি-বলে বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন এবং বিপুল নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন—নাড়াজোল-রাজবংশের সেই দ্বিতীয় বংশ-পতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাতার শ্রাদ্ধে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। সে কার্য্য নাড়াজোল-রাজবংশের উপযুক্ত হইয়াছিল। সে অঞ্চলে সেরূপ সমারোহ ব্যাপার সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

রাজা অযোধ্যারাম খাঁন দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন—জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রলাল, কনিষ্ঠ উপেন্দ্রলাল। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রলাল বর্দ্ধমানের মহারাণী নারায়ণকুমারীর নিকট হইতে নাড়াজোল সম্পত্তি খরিদ করিবার কার্য্যে বর্দ্ধমানে থাকিবার সময় তদীয় পিতার মৃত্যু ঘটে। অযোধ্যারাম কোন উইল করিয়া যান নাই। এই বংশে জ্যেষ্ঠাধি-কার প্রথাই প্রচলিত থাকায় মহেন্দ্রলাল সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইয়া তদনুসারে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েন।

তাঁহার নাবালক অবস্থায় রাজা মোহনলালের অগ্রজের বিধবা এক হেবানামা করিয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ও রামচন্দ্র খাঁনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবলাল খাঁনকে স্বীয় জমীদারী, নিষ্কর সম্পত্তি, দেবোত্তর জমী এবং গোবিন্দজী, লাটুরায়জী, জয়দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবী দান করেন। তখন তাঁহারা উভয়েই নাবালক বলিয়া উভয়েরই মাতা স্ব স্ব পুত্রের পক্ষে

অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সাবালক হইয়া রাজা মহেন্দ্রলাল অপরার্দ্ধের অধিকাংশই ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে নাড়াজোলে মহেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তিনি রাজপরিবারের দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যে পরিবেষ্টিত ধনিসন্তানদিগের পক্ষে সেরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ সচরাচর হয় না। মেদিনীপুরের ইতিহাসলেখক যথার্থই বলিয়াছেন,—"তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে তাঁহার পিতার মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না। মানুষের যতদূর দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ হইতে পারে তৎসমস্তই সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের অর্জ্জিত নাড়াজোল জমীদারী বিক্রয় হইয়া গেল, বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি মেদিনীপুর জমীদারীরও সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল। এই ঘোরতর বিপদকালে আত্মীয়স্বজন যাঁহারা দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আশ্বস্ত করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঘোর বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে বিরোধ ও মোকদ্দমা, চতুর্দ্দিকে শত্রুর বিদ্বেষাচরণ. চতুর্দ্দিকে অর্থাভাবের ভীষণমূর্ত্তি নানাপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মেদিনীপুর ও নাড়াজোলের মধ্যে যে রাজপরিবার এক সময়ে শত সহস্র লোককে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, কত ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে শত শত বিঘা ভূমি প্রদান করিয়াছেন,এই দুঃখের সময়ে—এই বিপদের সময়ে রাজা মহেন্দ্রলাল অল্পবয়স্ক হইলেও পিতার কষ্ট অনুভব করিতে পারিতেন এবং সর্ব্বদা সহানুভূতি দেখাইতেন। তিনি অনেক কার্য্যে পিতার সহিত যোগ দিতেন এবং উভয়ে যুক্তি পরামর্শ করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি অত্যল্প বয়সে অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারিয়াছিলেন কর্ত্তব্য-সাধনের প্রধান উপায় যে চিন্তা ও চিত্তের দৃঢ়তা এইরূপে প্রথম

জীবনেই সেই অভ্যাস ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার অবসর উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে তিনি রাজোচিত অনেকগুণ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।"

কুলপ্রথা অনুসারে গৃহেই তাঁহার বাঙ্গালা শিক্ষা আরব্ধ হয় এবং ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পড়িয়া তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পার্শী শিখিতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর পরে তিনি সংস্কৃত ও পার্শী শিক্ষা ত্যাগ করেন, কিন্তু সাত বৎসর ধরিয়া ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সম্পত্তি-সংক্রান্ত মোকর্দ্দমার জন্য তাঁহাকে অনেক সময় কলিকাতায় ও মেদিনীপুরে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু তিনি পাঠের অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই—সুবিধা পাইলেই পাঠ করিতেন।

তিনি নাবালক অবস্থায় যে সম্পত্তি দান পাইয়াছিলেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কোন আত্মীয়ের প্ররোচনায় বাওয়ালীর ঈশানচন্দ্র মণ্ডল অযোধ্যারামের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এক ডিক্রীতে তাহা ক্রোক করিয়া নিলাম করাইয়াছিলেন। যাহা হউক হেবানামা অকৃত্রিম প্রমাণিত হওয়ায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত নিলাম রদ হইয়া যায়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতসাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে সরকার মহেন্দ্রলাল খাঁনকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট সার রিভার্স টমসন তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সহিত লাটবাহাদুরের সখ্যের ও তাঁহার প্রতি সরকারের শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

"BELVEDERE, 19th February, 1887.

RAJAH,

"It gives me great pleasure to congratulate you on your accession to the title of Rajah which H. E. the Viceroy has been pleased to confer upon you, in recognition of your public spirit and liberality on many occasions, on the auspicious celebration of Her Majesty, the Queen-Empress's Jubilee in India.

I trust you may be spared many years in the enjoyment of an honour which is appropriate to the representation of a family of ancient lineage.

I am
Your sincere friend,
RIVERS THOMPSON.
Lieutenant-Governor of Bengal".

এই পত্রে রাজার লোকহিতৈষণা ও দানশীলতার উল্লেখ করিয়া ছোটলাট বলিয়াছিলেন, তিনি যে প্রাচীন রাজবংশের গদীতে অধিষ্ঠিত তাহাতে এই সম্মান তাঁহারই উপযুক্ত।

এ বৎসর ১৫ই জুলাই তারিখে বাঙ্গালা দপ্তরখানার দরবারে উপাধি-বিতরণ হয়। তখন সার ষ্টুয়ার্ট বেলী বাঙ্গালার ছোটলাট। তিনি রাজা মহেন্দ্রলালকে তরবার, কোমরবন্দ ও মুক্তার মালা খেলাৎ দিয়া উপাধি-দানকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও মোগল বাদশাহ-দিগের সময় হইতে রাজবংশের সম্মানের উল্লেখ ছিল। রাজা যে

তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবেরই মত লোকহিতে অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাও উক্ত হইয়াছিল। রাজা যে নানা বিদ্যালয়ে, পুস্তকাগারে ও হাঁসপাতালে অর্থদান করিয়াছিলেন, নাড়াজোলে বাঁধ রচিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং দুর্ব্বৎসরে প্রজার খাজানা মকুব করিয়াছিলেন, সার ষ্টুয়ার্ট তাহাও বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, এই সব কারণেই সার রিভার্স টমসন তাঁহাকে রাজা উপাধি দিবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

Rajah Mohendro Lall Khan,—I regret that I have not the advantage in your case of the long personal acquaintance which, in the case of some of the recipients of honours at to-day's Durbar, gives me such a close and individual interest in their distinction. None the less do I welcome you here, and none the less do I take pleasure in investing you with the well-earned dignity which the Viceroy has bestowed on you. The representative of a very ancient family in Midnapur which received its honours from the Mogul Government, you have devoted your wealth and influence as your father did before you to the service of your fellow-countrymen. In endowments and donations to schools, libraries, and hospitals, in the construction of the Narajole embankment, and above all, in the remission of rents to your tenantry in bad years, you have set a noble example, and it was a recognition of the many acts of benevolence and public spirit, both of yourself and your

father that Sir Rivers Thomson recommended you for the distinction of Rajah, which in the name of the Viceroy, I have now much pleasure in conferring on you.

সঙ্গীতে ও সাহিত্যে রাজা মহেন্দ্রলালের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি সঙ্গীত-রচনায় অবসর বিনোদন করিতেন। তাঁহার পুস্তক-গুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল—

(১) সঙ্গীত-লহরী (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)।

(২) মান-মিলন (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)। মান-মিলন এক-খানি গীতিনাট্য। এই পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার বিনয়সহকারে লিখিয়াছিলেন—"সাধারণের নিকট আমি যে প্রতিষ্ঠালাভ করিব, এরূপ প্রত্যাশায় এই ক্ষুদ্র গীতিকাখানি প্রণয়ন করি নাই। অবকাশ-কাল বৃথা নষ্ট না করিয়া হরিগুণানুকীর্ত্তন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

(৩) গোবিন্দগীতিকা (১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত)। ইহাতে নানা সময়ে নানা রাগরাগিণীর বহু সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। অনেক গীতের স্বরলিপিও প্রদত্ত হইয়াছে। এই সংগ্রহ রাজা তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট করিয়া উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছিলেন—"পিতঃ! সঙ্গীতশাস্ত্রে আপনার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যত্ন ছিল। প্রতিদিবস সায়ংকালে আপনি সন্ধ্যাবন্দনাদি উপাসনা-কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পুরাণ শ্রবণ ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করতঃ সঙ্গীতালোচনায় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের অধিক ক্ষেপণ করিতেন। আমি ইতিপূর্ব্বে সঙ্গীত-লহরী ও মান-মিলন নামক সঙ্গীতবিষয়ক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়া-ছিলাম, মহাশয় ঐ দুই পুস্তক-দর্শনে যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে তদালোচনায় সময় ক্ষেপণ করিয়া হর্ষিত হইতেন, তদ্দৃষ্টে আমি উৎসাহিত হইয়া আপনাকে উপহার দিবার

জন্য এই ক্ষুদ্র 'গোবিন্দ-গীতিকা' নামক তত্ত্বসঙ্গীতের পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ সে বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মহাশয় কোন পীড়ায় পীড়িত না হইয়া, বিগত ১৫ই আষাঢ় শনিবার যামিনীতে সুষুপ্তের ন্যায় হঠাৎ অত্যল্পক্ষণ মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে একে আমার চিত্ত শোকে ব্যথিত হইয়াছে, তাহাতে আবার আপনার বিশাল রাজ্য-সম্পদের ভার আমার মস্তকে পতিত হওয়ায়, আমি সম্পূর্ণ অবকাশ-বিহীন হইয়াছি। অতএব এই 'গোবিন্দ-গীতিকা'র দোষগুণ-বিচারে কিম্বা উৎকর্ষসাধনে যত্ন করিতে পারিলাম না ; ইহা যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায়ই মহাশয়কে উপহার দিতে বাধ্য হইলাম। আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, সুতরাং প্রিয়তম পুত্রের প্রদত্ত উপহার ভাল কিম্বা মন্দ হউক, তাহা যে মহাশয়ের প্রীতিপ্রদ হইবে তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। তন্নিমিত্ত এই 'গোবিন্দ-গীতিকা' আপনার প্রীত্যর্থে অর্পণ করিলাম।"

(৪) শারদোৎসব (১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত)। ইহাও একখানি গীতিনাট্য। ইহার বিজ্ঞাপনে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"শারদোৎসব প্রকাশিত হইল ; বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যে কিছু সময় অবকাশ পাইয়াছি, তদবসরে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহা সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে কি না, কখন ক্ষণকালের জন্যও সে চিন্তা করি নাই। তবে এইমাত্র ভরসা যে, ত্রিলোকতারিণী বিশ্বজননী মহিষ-মর্দ্দিনী মহামায়ার গুণানুকীর্ত্তন ভারতবাসীর কখন একেবারে অশ্রদ্ধেয় হইবে না ; ইহা ভাল হউক বা মন্দ হউক, অবশ্য কোন সময়ে কাহার না কাহারও কিয়ৎপরিমাণেও যে প্রীতিজনক হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।"

(৫) মথুরা-মিলন (১২৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত)। ইহাও একখানি গীতিনাট্য। বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন—"আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা এক্ষণে যেরূপভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আত্মরস-সংসৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সঙ্কীর্ত্তন যে আধুনিক সভ্যসমাজের কতদূর প্রীতি-প্রদ হইবে তাহা বলিতে পারি না, এবং আমি ক্ষণকালের জন্যও সে চিন্তা করিয়া এই গীতিকা প্রণয়ন করি নাই; কেবল সাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণলীলা সঙ্কীর্ত্তন করাই যখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ইহাতে কেহ তুষ্ট বা রুষ্ট হউন, আমি তাহাতে ক্ষুব্ধ নহি।"

রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন মহাশয়ের এই কয়খানি পুস্তকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার রচিত আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করা সঙ্গত। সেখানি মেদিনীপুররাজ্যের ইতিহাস—ইংরাজীতে রচিত। বর্ত্তমান পুস্তক-রচনাকালে আমরা সেখানি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি এবং সে ঋণ স্বীকার করিবার এই শুভ অবসর ত্যাগ করা কোন মতেই অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না।

রাজা মহেন্দ্রলালের সঙ্গীতানুরাগের ও সঙ্গীতরচনাপটুত্বের কথা আমরা বলিয়াছি। আমাদের স্থানাভাব, তাই আমরা নিম্নে রাজার চারিখানি পুস্তক হইতে চারিটি গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 'গোবিন্দ-গীতিকা'র একটি গীত এইরূপ—

বেহাগ খাড়র—জলদ তেতালা।

জয় শ্যামলসুন্দর বৃন্দাবনেশ্বর,
পীতাম্বরধর পরাৎপর।
জয় শ্রীমধুসূদন বিষ্ণু জনার্দ্দন,
বৈরিবিমর্দ্দন, সুরেশ্বর।

জয় বাঁশরী-বাদক, দুর্জ্জন-শাসক
বিশ্ববিকাশক, বিশ্বম্ভর।
জয় ব্রহ্ম সনাতন, নিত্যনিরঞ্জন,
পঙ্কজ-লোচন, শৈলধর।
জয় কৃষ্ণ কৃপাময়, ভক্তজনাশ্রয়,
দীনে দয়াময়, দামোদর।
জয় দুষ্কৃতি-নাশক, সাধক-তারক,
মোক্ষপ্রদায়ক, মুরহর।

'শারদোৎসবে' উমার নিকট গিরিরাজের কথায় কন্যার অদর্শনে মাতার দশা কেমন ব্যক্ত হইয়াছে—

স্বরট সম্পূর্ণ—একতালা।

আর সুধাও কি মা সমাচার।
তব অদর্শনে, রাণী অনশনে, হয়েছে কঙ্কালসার।
কোথা উমাধন ব'লে অনুক্ষণ
অশ্রুবারি করিতেছে বরিষণ ;
করে না শ্রবণ, প্রবোধবচন, সান্ত্বনা না মানে আর।
পাগলিনী প্রায় ভ্রমিয়ে বেড়ায়,
যার দেখা পায় তাহারে সুধায়,
দেখেছ কি কেহ, আমার উমায়, ব'লে করে হাহাকার।
চল মা তারা, ত্বরা দেখ্‌বি গে নয়নে,
যে দশা রাণীর ঘটেছে এক্ষণে,
বাঁচ্‌বে যে এমন নাহি লয় মনে, মূর্চ্ছা যায় বারম্বার।

ছন্দের ও মিলের উপর অসাধারণ আধিপত্যে ও ভাবসরলতায় এই গানটি বারম্বারই দাশরথির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাস্তবিক এই গান ও রাজার আরও দুই চারিটি গান সহসা দাশরথির বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

'মথুরা-মিলনে' বৃন্দার বৃন্দাবন-সমাচারও বাঙ্গালীকে সেই "দেখে এলাম শ্যাম" নামক পরিচিত গান স্মরণ করাইয়া দিবে—

খট্ সম্পূর্ণ - যৎ।

আর সুধাও কি হে সমাচার।
হরি তোমা বিনে, তব বৃন্দাবনে, দিবসযামিনী
শুনি হাহাকার।
গোপগোপীকুল, সবে শোকাকুল,
পশুপক্ষিকুল, হয়েছে ব্যাকুল,
গোষ্ঠে বিচরণে, যায় না গোকুল, শোকে বিলুণ্ঠিত
সবে শবাকার।
স্পন্দ রহিত নন্দ উপানন্দ
রাণী যশোমতী কেঁদে কেঁদে অন্ধ,
শ্রীদাম সুদাম আদি নিরানন্দ, কেহ কার তত্ত্ব
নাহি লয় আর।
রাধার দুর্গতি কি কহিব হায়,
সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পতিত ধরায়,
দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে কায়, হয়েছে ধনীর
প্রাণে বাঁচা ভার।

দাসীদের দশা দেখ হে সাক্ষাতে,
বেঁচেমাত্র সবে আছি হে প্রাণেতে,
এসেছি কেবল তোমারে দেখিতে, তব ব্যবহারে
করি নমস্কার।

অনুপ্রাসের ছটায়, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের দংশনে, বর্ণনার স্বাভাবানুকারিতায়, করুণরসের অবতারণায় এরূপ কবিতা বাঙ্গালায় অধিক নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

'মানমিলনে' সখিসকলের উক্তিও এমনই মধুর—

যাইবে একান্ত যদি যাও বাজাইয়ে বাঁশী ;
শ্রবণে যা,' বনমালী, মোরা বড় ভালবাসি।
যে রন্ধ্রের ধ্বনি শুনি,
রাধা হয় উন্মাদিনী
তাই হে বাজাও শুনি, আছি চির অভিলাষী।

এরূপ গান রাজা মহেন্দ্রলালের পুস্তকগুলিতে অনেক আছে। কিন্তু উদ্ধৃত কয়টি গান হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, গীত-রচনায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। তাঁহার গীতের ভাষা ভাবপ্রকাশের উপযোগী—ভাব সরস—সুরগুলি সুনির্ব্বাচিত। সরলতা যে সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রধান গুণ তাহা আমরা আজকাল ভুলিয়া যাইতেছি—তাই আমাদের বর্ত্তমান অনেক লেখকের গান ভাবজটিলতায় ও ভাষার দোষে হৃদয়স্পর্শী হয় না। রাজা মহেন্দ্রলালের গানে সে দোষ স্পর্শে নাই। তাঁহার গান শুনিলেই মুগ্ধ হইতে হয়। বিশেষ তাঁহার গানগুলির সুরও আমাদের দেশের—তাহাতে বিদেশীগন্ধ নাই। পূর্ব্বে এ দেশে ধনীরা সঙ্গীতজ্ঞদিগের আদর করিতেন

রাজা নরেন্দ্রলাল খান

বলিয়াই—গুণীর গুণের আদর করিতেন বলিয়াই এ দেশে সঙ্গীতের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। এখন সে অবস্থা, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। এখন আমাদের দেশের ধনীদিগের বৈঠকখানায় আর দেশবিদেশাগত সঙ্গীতজ্ঞদিগের মুজরা হয় না। ধনীরা য়ুরোপীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে যে সঙ্গীত শুনিয়া পরিতৃপ্তিলাভ করেন, তাহার স্বর কোনরূপেই প্রশংসিত হইতে পারে না—বরং সেরূপ স্বরের আদরেই আমাদের দেশের সঙ্গীতের অবনতি হয়। হিন্দুরা বিজ্ঞানরূপে সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছিলেন—তাঁহারা দিবারাত্রির সময় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে সব স্বরের মাত্রাভাগ এরূপ সূক্ষ্ম যে হারমোনিয়মের বা পিয়ানোর সঙ্গে সে সব স্বরের আলাপ সম্ভব নহে। সম্ভব নহে বলিয়াই আজকাল আমরা সেই সব বিদেশী যন্ত্রের সঙ্গে আলাপের উপযোগী স্বর গানে বসাইয়া সঙ্গীতের অবনতিপথ প্রশস্ত করিয়া থাকি। হিন্দু-সঙ্গীতে পারদর্শিতালাভ সময় ও সাধনাসাপেক্ষ। রাজা মহেন্দ্রলাল সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ শুক্রবার রাত্রি ২টার সময় কলিকাতায় রাজা মহেন্দ্রলালের দেহান্ত হয়।

রাজা মহেন্দ্রলাল খানের পরলোকগমনকালে মেদিনীপুর ও নাড়াজোল রাজের জমীদারী তাঁহার বংশের করতলগত হইয়াছে। তখন দীর্ঘকালব্যাপী মামলা মোকদ্দমার অবসান হইয়া গিয়াছে এবং বিস্তৃত জমীদারী কার্য্যকুশল জমীদারের শাসনে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১২৭৪ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন তারিখে মহেন্দ্রলালের পুত্র নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জন্মের ত্রয়োদশ দিবস পূর্ব্বে নজীর আলি প্রভৃতির সহিত রাজা অযোধ্যারামের মামলায় হাইকোর্টে রাজপরিবারের জয়লাভ

হয়; অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যে বিপদের মেঘে রাজপরিবারের দীপ্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল সেই জলদজাল অন্তর্হিত হইয়া পুরাতন রাজপরিবারের দীপ্তি আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার জন্ম পরিবারের শুভ সূচনাই করিয়াছিল।

পূর্ব্বপুরুষদিগের দুঃখকষ্টের কথা নরেন্দ্রলাল কেবল শুনিয়াছিলেন—তাঁহাকে কোনরূপ দুঃখ-কষ্টই ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি সম্পদের মধ্যে লালিত পালিত—সুখের সংসারের সম্বল। এরূপ অবস্থায় অনেক ধনীর পুত্রের শিক্ষা আশানুরূপ হয় না। কিন্তু মহেন্দ্রলাল পুত্রের শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই মহেন্দ্রলালকে বিষয়কার্য্যে পিতার সহায়তা করিতে হইয়াছিল। তথাপি বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে তিনি সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরাজী—তিন ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং অনুশীলন-ফলে স্বীয় স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির স্ফুরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন—গৃহে শিক্ষক রাখিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষিত করেন।

পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রলাল নাড়াজোলের রাজগদীতে অভিষিক্ত হয়েন। কিছুদিন পরে সরকার তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর দরবারে তাঁহাকে খেলাত দিবার সময় বাঙ্গালার তৎকালীন ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট বলিয়াছিলেন,—Raja Norendro Lall Khan,—Your family has been long held and highly respected in the Midnapore District, and been known by the title of Rajah, and it is in recognition of that fact, as well as of your own personal merits, that the title has been bestowed upon you by His

Excellency the Viceroy and Government of India. You have distinguished yourself by your liberality in assisting diverse public objects. You have assisted the Dufferin Fund to which you have given a large subscription. I have reason to believe that you will continue in the manner in which you have begun your life, and may go on doing acts which would confer upon you more distinguished honours, by acting as an honourable and public-spirited landlord and a leader of your fellowmen in the Midnapore District and in the Province of Bengal.

অর্থাৎ—রাজা নরেন্দ্রলাল খান, আপনি যে বংশোদ্ভব সেই বংশ বহুকালাবধি মেদিনীপুর জিলায় সম্মানিত ও রাজা বলিয়া পরিচিত। সেইজন্য এবং আপনার ব্যক্তিগত গুণের জন্য বড়লাট ও ভারত সরকার আপনাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। আপনি নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। আপনি ডাফরিন ফণ্ডে প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি যেভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন সেই ভাব অব্যাহত রাখিবেন। এবং আপনার কার্য্যফলে আপনি উত্তরোত্তর উচ্চতর সম্মানলাভ করিবেন। আপনি জনহিতকামী ভূস্বামীরূপে মেদিনীপুরের ও বাঙ্গালার জননায়ক বলিয়া পরিগণিত।

সার চার্লস ইলিয়টের এই ভবিষ্যৎবাণী ফলিয়াছে। রাজা নরেন্দ্রলাল নানা সৎকার্য্যে অবাধে ও মুক্তহস্তে অর্থ দান করিয়া কেবল মেদিনীপুরবাসীর নহেন, পরন্তু সমগ্র বঙ্গের অধিবাসিগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

তিনি তদীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ কোন সদনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করেন। এরূপ পিতৃভক্তির পরিচয় এ দেশে দুর্লভ। তিনি কেবল যে সত্য সত্যই মনে করিয়াছেন,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এমন নহে; পরন্তু এ কথাও মনে করিয়াছেন যে, দুঃখী বিপন্নের সাহায্যেই প্রকৃতপক্ষে পরলোকগত প্রিয়জনের পরিতৃপ্তি সাধিত হয়।

সম্প্রতি রাজা নরেন্দ্রলাল খান মেদিনীপুরে জলের কল স্থাপনের জন্য প্রভূত অর্থদান করিয়াছেন।

কিন্তু রাজা নরেন্দ্রলালের দান যশের জন্য নহে বলিয়া তাঁহার অধিকাংশ দানের কথাই দেশের লোক জানিতে পায় না। তিনি গোপনে দান করেন—প্রকৃত সাত্বিক দানেই তাঁহার আনন্দ।

সংস্কৃত সাহিত্যে রাজা নরেন্দ্রলালের বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুর ঘাটাল-নিমতলায় যে সংস্কৃত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় তিনিই তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহার্থ অকাতরে অর্থদান করিতেন। সমিতির ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য্যবিবরণে লিখিত হইয়াছিল—"এক্ষণে সমিতির প্রধান সহায় স্বদেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, স্বধর্ম্মপরায়ণ নাড়াজোলের রাজা শ্রীযুত নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর। তাঁহারই প্রভূত অর্থদানে সমিতির বিশেষ পুষ্টিসাধন হইতেছে। আমরা কায়মনোবাক্যে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে, রাজাবাহাদুর নবকুমারের সহিত তাঁহার পিতৃপুরুষগণের ন্যায় যশোলাভ ও সমিতির সাহায্যপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও ছাত্রগণের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবন লাভ করুন। রাজা বাহাদুর এই সমিতির ধন্যবাদের পাত্র।"

রাজা নরেন্দ্রলাল "রাজা" উপাধি পাইলে এই সমিতির প্রধান পরিচালক পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে ঘাটাল-নিমতলায় একটি সভাধিবেশন হয়। তাহাতে সমবেত পণ্ডিতগণ রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুরকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন—

শ্রীশ্রীসরস্বতী

জয়তি।

অভিনন্দনপত্রম্

স্বস্তি সকলকুশলকলাকলাপকমনীয় কলেবর বরদাবর বিজ্ৃম্ভিত বিবিধ বিদ্যাবিনীত বিবুধসাৎকৃতবহুবিত্ত বদান্যবর শিষ্টশান্তস্বভাব রাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর মহোদয় শ্রীকরকমলেষু সমর্পিতমিদমস্তু।

রাজন্,

সম্প্রতি তত্রভবতা ভবতা সম্রাট্‌সমীপতঃ সম্মানভূমিঃ সমাসাদিতো রাজোপাধিঃ শ্রুতএব—

চকোরাণাং চন্দ্রঃ কুসুমসময়ঃ কাননভুবাং
সরোজানাং ভানুঃ কুবলয়কদম্বং মধুলিহাম্।
ময়ূরাণাং মেঘঃ প্রথয়তি যথা চেতসি সুখং
তথাস্মাকং রাজন্ জনয়তি পরাং প্রীতিমতুলাম্।

যুজ্যতে চৈতৎ, যতঃ

লক্ষ্মীশ্চেন্ন সরস্বতী তমুভয়ং যদ্যস্তি নোদারতা
সা চৈতত্ত্রিতয়ং ভবেচ্চ কুহচিৎ পুণ্যৈরগণ্যৈরপি।
সৌজন্যং ন বিজৃম্ভতে তদপি চেন্মান্যেব কৎস্থা মতি-
স্তৎ সর্ব্বং পরমেশ্বরস্য কৃপা ত্বয্যেব সম্ভাব্যতে॥

অপিচ।

বংশমর্য্যাদয়া বা বিপুলসম্পদধিকারসৌভাগ্যলক্ষ্যা বা দয়াদাক্ষিণ্য-সৌজন্যগুণসম্পদা বা স্বচ্ছবারিবিতরণযন্ত্রনির্ম্মাণব্যয়াদিষমুক্তহস্ততয়া বা বিদ্যাবর্দ্ধনার্থমনেকার্থদানগৌরবেণ বা এবম্বিধসাধারণোপকারকবহুল-সৎকর্ম্মপরম্পরয়া বা সর্ব্বথৈব রাজোপাধিযোগ্যং তত্রভবন্তং ভবন্তং তদুপাধিদানেনালঙ্কুর্ব্বন্তো রাজপুরুষা যোগ্যকারিণএবেতি মন্যামহে।

তদদ্য বযমানন্দসন্দোহোচ্ছলনার্দ্রীকৃতহৃদয়া আন্তরং ভাবমাবেদয়ন্ত-এব সমবেতাঃ সংস্কৃতসমিতিসভ্যাঃ প্রধানরাজপুরুষান্ ধন্যবাদেন সভাজয়ন্তঃ পরতন্ত্রপশ্লোকয়ন্তশ্চ মঙ্গলমাগাস্মহে। যেন পুরুষায়ুষজীবিনঃ স্বাস্থ্যসুখমুপভুঞ্জানা নিরাপদশ্চ সহৈব পরিবারবর্গৈঃ সুখসচ্ছন্দজনিতমা নন্দমনুভবন্তু ভবন্তঃ।

রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু জীব শরদাং পূর্ণং শতং সান্বয়ো
রুণ্ডৈনৈবাস্তু তবান্তিকে প্রতিদিশং কীর্ত্তীন্দুরদ্যোততাম্।
শিষ্টান্ পাহি বুধান্ সভাজয় ধনৈঃ সম্বর্দ্ধয়ন্বার্থিন-
শ্চিত্তং নাথ তবাস্তু ধর্ম্ম্যনদহুষ্টাসপ্রসঙ্গে সদা

কমলভৃতদয়া বদনাম্বুজে
বসতু তে কমলা করপল্লবে।
বষি তে রমতাং কমলাঙ্গজঃ
প্রতিদিনং হৃদয়ে কমলাপতিঃ॥
গ্রহাঃ সর্ব্বে দিশঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
ইষ্টসিদ্ধৌ প্রসীদন্তু সদৈতন্নবভূপতো॥

ঘাটাল-নিমতলা- সংস্কৃতসমিতি। শকাব্দাঃ ১৮১৭।	সভ্যগণরহিত সহকারিসভাপতিঃ।

রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁন বাহাদুর প্রকৃত "স্বদেশী"। আজকাল স্বদেশী বলিলে যে নামে মাত্র স্বদেশী—রাজনীতির আন্দোলনকারী বুঝায় তিনি তাহা নহেন। পরন্তু তিনি আচারে, ব্যবহারে, বিনয়ে, বিদ্যায়, আদর্শে স্বদেশী। হিন্দুসমাজের যে আদর্শ অক্ষয়কবচের মত সহস্র সহস্র বৎসর এদেশের সমাজকে রক্ষা করিয়াছে, যে আদর্শ বিদেশীর বিজয়বাত্যায় ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্লাবন-প্রবাহে ক্ষুণ্ণ হয় নাই; যে আদর্শ মুসলমানের ও ইংরাজের দেশ-জয় এবং বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচারপ্রাবল্য সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করিয়া প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপ রক্ষা করিয়াছে এবং যাহার শিল্প ও সাহিত্য আজও সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছে—তিনি সেই আদর্শের অনুরাগী। তিনি স্বদেশী-ভাবের ভাবুক।

রাজা বাহাদুরের এইভাবও একদিন রাজকর্ম্মচারীরা ভুল বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তিনি যখন সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী, যখন

তিনি স্বদেশী আদর্শের অনুরাগী, স্বদেশী ভাবের ভাবুক—বেশভূষায় স্বদেশী শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, স্বদেশী সাহিত্যের রসে রসিক, তখন হয়ত তিনি বাঙ্গালার বয়কটসংযুক্ত রাজনীতিক আন্দোলনেরও পক্ষপাতী। রাজকর্ম্মচারীদিগের এই সন্দেহের বীজ পুলিসের কল্পনায় অঙ্কুরিত হইয়া বিষম বিষবৃক্ষের উৎপত্তিসূচনা করিয়াছিল। তাই মেদিনীপুরে একটা বিরাট মামলায় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনকেও জড়ান হয়। যুধিষ্ঠিরের মত তাঁহাকেও হাজতবাসের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সুখের বিষয়, উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা-সন্দেহের কুজ্ঝটিকা মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের তাপে বিলীন হইয়া যায়—রাজা মহোদয় সর্ব্বতোভাবে অবৈধ অনাচার-সংস্রবহীন প্রতিপন্ন হয়েন।

আমরা বলিয়াছি, তিনি আচারে, ব্যবহারে, বিনয়ে, বিদ্যায় স্বদেশী আদর্শের অনুরক্ত ও ভক্ত। তিনি পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মনিষ্ঠা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছেন। তাঁহার গৃহে দেবসেবার ও অতিথিসেবার—দরিদ্র-নারায়ণের সেবার সুব্যবস্থা সর্ব্বজনবিদিত। দেশের সকল কল্যাণকর কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতির ও সাহায্যের কথাও সকলে অবগত আছেন। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়া থাকেন ও সর্ব্বতোভাবে তাহাদের মঙ্গল-বিধানের চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার আদর্শ বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হইলে ভাল হয়। আজকাল অনেক জমিদার কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ম্যালেরিয়ার জন্য পল্লী-গ্রাম বাসের অযোগ্য, পল্লীগ্রামে বালকদিগের শিক্ষার ও রোগে চিকিৎ-সার সুব্যবস্থা নাই। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যায়েন যে, যাঁহারা গ্রামের চূড়া তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিলে গ্রামের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। তাঁহারা দেশে থাকিলে গ্রামে জলনিকাশের ও জলসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, চিকিৎসক থাকেন। তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ

করাতেই গ্রামের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি হয়। রাজা নরেন্দ্রলাল সে কথা বিশেষ বুঝেন। তিনি গ্রামে থাকিয়া গ্রামের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেবল স্বগ্রামে নহে, পরন্তু আপনার জমিদারীর সর্ব্বত্রই তাঁহার লোকহিতসাধনের চেষ্টা সপ্রকাশ। এ বিষয়ে বাঙ্গালার ছোটলাটের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। তাঁহাকে উপাধিদানকালে সার চার্লস ইলিয়ট বলিয়াছিলেন, "আপনি নানাজনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। * * আমার বিশ্বাস, আপনি যে ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন সেই ভাব অব্যাহত রাখিবেন।" তিনি যেভাবে জীবনযাত্রা আরব্ধ করিয়াছিলেন সে ভাব যে, কেবল অব্যাহত রাখিয়াছেন এমনই নহে, পরন্তু উত্তরোত্তর তাহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তিনি বহুশাখ বৃহৎ ন্যগ্রোধের ন্যায় অবাধে ছায়া ও আশ্রয় দিয়া আপনার প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি এদেশের জমিদারদিগের প্রাচীন পূত আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি প্রজাদিগের পক্ষে সর্ব্বদাই অধিগম্য। তাহারা তাঁহার কাছে আসিয়া আপনাদের অভাব অভি-যোগের সকল কথা তাঁহার গোচর করিতে পারে। তিনিও প্রজার সকল অভাবের প্রতীকার করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক। ইহাতে একপক্ষে স্নেহে ও অপর পক্ষে শ্রদ্ধায় জমীদার-প্রজার সম্বন্ধ অতিমিষ্ট ও মধুর হয়। জমিদারীর কাজ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষাসাপেক্ষ বলিয়া রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার দেবেন্দ্রলাল খানকে আপনার উপদেশে জমিদারীর কাজে পটু করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিবেচনাও অসাধারণ বলিতে হয়। রাজা সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বিজয়কৃষ্ণ খাঁন তিনি আই-এ পড়িতেছেন।

রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন তাঁহার জমিদারীকে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ

জনহিতকর অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহা কেন্দ্রেই ব্যয়িত হয় নাই, পরন্তু তাহার পরিধি সমগ্র বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে।

রাজা নরেন্দ্রলাল যে স্বদেশী তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি স্বদেশীশিল্পের অনুরাগী। স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠাতেও তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ আছে। অনেকে এ বিষয়ে তাঁহার কার্য্যের পরিচয় পায়েন নাই সত্য, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সে ভাবের পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহারা শিল্পব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের দারিদ্র্যসমস্যার সমাধানে তাঁহার আন্তরিক প্রযত্নে মুগ্ধ হইয়াছেন। বঙ্গদেশে কিছুদিন পূর্ব্বে একটি কাচের কলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কলিকাতার কয়জন ধনী যৌথকারবার করিয়া কলিকাতার নিকট একটী কারখানা স্থাপিত করিয়াছিলেন, কারখানার কাজের জন্য বিদেশ হইতে কারীগর আনান হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে কারবার চলে নাই। তাহার পর দীর্ঘকাল সে কারখানা পড়িয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের খুব সুযোগেও কেহ সেই কারখানাটির সদ্ব্যবহার করিয়া দেশে একটি শিল্পের পত্তন করিতে পারেন নাই। কলিকাতার জনৈক ধনকুবের সেইটি কিনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা নরেন্দ্রলাল সেইটি কিনিয়া তাহাতে কারবার পত্তন করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারেও তাঁহার অনুরাগ আছে। কিন্তু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা নরেন্দ্রলাল সংস্কারের নামে সংহারের বিরোধী। তিনি দেশাচার-শাস্ত্রকে সংস্কৃত করিতে চাহেন ; শৃঙ্খলার স্থানে বিশৃঙ্খলা আনিয়া সমাজে বিপ্লব উপস্থিত করিবার বিরোধী। রাজা বাহাদুর "প্রজাপতি সমিতি"র অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই সমিতি যে সমাজের সর্ব্বনাশকারী পণ-প্রথার বিলোপ চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টার সহিত রাজা সাহেবের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি সমাজে কালোচিত আবশ্যক সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

তাঁহার বিদ্যানুরাগ প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পিতা মহেন্দ্রলালের সদ্গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন এবং সেই অনুরাগ-বহ্নি উৎসাহের ইন্ধনযোগে উচ্চতর করিয়াছেন। বিস্তৃত জমীদারীর যত কাজ তিনি স্বয়ং দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারই মধ্যে বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে তিনি জ্ঞানালোচনা করিয়া আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডারে নব নব রত্নসমূহ সঞ্চিত করেন। তিনি স্বয়ং বিদ্যানুরাগী বলিয়া দেশের সর্ব্বত্র জ্ঞানীর ও বিদ্বানের সমাদর করিয়া থাকেন। দেশে বিদ্যাবিস্তার-বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ আছে।

তাঁহার কলানুরাগ স্থাপত্যে ও সঙ্গীতে বিশেষভাবে সপ্রকাশ। যাঁহারা তাহার গোপপ্রসাদ দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহার স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য্যসাধন-কল্পনা সর্ব্বতোভাবে রাজা নরেন্দ্রলালেরই কলাজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি সঙ্গীতানুরাগী। বিশেষ এ দেশের যে সঙ্গীত বিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছে সেই সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ।

এদেশে শিল্পব্যবসার প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষির উন্নতিসাধন বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে শিল্পবাণিজ্যের মধ্যে কোনটির প্রতিষ্ঠা হউক না—দেশ এখন বহুকাল কৃষিপ্রধান থাকিবে। মিষ্টার ম্যাকেনা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ভারতে কৃষি-পণ্যের বার্ষিক মূল্য প্রায় ১৫০০ কোটী টাকা, এদেশের প্রায় ২০ কোটী লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করে। এদেশের অনেক স্থানেই লোক কেবল কৃষির—বর্ষার বা শস্যের বা পশুর কথাই আলোচনা করে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। এ দেশে নূতন নূতন শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলেও তাহার জন্য মূলধন কৃষির লাভ হইতে যোগাইতে হইবে। আমেরিকা যেমন কৃষির লাভ লইয়াই শিল্প-

বাণিজ্যের পত্তন করিয়াছিল, ভারতে তেমনই কৃষির লাভ লইয়াই শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সুতরাং কৃষির উন্নতিসাধন আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সে কথা বুঝিয়া রাজা সাহেব কৃষির উন্নতিসাধনে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। য়ুরোপে ও মার্কিণে, বিশেষ মার্কিণে—বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-কার্য্যে জনসাধারণের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে স্থানে এক প্রকারের শস্য অধিক উৎপন্ন হয় সেই স্থানে যদি একটা জমী সে শস্যের উপযোগী না হয়, তবে তাহাতে আবশ্যক উপাদানের বা জীবাণুর টীকা দিয়া তাহা সেই শস্যোৎপাদনের উপযোগী করা হয়। তাহাই করিয়া শস্য লইয়া এমন বীজ উৎপন্ন করা হইয়াছে যে, তাহা অনাবৃষ্টিতে, তুষারপাতে বা রৌদ্রে নষ্ট হয় না। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির যে উন্নতিসাধন প্রয়োজন তাহা হয় নাই। আজকাল রাজকর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে জমিদারদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার জেমস মেষ্টন (এক্ষণে লর্ড মেষ্টন) জমীদারদিগকে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতে ও বীজের গোলা খুলিতে উপদেশ দিয়াছেন। লর্ড কার্ম্মাইকেল রঙ্গপুরে ও লর্ড চেমসফোর্ড কলিকাতায় জমীদার সভাকে সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সরকার জমীদারদিগকে এই সদুপদেশ দিবার বহু পূর্ব্বেই রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন কৃষির উন্নতিসাধনোপায়-নির্দ্ধারণে মনোনিবেশ করিয়া-ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রাসাদের বিস্তৃত জমীতে আপনার তত্ত্বাবধানে বিবিধপ্রকারে চাষের ফল পরীক্ষা করেন। এ বিষয়ে বঙ্গ-দেশের অতি অল্পসংখ্যক জমীদারই তাঁহার মত আপনাদের কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং প্রজার কল্যাণ-সাধনই আপনাদের জীবনের ব্রত করিয়াছেন।

একান্ত দুঃখের বিষয়, মোকর্দ্দমায় এ দেশের অনেক জমীদারের বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হয়। তাঁহারা বুঝেন না যে, মামলায় জমীদার ও প্রজা উভয়েরই ক্ষতি ব্যতীত লাভ হয় না। রাজা নরেন্দ্রলাল মোক-দ্দমা এড়াইতে পারিলে কখন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। প্রজাদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এমনই যে, তাঁহার সম্পত্তির তুলনায় তাঁহার মোকর্দ্দমার সংখ্যা অতি অল্প। এ বিষয়ে তাঁহার আদর্শ বঙ্গের অন্যান্য জমীদারদিগের অনুকরণযোগ্য।

রাজা সাহেব সদাচারী ও বিশেষভাবে বিনয়ী। রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁন বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার পরিচয় অল্পদিন পূর্ব্বে 'প্রজাপতি সমিতি' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনাসভায় পাওয়া গিয়াছিল। সে সভায় সুসঙ্গের মহারাজা প্রমুখ বহু জমীদার, বহু সাহিত্যিক, বহু সংবাদপত্রসেবক, বহু ব্যবহারাজীব, বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া রাজা সাহেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ও প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক

সকলেই জানেন, কলিকাতা চোরবাগানের মল্লিকবংশ বিশেষ ধার্ম্মিক বংশ। দানে ও স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে এই বংশের সকলেই সমসাময়িক জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বংশ বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। এই প্রতিষ্ঠা কেবল ধনবলে নহে, ধর্ম্মবলই এই প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। নানাদিকে, নানা ব্যাপারে এই বংশীয় মহাত্মগণের কীর্ত্তিমালা বিরাজিত। সকলেই অবগত আছেন যে, হিন্দু-সমাজের এই ঘোর-দুর্দ্দিনে, বঙ্গীয় সমাজের এই বিষম উপপ্লব সময়ে, আচারে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুবর্ণ বণিক জাতি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই জাতি সমাজের যত উপকার করিয়াছে, সমাজের হিতকামনায় যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহারা যে উন্নত মৌলিক জাতির বংশধর তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ফল দেখিয়াই গাছের ভাল মন্দ বিচার করিতে হয়। বংশধর দেখিয়াই বংশের আভিজাত্য নির্ণয় করিতে হয়। অকারণে বিবিধ সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও যে সুবর্ণ বণিক জাতি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ও জনহিতৈষণায় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের আভিজাত্যসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আবর্জ্জনার মধ্যে পতিত হীরকখণ্ড ঔজ্জ্বল্যের বিশেষত্বে আপনার আভিজাত্যের পরিচয় প্রদান করে।

বণিক জাতে বৈশ্য, সুতরাং দ্বিজাতি। রাজনির্ঘণ্টে বণিক ও বৈশ্য একার্থবোধক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বণিগ্‌ভাব অর্থে বাণিজ্য।

এই বাণিজ্যই বৈশ্যদিগের বিশেষ বৃত্তি। বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, পণ্যাজীব, আপণিক, বার্ত্তিক প্রভৃতি শব্দ বণিক ও বৈশ্য উভয়কেই বুঝায়। সুতরাং বণিক জাতি বৈশ্যজাতি। সুবর্ণ বণিক জাতি এই বণিক জাতিরই অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দু-সমাজে বর্ণ-বিভাগকালে চারিবর্ণই ছিল, তন্মধ্যে বৈশ্য তৃতীয় বর্ণ। বেদে কথিত আছে, এক প্রজাপতি হইতে এই চারিবর্ণ উদ্ভূত হইয়াছে ; তন্মধ্যে বৈশ্য প্রজাপতির উরু হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাঁহাদের নাম উরব্য ও উরুজ। কেহ কেহ বলেন, এই বৈদিক উক্তি রূপকভাবে বর্ণিত। প্রজাপতি বিরাট বিশাল আর্য্যসমাজ, এই সমাজের যাঁহারা মুখ, মস্তক বা চিন্তাশক্তি স্বরূপ, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; যাঁহারা ভুজবল, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ; যাঁহারা সমাজের উরুযুগলস্বরূপ, অর্থাৎ সমাজ-সৌধের স্তম্ভ-স্বরূপ, তাঁহারা বৈশ্য হইয়াছেন। অথর্ব্ব বেদে উরুস্থানে "মধ্য" আছে. (মধ্য তদস্য যদ্বৈশ্যঃ) আবার কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে,— বৈশ্যগণ প্রজাপতির অন্নাধার হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহারাই সমাজের পোষণীশক্তি। দেহের মধ্যে যেমন পাকযন্ত্র, সমাজ-দেহে তেমনই বৈশ্যজাতি, অর্থাৎ সমাজ মধ্যে যাঁহারা ধনোৎপত্তি ও অন্নের সংস্থান করিতেন, তাঁহারাই বৈশ্যজাতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এই ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত একথা বলা যায় না। কারণ, মহাভারতে ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে লিখিত আছে, ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগু বলিয়াছিলেন—

ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্মদ্বারা বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

গোভ্যঃ বত্তিংসমস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতা।

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ কৃষি ও পশুপালন অবলম্বন করিল, তাহারাই বৈশ্য হইল। পরে আবার বলিয়াছেন—

বিশত্যাস্তু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

যাঁহারা শুচি এবং বেদাধ্যয়নরত থাকিয়াও কৃষি এবং বাণিজ্য অবলম্বন করিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণই বৈশ্যনামে অভিহিত হইলেন।

মহাভারতীয় ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে, নহুষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে, অনুশাসন পর্ব্বে হরগৌরী-সংবাদে জানিতে পারা যায় যে, একবর্ণ হইতেই চারি-বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে এবং মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বে জম্বুখণ্ড বিনির্ম্মাণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিকথা লিখিত হইয়াছে। এই সকল উক্তির সহিত বেদবাক্যের সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বিরাট পুরুষ বা প্রজাপতি আর্য্যসমাজ, তাহা হইতে চারিবর্ণ উদ্ভূত হইয়াছে ইহাই উক্ত বৈদিক উক্তির গূঢ় মর্ম্ম।

ঋগ্বেদ সংহিতায় অনেক মন্ত্রেই বিশ্ বা বৈশ্য শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। উহা আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আদিকালে আর্য্য-সমাজের জনসাধারণ বৈশ্যধর্ম্মী ছিলেন।

বৈশ্যের ধর্ম্ম তিনটি—অধ্যয়ন, যজন, এবং দান। বৈশ্য বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, যাগযজ্ঞ ও পূজার্চ্চনা করিবেন এবং দরিদ্রদিগকে ধনদান করিবেন।

বৈশ্যমাত্রই এই ধর্ম্মপালন করিয়া থাকেন। সুবর্ণ বণিকদিগের

মধ্যেও অধ্যয়ন, ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও দান—এই ত্রিবিধ সৎকার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

বৈশ্যদিগের জীবিকা চারিটি ;—কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য ও কুশীদ। যথা—

কুশীদ কৃষিবাণিজ্যং পাশুপাল্য বিশঃ স্মৃতম্।

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

ঋগ্বেদাদিতে যে জনসাধারণ বিশ বা বৈশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহার কারণ, আর্য্যগণের আদি বৃত্তি ছিল কৃষি ও পশুপালন। সার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার Indian Empire নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বৈশ্যগণই তাঁহাদের প্রাচীন বৈশ্য নাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। বিশ ধাতু হইতে ঐ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বৈদিক সময়ে উহা সমস্ত আর্য্যজাতিকেই বুঝাইত। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ-পাঠে জানা যায় যে, ভারতীয় আর্য্যগণ যাযাবরভাবে জীবন যাপন করিতেন। পশুপালনই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। সেই পশুচারণ জন্য তাঁহারা পশুচর ভূমির সন্ধানে নানা-স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। মনু বলিয়াছেন,—

"প্রজাপতি র্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদে পশূন্।"

প্রজাপতি পশু সৃষ্ট করিয়া তাহার পালনভার বৈশ্যের হস্তে অর্পণ করেন। ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, আর্য্য সভ্যতার প্রথম উন্মেষকালে বৈশ্যদিগের হস্তেই পশুপালনভার অর্পিত হইয়াছিল। পরে যখন তাঁহারা পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তখন তাঁহারা কৃষি-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে দুই শ্রেণীর বৈশ্য আর্য্য সমাজে আবির্ভূত হইল। এক শ্রেণীর বৈশ্য পশুপালন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর

বৈশ্য হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রথম শ্রেণীর বৈশ্যদিগের নাম হইল গোপ বা গোপাল, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম হইল কৃষক বা কৃষীবল। আর্য্যগণ যখন-কৃষি-কৌশল উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তখন বৈশ্যদিগের দুইটি বৃত্তি হইয়াছিল কৃষি ও গো-পালন।

ক্রমে আর্য্যগণ যতই কৃষিশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে লাগিলেন, যতই উর্ব্বরা ভূমি অধিকৃত করিয়া তাহাতে উন্নততর উপায়ে হলকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। সমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকায়, সামাজিক-দিগের মধ্যে শ্রমবিভাগ হইতে থাকিল। তখন কৃষীবল বৈশ্যগণ ক্ষেত্রোৎ-পন্ন পণ্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি-লেন। এই সময় সমাজে প্রথম বাণিজ্যের উন্মেষ হইল। তখন পণ্যের সহিত পণ্যেরই বিনিময় হইত। মাঝখানে মুদ্রা ছিল না। বাণিজ্যের উন্মেষ-সময়ে কৃষকেরাই ঐ কার্য্য করিত। কিন্তু ক্রমে যখন ঐ ব্যাপারের বিস্তার লাভ হইল, তখন ঐ বিনিময়-কার্য্যে তাহাদের সময় অপব্যয়িত হইতে থাকিল। অনেক সময় সরলবুদ্ধি কৃষকগণ কুটিল-বুদ্ধি লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেও লাগিল। সময়ের গতির ও বাণিজ্যের বিস্তৃতির সহিত কাজটিও ক্রমশঃ জটিল হইতে থাকিল। সুতরাং বৈশ্য-সমাজের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান ও চতুর, তাঁহারাই বাণিজ্য-ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইঁহারাই বণিক বা সার্থবাহ নাম ধারণ করেন। বাণিজ্য-বিস্তারের সহিত ঋণদান এবং ঋণগ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। বণিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইজন্য সুদ লইয়া টাকা কর্জ্জ দিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপে বণিকদিগের মধ্যেই মহাজনী (Banking business) আরব্ধ হইল।

সকল সমাজে যাহা হইয়া থাকে, আর্য্য-সমাজেও তাহাই হইয়াছিল। বৈশ্যসমাজের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারাই বণিক নামে একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইলেন। রামায়ণেও বৈশ্যজাতি বণিক বলিয়া অভি-হিত হইয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বাল্মীকির রামায়ণ-রচনার সময়ে বৈশ্যগণ বাণিজ্য ও মহাজনী-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ফলে বণিকগণ যে বৈশ্যজাতি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রাচীনকালে বণিকেরা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে একটি দ্রব্যের ব্যবসায় করিতেন। যাঁহারা গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায় করিতেন, কালে তাঁহারা গন্ধ-বণিক, যাঁহারা কাংস্য বিক্রয় করিতেন তাহারা কাংস্যবণিক এবং যাঁহারা শঙ্খ বিক্রয় করিতেন, তাহারা শঙ্খবণিক নামে অভিহিত হইতেন। এই-রূপ যাঁহারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সুবর্ণের ব্যবসায় করিতেন তাঁহারাই সুবর্ণবণিক নামে অভিহিত। সুতরাং এই সুবর্ণবণিক জাতি বৈশ্য।

কতকগুলি পণ্য বৈশ্যের অবিক্রেয় এবং শূদ্রের পক্ষে বিক্রেয় আছে। যথা—লবণ, তৈল, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, তক্র ও মধু। শূদ্রগণ ঐ সকল পণ্যের ব্যবসা করিতেন। শূদ্রের সুবর্ণ-বিক্রয়ের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং সুবর্ণ বণিকগণ যে, বৈশ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সুবর্ণের ব্যবসায় করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই ব্যব-সায় যথেষ্ট লাভজনক। বৈশ্যেরই এই ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অধিকার। বৈশ্যগণ এই ব্যবসায় কখনই শূদ্রের হস্তে ছাড়িয়া দেন নাই।

বলা বাহুল্য, স্বর্ণকার ও সুবর্ণ বণিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। স্বর্ণকার বা সেক্‌রা শিল্পীজাতি ; সুতরাং শূদ্র। এই স্বর্ণকার জাতিই স্বর্ণ-চৌর্য্যাপরাধে ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়াছিল। * সুবর্ণ বণিকের সুবর্ণ-চৌর্য্য-অপরাধ

---

* "স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম
বভূব সদ্যঃ পতিতো ব্রহ্মশাপেণ কর্ম্মণা।

ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। স্বর্ণ বণিকেরা যদি ব্রহ্মশাপে পতিত হইতেন, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বত্রই স্বর্ণ-ব্যবসায়ী পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন; কেবল বাঙ্গালায় তাঁহারা পতিত হইতেন না। পূর্ব্বে এ দেশের স্বর্ণ বণিকেরা দ্বিজাতির পরিচায়ক যজ্ঞসূত্রধারণ করিতেন, রাজা বল্লালসেনের আমলে তাঁহার সহিত বল্লভ বণিকের বিবাদ হয়, সেই বিবাদের ফলে স্বার্থান্ধ বল্লালসেন স্বর্ণ বণিকদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের অন্য কোন স্থানের বণিকদিগেরই এই আখ্যা আছে। তাহার কারণ, রাজা আদিশূর সনক আঢ্য নামক একজন পরম-ধার্ম্মিক বৈশ্যকে এই অভিখ্যা প্রদান করেন। রাজা আদিশূরের রাজত্বকালে এই সনক আঢ্য অযোধ্যায় রামগড় হইতে পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রম-পুরে আগমন করেন। ইঁহার সহিত মহারাজা আদিশূরের বিশেষ প্রণয় জন্মে, আদিশূর তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্র-তীরে একখানি গ্রাম প্রদান করেন। সনক আঢ্য ঐ গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। সনক আঢ্যের সহিত তাঁহার পরিবারবর্গ ও পুরোহিত জ্ঞানচন্দ্র মিশ্রও ঐ গ্রামে বাস করেন। ক্রমে আঢ্য মহাশয়ের প্রভাবে গ্রামখানি বাণিজ্য বিভূতিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। আঢ্য মহাশয় স্বর্ণের বাণিজ্য করিতেন; সেইজন্য গ্রামখানির নাম স্বর্ণগ্রাম বা সোণার গাঁ হইয়াছিল। আনন্দ ভট্ট-লিখিত বল্লাল চরিতে লিখিত আছে যে, এই সনক আঢ্যের পরামর্শেই আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ফলে বঙ্গে যে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়াছিল, তাহার কারণ—সনক আঢ্য। এই সনক আঢ্যের উপর প্রীত হইয়া মহারাজ আদিশূর তাঁহাকে স্বর্ণ বণিক আখ্যা প্রদান করেন। রাজা আদিশূর-প্রদত্ত তাম্রফলকে লিখিত আছে—

স্বর্ণবাণিজ্য কারিত্বাদত্র স্থিতবিশাং ময়া।
সুবর্ণবণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মানবর্দ্ধয়ে ॥ *

এই স্থানের অর্থাৎ সুবর্ণগ্রামের বৈশ্যগণ সুবর্ণের বাণিজ্য করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাদের সম্মান-বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি (আদিশূর) তাহাদিগকে সুবর্ণ বণিক আখ্যা প্রদান করিলাম।

বিশাং শব্দে উঁহারা যে বৈশ্য তাহা সপ্রমাণ হইল। তাঁহাদের সম্মান-বৃদ্ধির জন্যই মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে সুবর্ণ বণিক এই নাম দিয়া যায়েন।

সুতরাং সপ্রমাণ হইল, সুবর্ণ বণিকেরা খাঁটি বৈশ্যজাতি।

সুবর্ণ বণিক জাতির মধ্যে চোরবাগানের মল্লিকবংশ বিশেষ প্রথিতনামা। ইঁহারা বৈশ্যজাতি। সুতরাং অতি প্রাচীন বৈদিক সময় হইতে ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপ, অবদান, অনুষ্ঠান একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ প্রাচীন আভিজাত-বংশ পৃথিবীতে দুর্লভ। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ধর্ম্মঃ রক্ষতি রক্ষিতঃ", ধর্ম্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম্ম তাহাকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং বহুসহস্রবৎসরব্যাপী ইতিহাসে ভারতে যত বাধা-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এই সুবর্ণ বণিক জাতির জাতীয় অস্তিত্বকে চিরন্তন প্রভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদের সময় বিশগণ যে নিয়ম, যে আচার ও যে ধর্ম্ম পালন করিতেন, এখনকার সুবর্ণ বণিকেরাও অনেকটা সেই নিয়ম, সেই আচার ও সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন; সেই জন্য নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থাতে পতিত হইয়াও সুবর্ণ বণিকদিগের সম্মান ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুবর্ণ বণিকজাতির অন্তর্ভুক্ত চোরবাগানের এই মল্লিক পরিবারের ধর্ম্মশীলতা,

* আনন্দ ভট্ট লিখিত বল্লাল-চরিত।

আচারনিষ্ঠা ও দানশৌণ্ডতা সর্ব্বজনবিদিত। ভারতের সর্ব্বত্র বণিকগণ যেমন আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার-সাধন করিয়াছেন, বাঙ্গালায় সুবর্ণ বণিকজাতি সেইরূপ সভ্যতার ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিয়াছেন। মল্লিকবংশও সেই সভ্যতাসমৃদ্ধি বৃদ্ধির যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেখানেই যখন সভ্যতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানেই যখন বাণিজ্যশ্রী বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই এই মহদ্বংশের মহামান্য মহানুভবগণ সমৃদ্ধির বৈজয়ন্তী হস্তে দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইয়াছেন। সুবর্ণরেখাতীরে, সপ্তগ্রামে, চুঁচূড়ায়, কলিকাতায় —যেখানেই বাণিজ্য-বিভূতি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই এই মল্লিক-বংশীয় মহাত্মাগণ পণ্যবিথিকা সংস্থাপিত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর এই মল্লিক-বংশই সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার উর্দ্ধতন বিশ পুরুষের এবং নিম্নতম তিন পুরুষের তালিকা প্রদান করিলাম :—

১ম মাথু শীল।
|
২য় গজ শীল ও তাঁহার একাদশ ভ্রাতা।
|
৩য় সুমেইর শীল ও তাঁহার দুই ভ্রাতা।
|
৪র্থ বারণী শীল।
|
৫ম ব্রজ শীল।
|
৬ষ্ঠ তেজ শীল।
|
৭ম প্রয়োগ শীল।

|

৮ম নাগর শীল।

|

৯ম নৃত্যানন্দ শীল ও তস্য ভ্রাতৃদ্বয়।

|

১০ম নারায়ণ শীল।

|

১১শ মদন শীল ও তাঁহার ছয় ভাই।

|

১২শ বনমালী শীল।

|

১৩শ যাদব শীল ও তাঁহার দুই ভাই।

|

এই যাদব শীলকে মুসলমান সরকার "মল্লিক" উপাধি-প্রদান করেন। মল্লিক শব্দটি পারস্যভাষা হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ ভূস্বামী বা মহদ্বংশ-সম্ভূত। যাদব শীল মহাশয়কে সম্মানিত করিবার জন্য প্রথমে নবাব এই উপাধি-প্রদান করেন, তাহার পর হইতে এই উপাধি তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

|

১৪শ কেনারাম মল্লিক ও তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয়।

|

১৫শ জয়রাম মল্লিক ও তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়।

|

এই জয়রাম মল্লিকই প্রথম বর্গীদিগের ভয়ে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

|

১৬শ পদ্মলোচন মল্লিক ও তাঁহার পাঁচ ভাই।

১৭শ শ্যামসুন্দর মল্লিক।

১৮শ গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক ও তাঁহার ভ্রাতা

১৯শ নীলমণি মল্লিক।

২০শ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর।

২১শ দেবেন্দ্র মল্লিক, মহেন্দ্র মল্লিক, গিরীন্দ্র মল্লিক, সুরেন্দ্র মল্লিক, যোগেন্দ্র মল্লিক, মণীন্দ্র মল্লিক

২২ কুমার নগেন্দ্র মল্লিক, কুমার ব্রজেন্দ্র মল্লিক, কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক।

২৩ কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক, কুমার দীনেন্দ্র মল্লিক, কুমার গোপেন্দ্র মল্লিক।
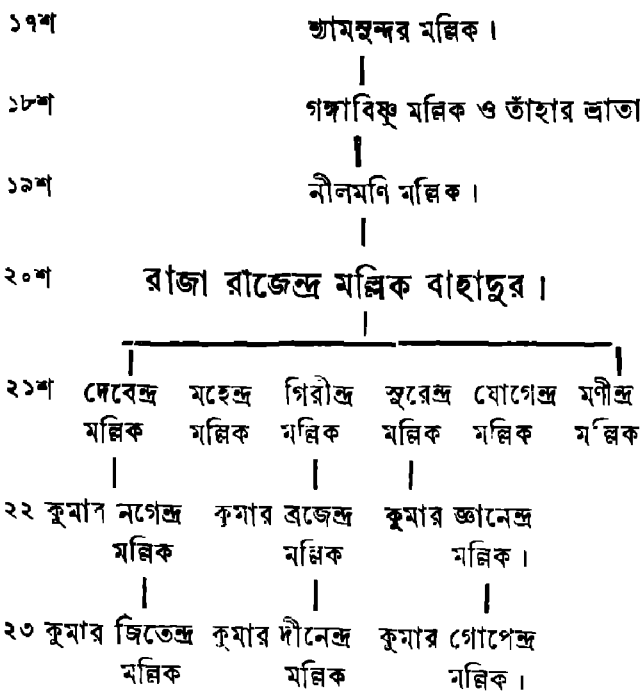
এই মল্লিক-বংশের কাগজপত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, অতিপূর্ব্বকালে ইহাদের একজন পূর্ব্বপুরুষ সুবর্ণরেখাতীরে আসিয়া বসবাস করেন। এক সময় এই সুবর্ণরেখা নদী বারিসম্পদে সমৃদ্ধি-শালিনী ছিল; এক সময় নদীবক্ষে অনেক পণ্যবাহী নৌকা পণ্য লইয়া গতায়াত করিত। এই নদী হইতে জলপথে ছয়ক্রোশ এবং স্থলপথে তিনক্রোশ দূরে প্রাচীন সুবর্ণরেখা বন্দর। এক সময় এই বন্দর বিশেষভাবে বাণিজ্য-প্রধান ছিল। ইহারই সন্নিহিত কোন স্থানে পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজদিগের বাণিজ্য-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই ইদানীন্তনকালে এই নদীর গতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, নদীর মোহনা

মজিয়াছে। সুতরাং এখন আর ঐ নদীপথে বাণিজ্য চলে না। এখন বর্ষাকালে ছোট ছোট দেশীয় তরণী বড়জোর পঞ্চাশ ষাট মণ পণ্য লইয়া ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। কিন্তু যখন বিদেশী বণিকেরা আসিয়া এই নদীর সন্নিহিত স্থানে বাণিজ্যার্থ অধিষ্ঠান করিত, তখন এককালে এই নদী যে বাণিজ্যবাহী ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় সেই সময় মল্লিকবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ নদীতীরে কোন বাণিজ্য-প্রধান নগরে গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন।

সুবর্ণরেখা নদীতীর হইতে ইহারা বাণিজ্য-প্রধান প্রাচীন সপ্তগ্রামে গমন করেন। পৌরাণিক যুগ হইতে হুগলী নগরীর প্রতিষ্ঠাকাল পর্য্যন্ত এই সপ্তগ্রাম বাণিজ্যে বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় ছিল। সপ্তগ্রামের প্রাচীন নাম চরিত্রপুর। প্রকাশ, গঙ্গা-আনয়নকালে ভগীরথ এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হুয়েং সাং এবং গ্রীক গ্রন্থকার টলেমী এই বন্দরের উল্লেখ করিয়াছিলেন। এককালে এই সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিপুল বন্দর ছিল। ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ কিচ্‌ বলিয়াছেন যে, সপ্তগ্রামের পণ্যশালায় সর্ব্বপ্রকার পণ্যই পাওয়া যাইত, এইস্থানে অনেক ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। চোরবাগানের মল্লিকবংশের জনৈক পুরুষ এই বাণিজ্যবহুল বন্দরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা কত পুরুষ তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই। যখন ষোড়শ শতাব্দীতে স্রোতস্বতী সরস্বতী মজিয়া যাইতে লাগিল, সেই সময় পর্ত্তুগীজেরা গঙ্গাতীরে হুগলী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরী রাজকীয় বন্দর বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল; তখন সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে যাইয়া অধিষ্ঠান করেন। মল্লিক-বংশীয় ব্যক্তিরাও সেই সময় সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে আগমন করেন।

হুগলী হইতে তাঁহারা চুঁচুড়ায় এবং চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। উপরে যে বংশলতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার পঞ্চদশ পুরুষ স্বর্গীয় জয়রাম মল্লিক প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। গোবিন্দপুর তখন একটি ক্ষুদ্র ধীবরপল্লী ছিল। বলা বাহুল্য, সে সময় ইংরেজেরা কলিকাতায় শুভ পদার্পণ করেন নাই। বর্গীদিগের উপদ্রব-ভয়েই জয়রাম মল্লিক মহাশয় এই সামান্য ধীবরপল্লীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার লোক এই বর্গীর হাঙ্গামার কথা আজিও বিস্মৃত হয় নাই। কলিকাতার দক্ষিণে,এখন যেখানে গড়ের মাঠ ও ফোর্ট উইলিয়ম অবস্থিত, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট যখন এইস্থানে ফোর্ট উইলিয়ম নামক কেল্লা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইহা গ্রহণ করেন, তখন কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় জয়রাম মল্লিকের বসবাসের জন্য কতকটা জমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় জয়রাম মল্লিক বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের কোনও লিখিত জীবনকথা বা ইতিহাস নাই সত্য, জয়রাম মল্লিক মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র স্বর্গীয় পদ্মলোচন মল্লিক মহাশয় যে ভাবে জীবন-যাপন ও ব্যবসায় কার্য্যের পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পদ্মলোচন মল্লিক হইতেই চোরবাগানের মল্লিক পরিবার উদ্ভূত হইয়াছেন।

৺শ্যামসুন্দর মল্লিক মহাশয় পদ্মলোচন মল্লিক মহাশয়ের পৌত্র। ইঁহার কোনও জীবনচরিত নাই, পূর্ব্বকালে জীবনচরিত লিখিবার পদ্ধতি ছিল না। স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর মল্লিক মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয় একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনের একটা প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয়

তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে বাস করিতেন। এইখানে তিনি মহাজনী করিতেন। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালায়, যুক্ত-প্রদেশে এবং চীন রাজ্যে, সিঙ্গাপুরে ও অন্যান্য স্থানে ইঁহার ব্যাঙ্কের কাজ ছিল। গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয় অতি পবিত্র-চরিত্র লোক ছিলেন, তাঁহার জীবন অন্যের অনুকরণযোগ্য। তিনি কেবল আত্মীয়-স্বজন ও দূর-সম্পর্কের লোকদিগকে প্রতিপালন করিতেন তাহা নহে, তিনি ভিন্ন-জাতীয় বহুলোককে প্রতিপালন করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার বাড়ীর সম্মুখস্থিত ধর্ম্মশালায় তিনি প্রত্যহ বহু দরিদ্রলোককে অন্ন-বিতরণ করিতেন, অনেক বন্ধুকে ব্যবসায়াদি করিবার জন্য অর্থ-সাহায্য করিতেন এবং তাহাদের ভাল ভাল চাকুরীর স্বয়ং জামিন হইতেন। তাঁহার বদান্যতা সহস্র-ধারায় প্রবাহিত ছিল। তাঁহার সময় য়ুরোপীয় পদ্ধতি-সম্মত চিকিৎসা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন এদেশে সুপণ্ডিত কবিরাজ ছিল। গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয় বেতন দিয়া একজন সুদক্ষ কবিরাজ রাখিয়াছিলেন এবং নিজব্যয়ে ঔষধাদি প্রস্তত করিয়া তাহা দুঃস্থ রোগীদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। তখন কলিকাতা ব্যাধিসঙ্কুল ছিল, দরিদ্র ব্যক্তিরা ঔষধ পথ্য পাইত না। মল্লিক মহাশয়ের কবিরাজ সেই সময়ে দরিদ্রদিগকে দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিতেন। ইহাতে লোকের যে কত সুবিধা ও উপকার হইত, এখন তাহা অনুমান করাও কঠিন।

এই গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয়ের আমলেই বাঙ্গালায় ভীষণ ছিয়াত্তরে মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বাঃ ১১৭৬ বা খৃষ্টীয় ১৭৭০ অব্দে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়া শস্যসম্পদশালিনী বঙ্গভূমিকে বিশাল প্রেতভবনে পরিণত করিয়াছিল। উহাতে বঙ্গের প্রায়

এক-তৃতীয়াংশ লোক দুর্ব্বিষহ জঠরানলে দগ্ধ হইয়া শমন-সদনে গমন করে। সেই সময় অনেক লোক পল্লীগ্রামে খাইতে না পাইয়া কলিকাতায় আগমন করিতে থাকে। এই সময় গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয় কলিকাতায় বিভিন্ন স্থানে আটটি অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ও তাঁহার ভ্রাতার ব্যয়ে ঐ আটটি অন্নসত্র পরিচালিত হইত। যে সেই অন্নসত্রে উপস্থিত হইত, সেই উহাতে খাইতে পাইত। মল্লিক মহাশয় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই অন্ন বিলাইতেন। সহরের যে অংশে দেশীয়দিগের বাস, সেই অংশের সত্রগুলি তাঁহারই বন্ধুবর্গের গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সকল বন্ধু সানন্দে ঐ সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। সহরের দক্ষিণাংশেও ঐরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিচালনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কেবল কলিকাতা সহরেই গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয়ের বদান্যতা সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি বৃন্দাবনে একটি সত্র সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তথায় হিন্দুর সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইত এবং নিত্য-নিয়মিতভাবে বহু কাঙ্গালী ভোজন করান হইত। এই সত্রে কখনও কোনও অভ্যাগতকে বিমুখ হইতে হয় নাই। এইরূপ বিবিধ অনুষ্ঠানের জন্য মহাত্মা গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণ বণিক সমাজের বহুলোক তাঁহাকেই তাঁহাদের দলপতি বলিয়া সম্মান করিতেন। বিবাদের মীমাংসায় সকলেই তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিতেন, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে অনেকেই তাঁহার পরামর্শ ও ব্যবস্থা লইয়া কার্য্য করিতেন। ফলে সমাজে তিনি একজন বিশিষ্ট পদস্থ এবং সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭৮৮ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক মহাশয়

ইহধামে দেহরক্ষা করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন! তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র মহানুভব নীলমণি মল্লিক মহাশয় পিতৃসম্পত্তি ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মাসে স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পাথুরিয়াঘাটার পৈতৃক-ভবনে তিনি তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রগণের সহিত একত্র বাস করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার জনৈক পিতৃব্যপুত্রের হস্তেই সেই বৃহৎ পরিবারের কর্তৃত্ব-ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের কর্তৃত্বের গুণে সেই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে পরস্পরের সদ্ভাব সংস্থাপিত ছিল। সেই সময়ে উক্ত মল্লিক পরিবারের সম্মান ও প্রতিপত্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয় ধার্ম্মিক, দয়ালু এবং উচ্চমনা ব্যক্তি ছিলেন। অন্যের কৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া রাখিতেন না। দরিদ্র লোকদিগের উপর তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতি ছিল। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাঁহাকে বিপন্নের বন্ধু বলিয়া জানিত। তাঁহার বদান্যতা ও আতিথেয়তা অনন্যসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে বলিতেন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেন আমাদের গৃহ হইতে অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যায়; তাহাকে যদি আর কিছু না দিতে পার, তাহা হইলে তোমার নিজের খাদ্য তাহাকে দিবে। তাঁহার বদান্যতার ইয়ত্তা করা কঠিন। তিনি চোরবাগানে জগন্নাথ দেবের একটি ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন।০ তাঁহার মাতামহের নিকট হইতেই তিনি জগন্নাথদেবকে প্রাপ্ত হন। এই ঠাকুরবাড়ীর সহিত সংলগ্ন অতিথিশালা অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি-কৌমুদীতে সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে। এখনও প্রতিদিন এই অতিথিশালায় সর্ব্বজাতীয় দীনদরিদ্র অনাথদিগকে অকাতরে অন্নদান করা হইয়া থাকে। প্রতি

বৎসর রথযাত্রায় নয় দিন মল্লিক মহাশয় বণিক জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে তথায় পরিতোষরূপে ভোজন করাইতেন। ইহা ভিন্ন ঐ সময় তথায় বিস্তর ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রব্যক্তিকে ভোজন করান হইত। তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অনেকবার পুরীতে গমন করিয়াছিলেন, এই সময় তিনি দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে অকাতরে অর্থদান করিতেন। একদা পুরীধামের গৌরবারসাহি ও হরচণ্ডীসাহি অঞ্চলে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অগ্নিকাণ্ডে অনেক দুঃস্থব্যক্তি গৃহশূন্য এবং নিরাশ্রয় হয়। সেই সময় দীনপালক স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয় তাহা জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে কুটীর-নির্ম্মাণের জন্য অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। আর এক সময় তিনি দেখিলেন যে, পুরীর আঠারনালা পার হইবার জন্য বহু যাত্রী সেই স্থানে সমবেত হইয়াছে, দরিদ্র লোকদিগের নিকট হইতে পারের পয়সা লওয়া হইতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। যাহাতে সকলে বিনা পয়সায় আঠারনালা পার হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, তিনি নিজে সরকারে টাকা আমানত করিবেন, তাহাতে লোক বিনামাশুলে আঠারনালা পার হইতে পারিবে। কিন্তু সেই জন্য সরকারে যত অধিক টাকা আমানত করা আবশ্যক, দূরদেশে ভ্রমণকালে তিনি তত অধিক টাকা সঙ্গে লইয়া আসেন নাই; সুতরাং তিনি কলিকাতায় স্বর্গীয় বৈষ্ণবদাস মল্লিক মহাশয়ের বরাবর হুণ্ডী দিয়া তথাকার কলেক্টার সাহেবকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে বলিলেন। গরীব যাত্রীদিগের জন্য তাঁহাকে এত অধিক অর্থদান করিতে দেখিয়া সরকার বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। আঠারনালা পারের পয়সা দিবার ব্যবস্থা সরকার তৎক্ষণাৎ

উঠাইয়া দিলেন এবং নীলমণি বাবুকেও উক্ত টাকা আমানত করিতে হইল না।

নীলমণি মল্লিক মহাশয় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দাঁতনে জগন্নাথদেবের মন্দিরে নাটমন্দির নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। তখন দেউলিয়া আসামীর অব্যাহতি-আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। সেই সময় ব্যবসায়-কার্য্যে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া ঋণের দায়ে যাহারা কারারুদ্ধ হইত, মল্লিক মহাশয় তাহা-দিগের ঋণশোধ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিতেন। এরূপ বদান্যতা তদানীন্তন কালেও অত্যন্ত বিরল ছিল। ঐ সময় অনেক লোক এবং সাধু-সন্ন্যাসী ও দরিদ্রলোক কলিকাতায় আসিতেন। তাহাদের অব-স্থানের জন্য এই মহাত্মা গঙ্গাতীরে আশ্রয়স্থান-সংযুক্ত ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ঐ ঘাট তাঁহারই নামানুসারে নীলমণি মল্লিকের ঘাট নামে অভিহিত হইয়াছিল। এখন যেখানে পানপোস্তা বাজার সেইখানেই ঐ ঘাট অবস্থিত ছিল, উহার উপর পাকা ইমারত ছিল, উহাতে স্ত্রীলোক এবং পুরুষদিগের স্বতন্ত্র স্নানের ব্যবস্থা ছিল, পুরাতন ষ্ট্রাণ্ড প্রস্তুত হইবার পর ঐ ঘাট একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ঐ স্থানে যে সমস্ত যাত্রী আসিত, তাহারা কেবল যে তথায় আশ্রয় পাইত তাহা নহে, পরন্তু তথায় তাহাদিগকে অন্ন এবং বস্ত্রও প্রদত্ত হইত। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতেও একটী প্রকাণ্ড অতিথি-শালা ছিল। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় বৈষ্ণবদাস মল্লিক মহাশয় ঐ অতিথিশালার ব্যয়ভার বহন করিতেন। তথায় প্রতিদিন অনেক ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র এবং বিস্তর সাধু-সন্ন্যাসী আতিথ্যগ্রহণ করিতেন, মল্লিক মহাশয়েরা তাহাদিগকে চাউল, আটা, ময়দা, ঘৃত, তৈল, দাইল, তরকারী, হাঁড়ি, কাঠ, মসলা প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য প্রদান করিতেন। তাঁহারা বাটীর সম্মুখস্থিত একটি নির্দ্দিষ্ট খোলা স্থানে পাক করিয়া ভোজন

করিত। মৃত ব্যক্তিদিগকে সৎকার করিতে, অসমর্থ ব্যক্তিদিগের সৎ-কার-সাধনে নীলমণি বাবু বিশেষ মুক্তহস্ত ছিলেন। যে কেহ এই বিষয়ে সাহায্য চাহিলেই তিনি সৎকারের সম্পূর্ণ ব্যয় স্বয়ং বহন করিতেন। প্রতিদিন এইরূপ বহু ব্যক্তি তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত। দরিদ্র রোগীদিগের সাহায্যার্থ ইনি বিজ্ঞ কবিরাজদিগের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া লইয়া তাহা বিতরণ করিতেন, অনেককে ঔষধের সহিত পথ্যও প্রদত্ত হইত। এই বদান্যতার জন্য নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের নাম করিলে লোকে সে দিন ভাল যাইবে মনে করিত। ইনি ইঁহার পিতৃপুরুষের ক্রিয়া-কলাপ রক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত কোন ক্রিয়াকর্ম্মই ইনি বর্জ্জন করেন নাই, বরং ঐ সকল ক্রিয়াকর্ম্মে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। অনেক ক্রিয়াকর্ম্মের উৎসবে পদস্থ রাজপুরুষগণ, বড়লাট বাহাদুরগণ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিতেন। সঙ্গীতে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তিনি নিজেও সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক ভাল ভাল 'কালোয়াৎ' ও বাইজী বেতন দিয়া রাখিতেন উৎসবের সময় উহারা নৃত্য-গীত-বাদ্যে সকলের মনোরঞ্জন করিত। তিনি সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। কলিকাতা সহরে কোন সুদক্ষ গায়ক আসিলেই তিনি আমন্ত্রণ করিয়া তাহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন এবং তাহাকে তাহার যোগ্যতার অনুরূপ পুরস্কার প্রদান করিতেন।

প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় তাঁহার ভবনে ও ঠাকুর-বাড়ীতে একটা বিশেষ মাইফেল হইত, সেই মজলিসে নানাপ্রদেশ হইতে সমাগত গায়ক ও বাদকগণ আপন আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। সেই সময় তাহারা ইঁহার নিকট হইতে স্বীয় যোগ্যতা অনুসারে

যথেষ্ট পারিতোষিক পাইত। তিনি গানের সংস্কার করিয়া ঐক্যতান বাদনে ‘ফুল আখড়াই’ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, ইহার সুর ও রাগ-রাগিণী সুন্দর ও বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে কেহ ‘ফুল আখড়াই’ গাহিতে পারে না, সেইজন্য প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া ফুল আখড়াইয়ের পরিবর্ত্তে হাফ আখড়াই গানই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই হাফ আখড়াইতে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাদৃশ কৃতিত্বের প্রয়োজন হয় না। সঙ্গীত-শাস্ত্রের উন্নতি-সাধনে নীলমণিবাবুর যত্ন ও চেষ্টা কিরূপ ছিল, তাহা রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধু বাবুর জীবনকথায় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয় জনসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু অনেক ছিল, তিনি নানাপ্রকারে সেই বন্ধুত্বের লক্ষণ প্রকটিত করিতেন। সরকারী খাজনার অভাবে কাহারও জমিদারী বিক্রীত হইয়া যাইতে বসিলে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ দিয়া বহুলোকের জমিদারী রক্ষা করিতেছেন। অনেক সময় মধ্যস্থতা করিয়া অনেকের গৃহবিবাদ মিটাইয়া দিতেন। তাঁহার অনেক নিকট-আত্মীয়কে তিনি দুঃসময়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন। তাঁহারা এখনও সেই সহায়তার সুফলভোগ করিতেছেন, সেই আনুকূল্যের কথা এখন তাঁহারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। নীলমণি বাবু তাঁহার সমাজের দলপতি ছিলেন। তিনি সমাজপতি ছিলেন বলিয়া সমাজে অনেক প্রকার সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, এমন অনেককে তিনি সমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণদর্শী লোক ছিলেন, কিসে সমাজের ভাল হইবে, কিসে মন্দ হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন। দূরদৃষ্টি-প্রভাবে

তিনি ভবিষ্যতের মঙ্গল ভাবিয়া সকল কাজ করিতেন, সেই জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা এখনও সমাজমধ্যে অনুসৃত হইয়া থাকে। তিনি যে একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য-কলাপ হইতে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি বুদ্ধিশক্তিতে ও দূরদর্শনে যেমন অসাধারণ ছিলেন, বিনয় ও সৌজন্যে তেমনই অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার কোনও কার্য্যেই কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল ছিল না, তাহাতেই তাঁহার সম্মান ও গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইত।

স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের পিতার এক সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম বাবু রামকৃষ্ণ মল্লিক। রামকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের দুই পুত্র ছিল, সুতরাং নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের পৈতৃক-সম্পত্তি দুই ভাগ হইবার কথা। তাহার একভাগ নীলমণি বাবু পাইবেন, আর একভাগ রামকৃষ্ণ বাবুর পুত্রদ্বয় পাইবেন, ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দু-আইনের বিধান। নীলমণি বাবুর একটিমাত্র পোষ্যপুত্র ছিল, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য পুত্রদ্বয় তাঁহাকে পৈত্রিক সম্পত্তি সমান তিনভাগে বিভক্ত করিবার জন্য অনু-রোধ করিলেন। তিনিও অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক উইল করিয়া গেলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পুত্রই অর্দ্ধ সম্পত্তির অধিকারী। ইদানীন্তনকালে এইরূপ ত্যাগ স্বীকার অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ উদারতা ও স্বজনবাৎসল্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে নীলমণি মল্লিক মহাশয় মর্ত্তধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরধামে গমন করেন, সেই সময় তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিকের বয়স তিন বৎসর মাত্র।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে মল্লিক মহাশয় আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হউক। তদনুসারে তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহাকে তাঁহার ঠাকুর-বাড়ীতে লইয়া যায়। তথায় গৃহ-দেবতার নিকট বসিয়া জপ করিলেন, তাহার পর তাঁহার আদেশে তাঁহাকে গঙ্গা-তীরে লইয়া যাওয়া হয়। গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া তিনি স্বয়ং গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে টাকাপূর্ণ দুইটী থলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যাহারা সেইস্থান দিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে এবং সেইস্থানে সমবেত দুঃখী-গরিবদিগকে তিনি স্বহস্তে সেই টাকা বিতরণ করেন। তাহার পর তিনি স্থির ও প্রশান্তভাবে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ এবং জীবনে যদি কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করেন। এই সময় যখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গলিত হইতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহাদিগকে কাঁদিয়া তাহার মনের আবেগ বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শেষকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তিনি দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সজ্ঞানে ভাগীরথী-তীরে দেহত্যাগ করেন।

"জপতপ কর কিছে মর্‌তে জান্‌লে হয়"—পুণ্যাত্মা নীলমণি মল্লিক মহাশয় মরণকালে তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকালে দান প্রধান ধর্ম্ম, সেই দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর বিশ ত্রিশ বৎসর পরেও নানাদিক্‌দেশ হইতে সাধু-সন্ন্যাসীরা আসিয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে "নীলমণি মল্লিককী জয়" বলিয়া চীৎকার করিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি ছোটলাট

বাহাদুরের পক্ষ হইয়া স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের দানশৌণ্ডত্বের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিকের সহিত নীলমণি মল্লিকের বিধবা পত্নীর বাটোয়ারার মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক তখন নিতান্ত শিশু ছিলেন, তাঁহার বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র ছিল, তাঁহার মাতা তাঁহার অভিভাবিকা-স্বরূপ এই মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত হন। মামলা উপস্থিত হইলে, মাতা পুত্র রাজা বাহাদুরকে লইয়া পাথুরিয়াঘাটা হইতে চোরবাগানের ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন গৃহে আসিয়া বাস করেন। স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয় ঐ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যতদিন নাবালক রাজা বাহাদুর সাবালক না হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা ঐ বাড়ীতেই বসবাস করিয়াছিলেন। এই সময় নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের বিধবা পত্নীর পক্ষে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর দান ও ধর্ম্মকার্য্যগুলির পরিচালনা করা বড়ই কঠিন হইয়াছিল; কারণ যে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে তাঁহাদের সেই বিষয়-সম্পত্তি ন্যস্ত ছিল, সেই কোর্ট অব ওয়ার্ডস বহুদিন তাঁহাদের খোরপোষ-বাবদ কোন খরচ মঞ্জুর করেন নাই। এই সময় তিনি তাঁহার নিজের বিষয় হইতে ঐ সময় দানধর্ম্মের কার্য্যগুলি চালাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার উদারতা ও বদান্যতা অন্যের আদর্শ ছিল। গৃহের সেবক ও অনুজীবীদিগের উপর তাঁহার পুত্রবৎ স্নেহ ছিল, তিনি তাহাদের অনেককেই এই সহরে পাকাবাড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই বদান্যতায় তাহারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সে বাড়ী ভোগদখল করিতেছে। যে সমস্ত ক্ষুধাতুর ও দরিদ্র অতিথি ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইত, তিনি অন্নপূর্ণার ন্যায় স্বহস্তে তাহাদের সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ

করিতেন। তাহাদের ভোজ্যাদি প্রস্তুত হইবার সময় তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার পরিদর্শন ও সহায়তা করিতেন এবং যতক্ষণ সকল অতিথির সেবা না হইত, ততক্ষণ জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না।

রাজা বাহাদুরের মাতা বিশেষ বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা ছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রকে তাঁহার বংশমর্য্যাদার অনুরূপ শিক্ষাদানে বিশেষভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্য-সাধনে বিশেষ কষ্ট স্বীকার ও যত্ন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার কতকগুলি আত্মীয়-কুটুম্ব অতিশয় প্রতিকূলাচরণ করাতে তাঁহার অতিশয় কষ্ট এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। শত প্রতিকূলতা এবং সহস্র বাধা সত্ত্বেও তিনি রাজা বাহাদুরকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে ত্রুটি করেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহার ধৈর্য্য ও প্রযত্ন বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল. তাঁহার সেই প্রচেষ্টা ও প্রযত্ন সমস্ত নারীজাতিরই অনুকরণীয়। তিনি বাস্তবিকই নারীজাতির আদর্শ-স্থানীয়া ছিলেন। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর শৈশবে পিতৃহীন হইলেও এই পুণ্যবতী মহিলার তত্ত্বাবধানে যেরূপ সুন্দর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাবে উত্তরকালে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সম্মানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পুণ্যশীলা মহিলার চরিত্র সমস্ত হিন্দু ললনারই অনুকরণীয়। তাঁহার সময়ে তাহার ন্যায় উচ্চমনাঃ ললনা অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সেই পুণ্যশীলতার লক্ষণ নানাদিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ও সংসারে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি ইহধাম হইতে কৈবল্যধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৯২ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্র রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের যশঃসৌরভ দশদিকে বিকীর্ণ হইতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। "পুত্রেযশসি

ভোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং”—এই সাধুবাক্য সপত্নীক স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের পক্ষে সফল হইয়াছিল।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি যখন নাবালক ছিলেন, তখন তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্ট স্যর জেমস্ উইয়ার হগকে (ইনি পরে ব্যারণেট হইয়াছিলেন) তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, পরে সুপ্রীম কোর্টেরই রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি নাবালক রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের অভিভাবক হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান হন। রাজা বাহাদুরের যাহাতে সমৃদ্ধি ও মঙ্গল বৃদ্ধি পায়, স্যর জেমস্ উইয়ার হগ তাঁহার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা প্রায়ই রাজা বাহাদুরকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। একদা তিনি বালক রাজেন্দ্রকে কয়েকটী পক্ষী প্রদান করেন, সেই পক্ষীগুলি পুষিতে পুষিতে তাঁহার বাল্যকালেই পশুপক্ষী প্রতিপালনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠে, তাহারই ফলে তিনি বাড়ীতে একটা চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর বিদ্যাভ্যাসের জন্য হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি ইংরাজী এবং বাঙ্গালা এই দুই ভাষাতেই ভালরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দয়াধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল। পঠদ্দশায় তাঁহার সেই পরোপচিকীর্ষা অত্যন্ত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার সহাধ্যায়ী ও এক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মুখে তাঁহার সেই উপচিকীর্ষার অনেক সুন্দর গল্প শুনা যায়। তিনি যেমন শিষ্টাচারী, তেমনই উদার-প্রকৃতি ছিলেন; তাঁহার বিনয়ও অসাধারণ ছিল।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বয়স যখন ষোড়শবর্ষ মাত্র, তখন তিনি চোরবাগানের 'মার্ব্বেল প্যালেস' রচনা করিতে আরম্ভ করেন, পাঁচ বৎসরে উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। এই প্রাসাদে প্রাচ্য-স্থাপত্য-কলার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, উক্ত রাজা বাহাদুর স্থাপত্যবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জীববিদ্যা ও কলাবিদ্যায় তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, তাহা স্বাভাবিক। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার স্বাভাবিক আনুরক্তি এমনভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, অতি অল্প বয়সেই তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিত্রকলায় বিশেষজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মর্ম্মরপ্রাসাদে যে সমস্ত আলেখ্য ও ভাস্করকীর্ত্তি সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার এই সকল সুকোমল কলাবিদ্যায় যে অসাধারণ স্বাভাবিকী শক্তি ছিল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চিত্রকলায় পারদর্শিতা মানুষের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার একটা প্রবল নিদর্শন। বুদ্ধির একটা বৈশিষ্ট্য না থাকিলে কেহ ঐ বিষয়ে বিচক্ষণতা লাভ করিতে পারে না। রাজা বাহাদুরের বুদ্ধিবৈশিষ্ট্য যে কেবল চিত্রকলা-বিচারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা নহে, সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাহার অসামান্য নৈপুণ্য-প্রকাশ পাইত। তিনি নিজে অনেক সুর-রচনা করিয়াছেন এবং বিবিধ রাগরাগিণী-অনুসারে ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গান এখন সময় সময় তাঁহার চোরবাগানস্থ ঠাকুরবাড়ীতে গীত হইয়া থাকে; সেই সকল গানে তাঁহার অসাধারণ দেবভক্তি এবং রচনা-কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা বাহাদুর তাঁহার পিতার দান এবং ধর্ম্মকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় তিনি অধিক পরিমাণে ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন। লোকহিতৈষণার কার্য্যেও প্রচুর

অর্থব্যয় করিতেন। তিনি গরিবের বন্ধু এবং অজাতশত্রু ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল; ঠাকুরবাড়ীতে বসিয়া রীতিমত পূজা, আহ্নিক ও জপ না করিয়া তিনি জলগ্রহণও করিতেন না। তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে তিনি প্রতিদিন পাঁচ ছয় শত কাঙ্গালীকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অন্নদান করিতেন। এখনও তাঁহার বংশধরগণ তাঁহার সেই কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ধর্ম্মোৎসবে বা দুর্ভিক্ষের সময় কেবল 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ব্যাপার উপস্থিত হইত; সে সময় কোন অন্নার্থীকে বিমুখ হইতে হইত না। সেই অন্নসত্রের ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্মিত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র লোককে একসঙ্গে ভোজন করান হইত, কিন্তু কোথাও কোনরূপ গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইত না। কাহাকেও কোনওরূপে অসন্তুষ্ট হইতে হইত না। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই সময় রাজা বাহাদুর প্রতিদিন তাঁহার চোরবাগানস্থ ভবনে পাঁচ ছয় হাজার কাঙ্গালী ভোজন করাইতেন। সকলকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রদত্ত হইত। সেই ব্যাপার দেখিতে অনেক লোক সমাগত হইতেন। তাঁহার সেই কার্য্যে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, সরকার তাঁহার সেই সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় কেবল চোর-বাগানে নয়, চিৎপুরেও তিনি প্রকাণ্ড অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। কাঙ্গালী-দিগকে কেবল অন্নব্যঞ্জন প্রদত্ত হইত না, অনেক লোককে আমান্ন-ভোজ্যও প্রদত্ত হইত। সেই জন্য ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' The munificence of Raja Rajendro Mullick শীর্ষক সন্দর্ভে যাহা লিখিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল:—

অনুবাদ

বঙ্গীয় সরকারের অস্থায়ী জুনিয়ার সেক্রেটারী মিঃ জে, জিওপি গানের নিকট হইতে কলিকাতার পুলিস কমিশনার বাহাদুরের নিকট—
(পত্রের নম্বর ৪৪৬৫, তারিখ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর।)

"আমি ছোটলাট বাহাদুরের আদেশে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বাবু রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের জনহিতকর কার্য্যের ও দানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবেন।

ইহার উত্তরে তদানীন্তন পুলিস কমিশনার স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই—

১। আপনার ৯ই তারিখের ৪৪৬৫নং পত্রের উত্তরে আমি জ্ঞাপন করিতেছি যে, বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক প্রতিদিন বহুসংখ্যক দরিদ্র-ব্যক্তিকে ভোজ্যদ্রব্য বিতরণ করিয়া থাকেন।

২। গত জুন মাসে যখন কলিকাতার রাস্তায় দলে দলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তির আমদানী হইতে লাগিল, তখন যে সমস্ত কাঙ্গালী তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইত, তাহাদিগকে অন্নপ্রদানের জন্য বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক অত্যন্ত বদান্যতাসহকারে বিপুল আয়োজন এবং উৎ-কৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক যে দৃষ্টান্ত দেখা-ইয়াছিলেন, অন্য অনেকে শীঘ্রই তাহার অনুকরণে অন্নসত্র খুলিয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় যে ভদ্রলোক সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তি-গত ভাবে দরিদ্রদিগকে এইরূপ অকাতরে অন্নদানের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি যে বিশেষ সম্মানের যোগ্যপাত্র ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

৩। গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে দুর্ভিক্ষ-প্রশমন-সমিতির কার্য্যকরী

সভা কলিকাতা হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত কাঙ্গালীদিগকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। সহরের উত্তর অঞ্চলে রাজপথে ঐরূপ কাঙ্গালী দলে দলে জমায়েৎ রহিয়াছে লক্ষিত হইত, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত না করিলে সহরে কোন মহামারীর আবির্ভাব হইতে পারে, এই শঙ্কা লোকের মনে উদিত হয়। ঐ ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবার জন্য বিভিন্ন অন্নদাতাদিগের নিকট প্রস্তাব করা হয় যে, হয় তাঁহারা দানকার্য্য বন্ধ করিয়া দিন, না হয় তাঁহারা দুর্ভিক্ষ-প্রশমন-সমিতির সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য চিৎপুরে অন্নসত্র লইয়া যাউন। বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক সমিতির কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অবিলম্বে অগ্রসর হইলেন; তিনি সহরের ভিতর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে অন্নদান স্থগিত করিয়া দিতে সম্মত হইলেন এবং চিৎপুরে প্রতিদিন সহস্র কাঙ্গালীকে অন্নদানের জন্য সমিতির হস্তে প্রত্যহ একশত করিয়া টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

৪। বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য উক্ত সমিতি দেশীয়-সমাজে বিশেষ অসন্তোষের উদ্ভব না করিয়া তাঁহাদের সঙ্কল্প-অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উক্ত বাবু মহাশয় যদি সমিতির কার্য্যে সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে সমিতির পক্ষে কলিকাতার রাজপথ হইতে কাঙ্গালীদিগকে এমন সুন্দর-ভাবে অপসারিত করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

৫। উক্ত সমিতির যখন হাঁসপাতলের জন্য স্থানাদির প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক কলুটোলায় তাঁহার নূতন প্রস্তুত অনেকগুলি মূল্যবান গুদাম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ঐ গুলির ভাড়া মাসিক এক হাজার ছয়শত টাকা। ইহা ভিন্ন তিনি টিভলী বাগানের জমি ও বাড়ী সমিতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। গুদামগুলি সহরের জন-

বহুল স্থানে অবস্থিত বলিয়া সমিতি উহা গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু টি্ভলীর বাগান ও বাড়ী এখনও সমিতির হস্তে রহিয়াছে, তথায় এখন পিতৃমাতৃহীন পরিত্যক্ত শিশুদিগের আশ্রয়-বাটিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

৬। যখন কলিকাতার সমস্ত সাহায্যকার্য্য অন্নসত্র প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন সমিতির হস্তে তিন হাজার পরিত্যক্ত শিশু থাকিবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। যদি অনাথ শিশুদিগের জন্য কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক ঐ আশ্রমে মাসিক একশত টাকা হিসাবে চিরদিন সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিবেন, প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন।

৭। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই দুর্ভিক্ষের সময় দুঃস্থদিগের সাহায্যকল্পে বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক বরাবরই সহৃদয়তা প্রদর্শন এবং দুর্ভিক্ষ-প্রশমন-সমিতিকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সানন্দে আমি সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছি এবং উক্ত বাবুর প্রতি ছোটলাট বাহাদুরের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য সুপারিস করিতেছি।

এই পত্র-প্রাপ্তির পর বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের দপ্তর হইতে ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র প্রেরিত হয়, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ পত্রের নম্বর ৪৮৮৯, তারিখ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর।

পত্রের অনুবাদ

মান্যবর ছোটলাট বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সকৌন্সিল মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের নিকট আমি কলিকাতার পুলিস

কমিশনার বাহাদুরের (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর তারিখের ১৫৯০ নম্বর) পত্র উপস্থিত করিতেছি; সম্প্রতি কলিকাতায় লোকের যে দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার প্রশমনকল্পে এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল হইতে যাহারা কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাদিগকে অন্নদানে বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক যেরূপ মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার প্রতি সরকারের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি।

এই খ্যাতনামা দেশীয় ভদ্রমহোদয় মানবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় যে আত্মত্যাগের কার্য্য করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মিঃ হগের প্রদত্ত বিবরণ পাইয়া ছোটলাট বিশেষ প্রীত হইয়াছেন; ছোটলাট বাহাদুরের বিশ্বাস, উহা সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুরেরও প্রীতিপ্রদ হইবে এবং সেই জন্য উক্ত বাবু মহোদয়ের এই সমুদার ও বদান্যতাপূর্ণ দানকার্য্যে বড়লাট বাহাদুর যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন জ্ঞাপন করিবার জন্য সুপারিশ করিতে ছোটলাট বাহাদুর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত পত্র-প্রাপ্তির পর বড়লাট বাহাদুরের পররাষ্ট্র-বিভাগ হইতে বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুরের জুনিয়ার সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র আসিয়াছিল, নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল। ঐ পত্রের নম্বর ১০, তারিখ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী।

অনুবাদ

বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের অস্থায়ী জুনিয়ার সেক্রেটারী বরাবরেষু—

হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী বরাবরে আপনি গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ৪০৮৯ নং পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুরের নিকট পেশ করা হইয়াছিল; বিগত দুর্ভিক্ষের সময়

বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ যে বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য বড়লাট বাহাদুর বাবু রাজেন্দ্র মল্লিককে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত ভদ্রমহোদয়ের নিকট এই সনন্দখানি প্রেরণের জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে অনুজ্ঞাত্ত হইয়াছি।

বঙ্গীয় গবমেন্টের সেক্রেটারী অনারেবল স্যর এ, ইডেন কলিকাতার পুলিস কমিশনার সার ষ্টুয়ার্ট হগ মহোদয়ের মারফতে কলিকাতা ও তাহার সন্নিহিত জনপদে দরিদ্রদিগের কষ্ট-নিবারণার্থ যথাসময়ে সুব্যবস্থা করার জন্য বঙ্গের ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ-প্রশমন-তহবিলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যসকলকে এবং বাবু রাজেন্দ্র মল্লিককে বিশেষভাবে সরকারের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিতেছেন।

যখন রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া "ভারতেশ্বরী" এই অভিখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা সহরে এক দরবার হয়। সেই দরবারে বড়লাট বাহাদুর রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরকে সম্মানসূচক সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন বাহাদুর উক্ত মল্লিক মহাশয়কে তাঁহার বদান্যতার ও চরিত্রবলের জন্য "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

রাজা বাহাদুরের প্রাণিবিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাঁহার প্রাসাদে তিনি একটি বিরাট প্রাণিশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই প্রাণিশালায় পৃথিবীর নানাদেশ হইতে জীবজন্তু সংগৃহীত হইয়াছিল। কলিকাতা এবং দূরদেশ হইতে আগত বহুলোক প্রত্যহ ঐ প্রাণিশালা দর্শনার্থ আগমন করিতেন। সেই প্রাণিশালা ও চিত্রশালিকা যূরোপ হইতে সমাগত বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং এদেশের অনেক কোবিদ দর্শন করিয়া

বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ এবং তাঁহার নির্ব্বাচনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরই কলিকাতা সহরে সর্ব্বপ্রথম প্রাণিশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে এদেশে ঐরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না। এমন কি কলিকাতার উপকণ্ঠে আলিপুরে যে প্রাণিশালা আছে, তাহাও তখন স্থাপিত হয় নাই। আলিপুরের প্রাণিশালা-প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার চেষ্টার ফলে ঐ প্রাণিশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন ঐ প্রাণিশালার পত্তন হয়, তখন তিনিই উহার সৌষ্ঠববর্দ্ধনার্থ তাঁহার সংগৃহীত অনেকগুলি বহুমূল্য প্রাণী দান করিয়াছিলেন। সেই জন্য উক্ত প্রাণিশালার প্রথম যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা উক্ত রাজা বাহাদুরের নামানুসারে 'মল্লিকস্ হাউজ' নামে অভিখ্যাত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন উক্ত রাজা বাহাদুর য়ুরোপের বহু দেশের প্রাণিশালায় নানাবিধ পশুপক্ষী প্রেরণ করিয়াছিলেন; তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে অনেকগুলি মূল্যবান উপঢৌকন প্রদত্ত হইয়াছিল। অনেক দেশ হইতে তাঁহাকে পদক (medals), সনন্দ (diplomas), পশু এবং পক্ষী প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে লণ্ডনস্থ প্রাণিবিদ্যা-সমিতি রাজা বাহাদুরকে ইংলণ্ডে হিমালয় পর্ব্বতের শিখিপক্ষী (Pheasant) আমদানী করাতে তাঁহাকে সম্মানসূচক পদক প্রদান করেন। পশুপক্ষীদিগকে ভিন্নদেশে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা-কার্য্যে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই জন্য Victoria Acclimatisation Societyর পরিষদের তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। লণ্ডনের প্রাণিবিদ্যা-সমিতিও তাঁহাকে ঐরূপ সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখের মানদান-পত্রে তাহা দ্রষ্টব্য। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখের পত্রে উক্ত সমিতি রাজা বাহাদুরকে

একখানি সনন্দপত্র পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, উক্ত সমিতির কার্য্যসাধনে সাহায্য করিলে সমিতি সেই কার্য্য বিশেষ মূল্যবান বলিয়া গৌরব করিবেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলজিয়াম রাজ্যের য়্যাণ্টওয়ার্প সহরের রয়েল জুলজিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট উক্ত সমিতির সহিত পশুপক্ষী পরিবর্ত্তন করিয়া সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট ও পরিষদ তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর যখন যে প্রয়োজন হইয়াছে, রাজা বাহাদুর তখনই তাহার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেই জন্য এবং তিনি উক্ত সমিতিকে অনেক অর্থ, পশুপক্ষী প্রভৃতি দান করিয়াছেন, ইহা ভিন্ন উক্ত সমিতির কার্য্যে তিনি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। সেই জন্যই উক্ত সমিতি তাঁহাকে ঐকান্তিকভাবে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতা যাদুঘরের (museum) উপর তাঁহার অনুরাগ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি সূচিত করে। সেইজন্য ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে স-কৌন্সিল বড়লাট বাহাদুর রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরকে ভারতীয় চিত্রশালার জনৈক ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে ভারতীয় চিত্রশালিকার ট্রষ্টীরা উক্ত রাজা বাহাদুরকে সমিতির অর্থবিভাগ ও পুস্তকালয়-বিভাগের সদস্য মনোনীত করিয়াছিলেন।

উদ্ভিদবিদ্যাতেও উক্ত রাজা বাহাদুরের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।

সেই জন্য তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত উদ্যানে এবং তাঁহার নিজ বাটীতে অনেক বিস্ময়জনক বৃক্ষ রোপিত করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল বৃক্ষের নির্ব্বাচন দেখিলেই উক্ত রাজা বাহাদুরের উদ্ভিদবিদ্যায় স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রবিদ্যাতেও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল, তিনি স্বয়ং অতি সুন্দর চিত্রাঙ্কন করিতে পারিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তি বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল। অনেক হাফ আকড়াইয়ের আসরে তাঁহাকে মধ্যস্থতার কার্য্য করিতে হইত।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইংরেজী ভাষাতে তাঁহার অধিকার মন্দ ছিল না; ইহা ভিন্ন তাঁহার পারস্য ভাষাতেও কিঞ্চিৎ দখল ছিল।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর চোরবাগান অঞ্চলের উন্নতিসাধনকল্পে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে প্রশস্ত রাজপথ-নির্ম্মাণের জন্য তিনি অনেক জমি স্বেচ্ছায় দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাধারণ-হিতকর কার্য্যে ঐরূপ অর্থদান করিয়াছেন বলিয়া সরকার হইতে ধন্যবাদ করিয়া তাঁহাকে অনেক পত্র লিখিত হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের মর্ম্মর-প্রাসাদের তোরণদ্বারের সম্মুখে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট হইতে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত রাজা বাহাদুরের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ উক্ত রাজপথকে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের সময় কলিকাতার স্বাস্থ্য উন্নত হয় নাই। তখন কলিকাতায় নানাবিধ ব্যাধির প্রবল প্রকোপ ছিল। কলিকাতায় জনসাধারণের মধ্যে মৃত্যুর হার এত অধিক ছিল যে, তাহা স্মরণ

করিলে অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে। কলিকাতায় তখনও ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল হয় নাই ; ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি নানাবিধ জ্বররোগ তখন অত্যন্ত প্রবলভাবে লোকসংহার করিত। এই সময় সাধারণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া দয়ালু রাজা বাহাদুর তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয় হইতে জ্বররোগের ঔষধ-বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কবিরাজী চিকিৎসায় রাজা বাহাদুরের কতকটা অধিকার ছিল। তিনি যে কেবল সুদক্ষ কবিরাজ দ্বারা ভাল ভাল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সাধারণকে তাহা বিতরণ করিতেন তাহা নহে ; পরন্তু তিনি সিভিল সার্জ্জনদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার ডিস্‌পেন্‌সারীতে উৎকৃষ্ট বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ আমদানী করিতেন এবং সেই সকল ঔষধ অকাতরে বিনামূল্যে গরিব-দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার হৃদয় যে কত উদার এবং পর-দুঃখকাতর ছিল, এই অনুষ্ঠান হইতেই তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রতিদিন শত শত রোগী তাঁহার হাঁসপাতালে ঔষধ লইবার জন্য আগমন করিত এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহার জয়ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হইত।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক স্বর্গীয় রূপলাল মল্লিকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রূপলাল মল্লিকের পুত্র বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক সাত-পুকুরের বাগানের অধিকারী ছিলেন। রাজেন্দ্র মল্লিকের ছয় পুত্র হইয়াছিল। ঐ ছয়পুত্রের নাম—দেবেন্দ্র মল্লিক, মহেন্দ্র মল্লিক, গিরীন্দ্র মল্লিক, সুরেন্দ্র মল্লিক, যোগীন্দ্র মল্লিক এবং মণীন্দ্র মল্লিক। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা বাহাদুরের জীবদ্দশাতেই মহেন্দ্র, গিরীন্দ্র, যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র এই চারি কুমারই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় যদি তাঁহাদের জীবন রক্ষিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারাও পিতৃগুণের অধিকারী হইয়া জনসমাজের বহু হিতকর কার্য্য করিতে পারিতেন। কুমার গিরীন্দ্র

মল্লিকের পুত্রের নাম কুমার ব্রজেন্দ্র মল্লিক এবং কুমার সুরেন্দ্র মল্লিকের পুত্রের নাম কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর আত্মীয় বন্ধু এবং প্রতিবেশীর উপর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরবিহীন পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন এবং নিরামিষ ভোজন করিতেন। তবে পীড়ার সময় চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে মৎস্য খাইতেন, অন্যথা মৎস্য খাইতেন না।

রাজা বাহাদুর একজন আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন, প্রত্যহ পূজা-আহ্নিক কার্য্যে তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। তিনি নিজেই কেবল একনিষ্ঠভাবে আহ্নিক পূজা ও স্তবপাঠ করিতেন না; প্রত্যেক দিন প্রাতে তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে যাইয়া পূজা ও স্তবপাঠ করিতেন কি না জিজ্ঞাসা কারতেন। তিনি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৃত্তির বিশেষভাবে অনুশীলন করিতেন; দেবতা ও গুরু প্রভৃতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। দেবতার বিধান মনে করিয়া তিনি দুরন্ত পুত্রশোকও অটলভাবে সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রস্নেহ অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু যখন প্রাণাধিক পুত্র কুমার গিরীন্দ্র মল্লিক এবং কুমার সুরেন্দ্র মল্লিক সুশিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহধাম হইতে বিদায়গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেই মর্ম্মচ্ছেদী পুত্রশোকও অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুত্রশোকের অরুন্তুদ অনলে তাঁহার মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইতে থাকিলেও তিনি বিচলতার কোন লক্ষণই প্রকটিত করেন নাই। তাঁহার যে সমস্ত আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সহিত শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য এবং তিতিক্ষা-দর্শনে বিস্মিত এবং চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত মৃত্যু, পরকাল, কর্ম্মফল প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন।

গুণগ্রাহী বৈদেশিক ভদ্রলোকেরা রাজা বাহাদুরের গুণে ও বদান্যতায় বিশেষ মুগ্ধ হইতেন। রুষ যুদ্ধের ইতিহাসের (History of the war against Russia) লেখক মিঃ এচ, ই, নোলান তাঁহার Illustrated History of the British Empire and the East নামক গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন দেখুন :—

মর্ম্মানুবাদ

"বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া উৎসবাদি করা হইয়াছিল। অন্যান্য বহুলোক অপেক্ষা ইঁহার প্রকাণ্ড বিষয় এবং বিপুল বিভব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দত্তদিগের বাড়ীর ব্যয় অনেক অল্প, কারণ মল্লিক বাবু (বিলাতী) ভদ্রলোকের মত থাকেন এবং বিদেশ হইতে আনীত অনেক শোভনদ্রব্য দ্বারা গৃহসজ্জা করিয়া থাকেন। ঐ সকল দ্রব্য যতই মূল্যবান হয়, ততই তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি পায়। তাঁহার উদ্যান নানা পশু-পক্ষীতে পূর্ণ ; অষ্ট্রিচ হইতে এমু পর্য্যন্ত, চীন দেশের ম্যাণ্ডোরিন হংস হইতে বার্ড অফ প্যারাডাইস্ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের পক্ষীই তাঁহার উদ্যানে বিদ্যমান। লোকান্তরিত আর্ল অব ডার্বি কতকগুলি পক্ষীসংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় যে সকল ভেড়ার লোমে বিখ্যাত শাল প্রস্তুত হয়, তাঁহার উদ্যানে আমি সেই ভেড়াও কতকগুলি দেখিলাম। পাহাড় হইতে অন্যত্র লইয়া গেলে ঐ মেষ রুগ্ন হইয়া পড়ে, মল্লিক বাবুর দুইশত ভেড়ার মধ্যে পাঁচটি মাত্র জীবিত আছে। এই বাবু বড়ই ভদ্রব্যবহারসম্পন্ন ; প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাসে ইনি বিশেষ অভিজ্ঞ। কয় সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি বড় সুন্দর 'নাচ' দিয়াছিলেন। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থল চন্দ্রাতপে মণ্ডিত হইয়াছিল, মধ্যস্থলে বহুমূল্য ফোয়ারার চতুষ্পার্শে লণ্ঠন ও বর্ত্তিকা আলোক বিকীর্ণ করিয়া সেই

নাট্যসভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। এই নাচ ভারতেরই বৈশিষ্ট্য; রাজা, রাজন্য বা কোটীপতি ব্যক্তিরা যখন এই নাচ দেন, তখন তাঁহারা বৈদেশিকদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকেন।"

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল চোরবাগানের মল্লিক পরিবারের মধ্যমণি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর ইহধাম হইতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৮ বৎসর। তিনি ধরায় যে কীর্ত্তি রাখিয়া অমরায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যোগ্যপুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও কুমার মণীন্দ্র মল্লিক তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েসনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তাহার প্রেসিডেণ্ট স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর এল-এল-ডি; সি-আই-ই রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সভার ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণে বিবৃত আছে। আমরা নিম্নে তাহা হইতে এই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

অনুবাদ

"বর্ত্তমান সময়ে আমি আর এক জনের নাম বিস্মৃত হইতে পারি না; সে ব্যক্তি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর; সে দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বহুদিন এই সমিতির সদস্য ছিলেন, সাধারণের হিতার্থ তিনি প্রচুর অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। ইনি শিষ্টাচারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুসভ্য শিষ্টাচারসম্পন্ন লোক কলিকাতায় দুর্লভ। তিনি দানশৌণ্ড ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ একজন বদান্য এবং যোগ্য ব্যক্তিকে হারাইয়াছেন। কলিকাতার দরিদ্র লোকেরা পিতৃহারা হইয়াছে। আপনাদের স্মরণ

আছে যে, ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রতিদিন পঞ্চসহস্রাধিক কাঙ্গালীকে ভোজন করাইতেন। কয়েক মাস ধরিয়া নিত্য এইরূপ অন্নদান চলিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ সমিতির হস্তে যে সমস্ত পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকা পতিত হইয়াছিল তাহাদিগের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি প্রতিদিন সহস্র কাঙ্গালী ভোজন করাইতেন। বহু বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ এই অন্নদানকার্য্য চলিত, একদিনও তাহা বন্ধ হইত না। কলিকাতার অধিক লোক সম্বন্ধে এই কথা আমি বলিতে পারি না। তিনি আমাদের সমাজে দাতাকর্ণ ছিলেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার উত্তরাধিকারী কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক একজন যোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু বহুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হইয়াছে, ইহাই দুঃখের বিষয়। আমার এইমাত্র ইচ্ছা যে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিয়া তাঁহার পুণ্য-শ্লোক পিতার স্মৃতি চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য দীর্ঘজীবন লাভ করুন।"

যে দিন রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক লোকান্তরে গমন করেন, সে দিন কলিকাতাময় হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বংশগৌরব এখনও অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার এবং সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইলেও শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রতিদিন যথানিয়মে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন, আধুনিক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিদিগের মত ঐ সকল অনুষ্ঠানে তিনি বীত-

শ্রদ্ধ ছিলেন না। কলাবিদ্যায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। চিত্রাঙ্কনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন, ভাস্কর-বিদ্যাতেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক-সময়ের যে তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের পারিবারিক বাসভবনের শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। উহাতে রাজরাজেশ্বরীর মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতেছে চিত্রিত আছে। এই চিত্রখানি কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের স্বহস্তে অঙ্কিত এবং উহার সমস্ত প্রসাধনকার্য্যও তাঁহার স্বকৃত। তিনি এক যূথ অশ্ব অঙ্কিত করিয়া তাহা কলিকাতার আলেখ্য-প্রদর্শনীতে প্রেরিত করিয়াছিলেন। তথায় সকলেই উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঐ চিত্র এখন চোরবাগানের মল্লিক-ভবনে রক্ষিত আছে।

কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক কেবল কলা-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, সাধারণের কার্য্যেও তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিতেন। তিনি অন্যান্য নানা কার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত সাধারণ কার্য্যে আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি জষ্টিস অব দি পীস, অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ-নির্ব্বাচিত কমিশনার, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি পরিষদের সদস্য, উক্ত পরিষদের প্রকৃতিতত্ত্ব (Natural History) সমিতির সদস্য, পশুশালা-প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধি, আলিপুর কৃষি-প্রদর্শনীর পারিতোষিক-প্রদানের ব্যবস্থাপক, পশুক্লেশ-নিবারণী সভার ভাইস্-প্রেসিডেন্ট, বৃটিস্ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েসনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি, ঝড় ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের ত্রাণ-সমিতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক লোকহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। শেষ অবস্থায় স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তিনি জন-সাধারণের হিতকর প্রায় সমস্ত

কার্য্যে যোগদানে বিরত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারের সহিত আপনাকে বিশেষভাবে পরিচিত রাখিতেন এবং তাঁহার স্বদেশবাসীর আশা এবং আকাঙ্ক্ষার সহিত পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। যখনই তিনি কোন সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইতেন, তখনই সকলে সাগ্রহে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইলেও তিনি অনেক সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন। দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার সমবেদনা অত্যন্ত অধিক ছিল বলিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি দরিদ্র ছাত্র, বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগের দুঃখমোচন-কল্পে প্রচুর দান করিতেন, সেই সকল দান এরূপভাবে করিতেন সাধারণে তাহা জানিতেও পারিত না।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ষাট বৎসর বয়সে কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই ষাট বৎসরকাল তাঁহার পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছিলেন। "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।" কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পুণ্যলক্ষণ তাঁহার যশে ও তাঁহার পুত্রে সুপ্রকাশ। উক্ত কুমার মহাশয়ের গুণধর পুত্র স্বর্গীয় কুমার নগেন্দ্র মল্লিক মহোদয় চোরবাগান-মল্লিক-পরিবারের অগ্রণী থাকিয়া তাঁহার পিতৃগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের সুযশও সর্ব্বত্র সুপ্রসারিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখের "ইণ্ডিয়ন মিররে" লিখিত হয় ;—

"মল্লিক-পরিবারের আর একজন বংশধর চলিয়া গেলেন! আমরা আজ গভীর ও ঐকান্তিক শোকসন্তপ্ত-চিত্তে কলিকাতা চোরবাগান-নিবাসী কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের মৃত্যুসংবাদ পত্রস্থ করিতেছি। আমরা উক্ত কুমার মহোদয়ের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিবার সময় শোকসন্তপ্ত হইতেছি; তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার ন্যায় হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন-অনুসারে নির্ম্মল জীবনযাপন করিয়াছেন, এরূপ হিন্দু এখনকার কালে অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আধুনিক স্বল্পসংখ্যক শাস্ত্রানুরাগী হিন্দুদিগের অন্যতম। স্বর্গীয় কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয় যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের ব্যক্তিগণ সকলেই প্রকৃত হিন্দুর উপযুক্ত গুণে মণ্ডিত। কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতামহ সম্বন্ধে একটি অতি সত্য গল্প আছে, তাহাতে ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের পরোপকার করিবার প্রবল প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশ, একদা স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মধ্যাহ্নভোজনে বসিবেন, ঠিক সেই সময় একজন ক্ষুধার্ত্ত অনাহারী অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে আসিয়া অন্নভিক্ষা করিল। তাঁহাদের উভয়ের অন্ন ভিন্ন ঐ দিন বাড়ীতে আর সিদ্ধান্ন ছিল না। তাঁহারা উভয়ে তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুৎ-পীড়িত অতিথিকে তাঁহাদের অন্ন দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের সেই গুণ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকে সংক্রামিত হইয়াছিল এবং কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের নিকট হইতে সেই গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা ইহা নিশ্চিত অবগত আছি যে, স্বর্গীয় কুমার মহোদয় বহুসংখ্যক দরিদ্রকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজনে বসিতেন না। তিনি সেকেলে লোক ছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত জনগণ মধ্যে যে ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা পরিলক্ষিত হয়, কুমার মহোদয়ের

চরিত্রে তাহার অত্যন্ত অভাব ছিল। তিনি বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারের মনোহারিত্বে বন্ধু ও অপরিচিত সকল ব্যক্তিই অতিশয় মুগ্ধ হইয়া পড়িত। সে ব্যবহারে অকৃত্রিম সরলতা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইত। তাঁহার সহিত পরিচিত থাকা সুকৃতির কার্য্য ছিল, তাঁহার সহিত আলাপে অনেক সুশিক্ষা হইত। তাঁহার আচরণে এবং আলাপে যে মনোহারিত্ব ছিল, তাহা ভিন্ন তাঁহার হৃদয়খানি এরূপ ছিল যে, ভগবান যেন তাঁহাকে তাঁহার নিজের গড়া ভদ্রলোক বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। সহানুভূতি এবং বদান্যতাই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিল। তিনি কেবল অন্নহীনকে অন্নদান করিতেন না, যে কেহ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিত সেই তাঁহার দানে ও সুপরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া আসিত। অবশ্য সংবাদপত্রে তাহার কার্য্যের কথা প্রকাশিত হইত না। তিনি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা যাহা করিতেন, তাঁহার বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না। তাঁহার অহমিকার লেশমাত্র ছিল না। তিনি কেবল পরের জন্য চিন্তা ও কার্য্য করিতেন। তাঁহার আড়ম্বর ছিল না, স্বার্থপরতা ছিল না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাহার কার্য্যকলাপ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েসনের একজন অগ্রণী ছিলেন এবং যতদিন তাঁহার ক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য সত্ত্বেও সম্ভব হইয়াছিল, ততদিন সাধারণের আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশের লোকের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। স্বর্গীয় কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক প্রকৃতই সুশিক্ষিত ছিলেন, কারণ তাহার রুচি মার্জ্জিত এবং শিক্ষা নানাবিষয়িণী ছিল। আমরা জানি যে, তিনি চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং ভাস্কর-বিদ্যা বুঝিতেন। তাঁহার চোরবাগানস্থ প্রাসাদতুল্য ভবন সুন্দর সুন্দর চিত্রে এবং মর্ম্মর-প্রস্তরের কারুশিল্পে পূর্ণ। উহা

কলিকাতায় একটি দর্শনীয় স্থান। কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের গুণ এত অধিক ছিল যে, স্বতন্ত্রভাবে আর তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি স্বুবর্ণ বণিক জাতির গৌরব-স্বরূপ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ জাতিরও গৌরব-স্বরূপ হইতে পারিতেন। প্রকৃত পক্ষেই কুমার মহাশয় সমগ্র হিন্দু-সমাজের গৌরব-স্বরূপ ছিলেন। তিনি যেমন সাদাসিধাভাবে থাকিয়া উচ্চচিন্তা করিয়াছেন ও তাহার সহিত অসাধারণ বদান্যতা দেখাইয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক জাতিতে-সুবর্ণ-বণিক্ ছিলেন সত্য, কিন্তু এই পতনের যুগে তিনি অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও গৌরবমণ্ডিত ছিলেন।

সার রোপার লেথব্রিজ কে-সি-আই-ই, মহোদয় তাহার প্রণীত Golden Book of India নামক গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ দেখুন :—

বঙ্গানুবাদ।

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের 'কুমার'-উপাধি ব্যক্তিগত, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই উহা প্রদত্ত হয়। এই কুমার স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইহাদের বংশের উপাধি শীল, কিন্তু মোগল সম্রাটগণ কর্ত্তৃক ইঁহাদিগকে বংশগত মল্লিক উপাধি প্রদত্ত হয়। উহাই এখন তাঁহাদের বংশ-পরম্পরাগত-উপাধি। এই বংশ অত্যন্ত প্রাচীন বংশ, এই বংশের বিশ পুরুষের নাম ও পরিচয় রক্ষিত আছে। ইহারা সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায় ও তাঁহাদের ব্রাহ্মণদিগের দলপতি বলিয়া গণ্য। ইহাদের বংশগত চিহ্ন, বাদামী আকৃতির তারকা ও তন্মধ্যস্থিত কেশরী। নিবাস বাঙ্গালার কলিকাতা সহর।

কুমার ৺মণীন্দ্র মল্লিক।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের কনিষ্ঠপুত্র কুমার স্বর্গীয় মণীন্দ্র মল্লিক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হিন্দুস্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, ইংরেজী এবং বাঙ্গালাভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি তাঁহার সম্মানভাজন পিতৃদেবের অনেকগুলি সদ্‌গুণ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খুব মিষ্টভাষী, সৌজন্যপরায়ণ এবং দয়ালু ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক মহাশয় তাঁহারই হস্তে বিষয়কার্য্য অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃ-পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুন্দরভাবে তাহার পরিচালনা করিতেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না।

চোরবাগানের মল্লিক পরিবার কলিকাতার কোটীশ্বর মল্লিক বলিয়া পরিচিত। এখন এই পরিবারে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের তিনটি পৌত্র বর্ত্তমান আছেন। বদান্যতায় এবং জনসাধারণের হিতানুষ্ঠানে এই মল্লিক পরিবারের যশঃ এবং কীর্ত্তি ইঁহারা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। আর্ত্তত্রাণে ও দানে ইঁহারা যেরূপ মুক্তহস্ত, তাহাতে ইঁহাদের যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের নাম ;—

(১) কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক—ইনি স্বর্গীয় কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের পুত্র।

(২) কুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মল্লিক—ইনি স্বর্গীয় কুমার গিরীন্দ্র মল্লিকের পুত্র।

(৩) কুমার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক—ইনি স্বর্গীয় কুমার সুরেন্দ্র মল্লিকের পুত্র।

৺নগেন্দ্র মল্লিক।

ইনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণ করেন। গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে জানুয়ারী ইনি পরলোক গমন করেন, মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। বাল্যকালে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ষোড়শবর্ষ বয়সে ইনি উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদনন্তর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে চারি বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। কলেজ ত্যাগ করিবার পরও তিনি অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। গৃহে বসিয়া কয়েক জন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকট তিনি কতকগুলি বিশেষ বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন ইঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, জ্ঞানানুশীলনে ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ এবং সরল ও উদারভাব দর্শন করিয়া ইঁহার সহাধ্যায়ীরা ইঁহাকে সম্মান করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং অধ্যাপকগণও ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইঁহার জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত প্রবল হইল। ইনি অনেক সময়ে বড় বড় গ্রন্থকারের গ্রন্থপাঠ করিতেন। ইনি সাহিত্যে, চিত্রবিদ্যায় ও জীববিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ইঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায় ইনি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহা ভিন্ন ইঁহার পিতার ন্যায় কলা-বিদ্যাতেও ইঁহার প্রগাঢ় আনুরক্তি ছিল। কলাবিদ্যায় প্রগাঢ় আনুরক্তির ফলে ইনি ইঁহাদের প্রাসাদের কলাভবন অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র, আলেখ্য, ভাস্করকীর্ত্তি দ্বারা পরিশোভিত করিয়াছেন। ইনি প্রাণিবাটিকাতেও নানাবিধ জীবজন্তু রাখিয়া দিয়াছেন।

স্বর্গীয় কুমার নগেন্দ্র মল্লিক।
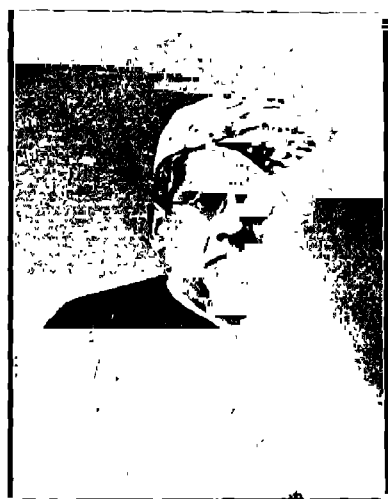
স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত কলাভবনের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার দুই পিতৃব্যপুত্র কুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মল্লিক এবং কুমার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রচুর অর্থব্যয় ও সময়ক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের মর্ম্মর-প্রাসাদের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে এখন উন্নত কলাবিদ্যার দ্যোতক যত বস্তু সংগৃহীত আছে, ভারতের অন্য কোন কলাভবনে তত সুন্দর সুন্দর বস্তু আছে কি না সন্দেহ। কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক সাধারণ দর্শকদিগের সুবিধার জন্য তাহার একটী ক্যাটালগ বা বিবরণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার অনেক পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ শনিবারে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিকের মর্ম্মর-প্রাসাদ পরিদর্শন করিতে আগমন করিয়া মল্লিক পরিবারকে ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় দুইঘণ্টা কাল উক্ত প্রাসাদের বিবিধ শিল্পজ বস্তুপূর্ণ দালান, দরদালান, বারান্দা এবং ছত্রিশ বিঘা জমিতে স্থাপিত নানাবিধ মর্ম্মর ও পিত্তল-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য সংগৃহীত দেখিয়া লর্ড মিণ্টো ও তাঁহার পত্নী পরমপ্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে ঐরূপ সংগ্রহ বাস্তবিক বড় বিস্ময়জনক। মল্লিক পরিবারের ঐরূপ সংগ্রহ আছে বলিয়া তাঁহারা সত্য সত্যই ভাগ্যবান। লর্ড ও লেডী মিণ্টোর এই কলাভবন পরিদর্শনের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের স্বহস্তে স্বাক্ষরিত দুইখানি ফটো উক্ত কলাভবনে রক্ষা করিবার অনুমতি পত্রসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ সোমবারে কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিকের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ভারতের তদানীন্তন রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর সস্ত্রীক এই মর্ম্মরপ্রাসাদ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। গৃহস্বামীরা তাঁহাদিগকে প্রাসাদের সমস্ত সংগৃহীত বস্তু সাদরে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা উহা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহারাও তাঁহাদের দুইখানি ফটোগ্রাফে নাম লিখিয়া কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিককে উপহার প্রদান করেন। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড কার্ম্মাইকেল সস্ত্রীক এই প্রাসাদে আসিয়া সমুদয় দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাদের ফটোগ্রাফ একখানি স্মরণার্থে রাখিবার জন্য প্রদান করেন।

কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাঁহার পিতৃপুরুষের সমস্ত সদ্‌-গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি এই বংশের দানধর্ম্ম এবং কীর্ত্তিকলাপ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; দানধর্ম্মই এই কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম তিনি যে বিশিষ্টভাবে পালন করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা ভিন্ন তাঁহার নির্ম্মল-চরিত্র, অনন্যসাধারণ দেবভক্তি, হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস তাহাকে যে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে, তাহা ইদানীন্তন যুগে নিতান্তই দুর্লভ। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন অন্যের আদর্শস্থানীয়। তাঁহার অমায়িকতায়, সরলতায়, সৌজন্যে ও বুদ্ধিমত্তায় সকলেই তাঁহার বশীভূত হইতেন। তাঁহার মনীষা ও শিক্ষালব্ধ সদ্‌গুণ অতি উচ্চ ধরণের ছিল। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের সকলেই স্বভাবতঃ রাজভক্ত। সেই কৌলিক সদ্‌গুণে স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক কোনও অংশে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। সম্রাটের প্রতি ইনি প্রগাঢ় ভক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। সমাজে ইঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া ইনি স্বজাতি-সমাজের দলপতি বলিয়া সম্মানিত। ইনি সম্পূর্ণ নৈষ্ঠিকভাবে হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতেন।

ইনি সাধারণের কার্য্যেও বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিতেন। ইনি স্বর্ণ বণিক সমাজের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইহা ভিন্ন ইনি কয়েক বৎসর স্বর্ণ বণিক সমিতিরও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের বালিকা বিদ্যালয়ের ইনি প্রেসিডেণ্ট, বৌবাজার আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট এবং পরে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসো-সিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল দেশীয় সমিতির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং জনহিতকর বহু অনুষ্ঠানের সহিত ইনি বিজড়িত ছিলেন।

দয়া, ধর্ম্ম ও দানের জন্য কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক বাহা-দুরকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের দিল্লী-দরবারে করোনেশন মেডাল দেওয়া হইয়াছিল।

প্রতিদিন কলিকাতার বহু দরিদ্র এবং নিঃসম্বল ব্যক্তি চোরবাগানের মল্লিক-ভবনে অন্নাদি ভোজন ও দানগ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের উইলে প্রতিদিন পাঁচশত মাত্র কাঙ্গালী ভোজনের কথা লিখিত আছে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রতিদিন তথায় হাজার লোককে অন্নদান করা হইয়া থাকে। ১৩২১ সনের হিসাব দেখিলে ইহা বেশ বুঝা যাইবে।

মাসের নাম।	কাঙ্গালার সংখ্যা।
বৈশাখ	২৯, ১২৬।
জ্যৈষ্ঠ	৩০, ২৬৩।
আষাঢ়	৩১, ৬১৩।
শ্রাবণ	৩০, ৮৬০।

ভাদ্র	৩১, ০১৩
আশ্বিন	৩০, ৮৯৮
কার্ত্তিক	২৯, ১২।
অগ্রহায়ণ	২৭, ৯৭৪।
পৌষ	২৭, ০৪৩।
মাঘ	২৯, ৩৩০।
ফাল্গুন	২৮, ০৪০।
চৈত্র	২৬, ২০২
মোট	৩,৫৩,০৭৪।

ধর্ম্মানুষ্ঠানে, উৎসবে বা দুর্ভিক্ষে অথবা অন্য সময়ে অতিথি উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে বিমুখ হইতে হয় না। তখন অতিথি কাঙ্গালীদিগের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। এই দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের দিনে দুঃস্থ কাঙ্গালীদিগের জন্য স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় অতিরিক্ত অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতায় যে অংশে মল্লিক মহাশয়দিগের বাস সেই অংশে লোকের বসতি অত্যন্ত ঘন। ঐ স্থানের অধিবাসীরা একটী পার্কের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করে। তাহাদের সেই অভাব মোচনের জন্য কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মল্লিক এবং কুমার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক প্রায় বিশবিঘা ভূমি ক্রয় করিয়া তাহার উপর একটী পার্ক নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন, সাধারণে সেই পার্ক ব্যবহার করিতে পারে। এই জমি খরিদ বাবত তাঁহাদের দশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

ইঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে স্যর আশুতোষ

কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক।

স্বর্গীয় কুমার ব্রজেন্দ্র মল্লিক।

চৌধুরীর সভাপতিত্বে সাধারণের পক্ষ হইতে এক শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই শুক্রবার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার এই পার্ক পরিদর্শন করেন এবং মল্লিক পরিবার সাধারণের ব্যবহারের জন্য ঐ পার্ক করিয়া দিয়াছেন বলিয়া উহার অতি সামান্য টেক্স ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন।

কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে ইদানীন্তন যুবকদিগকে দৈহিক উন্নতিসাধনে উৎসাহিত করিয়া বঙ্গীয় সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার চোরবাগানের প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে সাধারণের জন্য একটি ক্রীড়াভূমি রচনা করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ দর্শকদিগের সুবিধার জন্য চোরবাগানের আর্ট গ্যালারি বেলা দশটা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময় নানাদেশ হইতে দর্শকগণ উহা দেখিতে আসিয়া থাকেন।

কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর অদ্বিতীয় দানবীর। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্র ও নিঃসম্বল বিধবাকে অর্থসাহায্য করিতেন। লোকহিতার্থে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ তিনি মুক্তহস্ত।

কুমার স্বর্গীয় নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের একটি (পোষ্য) পুত্র আছেন। তাঁহার নাম কুমার শ্রীমান্ জীতেন্দ্র মল্লিক।

কুমার শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর।

কুমার শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর স্বর্গীয় কুমার গিরীন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের পুত্র। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতার হিন্দুস্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া, পরে গৃহে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করেন।

বাল্যকাল হইতেই কুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের মনে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মই ইঁহার পৈত্রিক ধর্ম্ম। তিনি যথাশাস্ত্র ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, সাধন ভজন প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

কুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মল্লিক একজন বিখ্যাত দানবীর। বাল্যকাল হইতে তাহার দয়াবৃত্তি ও দান করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। তাঁহার সহধ্যায়ীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার দয়ার বিশেষ পরিচয় অবগত আছেন। তিনি গোপনেই দান করিয়া থাকেন, ঢক্কানিনাদে তাঁহার দান সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইত না। ইঁহার সৌজন্য, শিষ্টাচার, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ সর্ব্বজন-পরিচিত।

কুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাঁহার দয়ার, দানের ও ঔদার্য্যের জন্য দিল্লীর দরবার হইতে করোনেশন্ পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী।

কুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের একটি পুত্র। তাঁহার নাম কুমার শ্রীমান্ দীনেন্দ্র মল্লিক।

কুমার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক।

স্বর্গীয় কুমার সুরেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক এক্ষণে মল্লিক-পরিবারের কর্ত্তা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন রবিবারে ইনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে ইনি কলিকাতা হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করেন। তথাকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন বিশিষ্ট গ্রাজুয়েটের নিকট গৃহে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে।